আব্বাস আলী খান স্মারকগ্রন্থ

মৃত্যুহীন প্রাণ

আব্বাস আলী খান স্মারকগ্রন্থ

আবদুস শহীদ নাসিম
সম্পাদিত

মৃত্যুহীন প্রাণ ঃ আব্বাস আলী খান স্মারকগ্রন্থ
আবদুস শহীদ নাসিম সম্পাদিত

স্মারকগ্রন্থ প্রকাশনা কমিটি
১. আবদুস শহীদ নাসিম আহ্বায়ক
২. মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম সদস্য
৩. মুহাম্মদ নূরুয্যামান "
৪. আবদুল মান্নান তালিব "

প্রকাশক
সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রিসার্চ একাডেমী ঢাকা

পরিবেশক
শতাব্দী প্রকাশনী
৪৯১/১ মগবাজার ওয়ারলেস রেল গেইট
ঢাকা-১২১৭, ফোন ঃ ৮৩১১২৯২

প্রকাশকাল
ডিসেম্বর ১৯৯৯

শব্দ বিন্যাস
আবুল কালাম আজাদ
এ. জেড. কম্পিউটার এন্ড প্রিন্টার্স
ফোন ঃ ৯৩৪২২৪৯

মুদ্রণ
আল ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস
৪২৩ এলিফ্যান্ট রোড, মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

শুভেচ্ছা বিনিময় ঃ একশত টকা মাত্র

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী

কোনো ব্যক্তিই আল্লাহ্‌র অনুমতি ছাড়া মরতে পারেনা। যে ব্যক্তি পার্থিব পুরস্কারের আশা করে, আমি তাকে এখান থেকেই দেবো। আর যে আখিরাতের পুরস্কারের আশায় কাজ করে, আমি তাকে সেখান থেকে দেবো।,আমার প্রতি কৃতজ্ঞদের অবশ্যি আমি প্রতিদান দেবো। (আল কুরআন ৩ ঃ ১৪৫)

●

যারা ইমান এনেছে আর আমলে সালেহ্ করেছে, অবশ্যি তারা সৃষ্টির সেরা। তাদের প্রভুর কাছে তারা পুরস্কার পাবে চিরস্থায়ী জান্নাত, যার নিচ দিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত। চিরকাল থাকবে তারা সেখানে। আল্লাহ্ তাদের প্রতি রাজি হয়ে গেছেন আর তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট। এ হচ্ছে ঐ ব্যক্তির জন্যে যে তার প্রভুকে ভয় করে। (আল কুরআন ৯৮ ঃ ৭-৮)

●

হে প্রশান্ত আত্মা! ফিরে এসো তোমার প্রভুর কাছে। তুমি তো তোমার প্রভুর প্রতি সন্তুষ্ট আর তোমার প্রভুও তোমার প্রতি সন্তুষ্ট। এসো শামিল হও আমার প্রিয় দাসদের মধ্যে আর দাখিল হও আমার জান্নাতে। (আল কুরআন ৮৯ ঃ ২৭-৩০)

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মানুষ যখন মরে যায়, তখন তার থেকে তার সমস্ত আমল বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তবে তিন প্রকারের আমল তার সাথে যুক্ত থাকে ঃ (১) সাদাকায়ে জারিয়া অর্থাৎ স্থায়ী সুফলদায়ী উপকারী দান বা অবদান, (২) স্থায়ী সুফলদায়ী জ্ঞান ও শিক্ষা, (৩) সৎকর্মশীল নেককার সন্তান রেখে যাওয়া, যারা তার জন্যে দু'আ করতে থাকে। (সহীহ মুসলিম ঃ আবু হুরাইরা রা.)

●

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমার পরে সবচেয়ে বড় দানশীল সে, যে কোনো বিষয়ে জ্ঞানার্জন করলো, তারপর তা মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দিলো। (বায়হাকী ঃ আনাস রা.)

সম্পাদকীয়

মাস তিনেক আগে শ্রদ্ধেয় আমীরে জামায়াত অধ্যাপক গোলাম আযম আমাকে ডেকে নিয়ে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ-এর ইতিহাস লেখার বিষয়ে আলোচনা করলেন। প্রসংগক্রমে তিনি বললেন, জামায়াত নেতৃবৃন্দের অনেকেই ইন্তেকাল করে গেছেন, কিন্তু তাদের জীবনী এবং আন্দোলনের জন্যে তাঁদের ত্যাগ-কুরবানী ও অবদানের ইতিহাস লেখা হলোনা! এ কথাগুলো তিনি আফসুস করে বললেন এবং আমাকে এ কাজটি করার পরামর্শ দিলেন। এসময় তাঁর প্রিয় সাথি আব্বাস আলী খান 'মরজুল মউতে' শয্যাশায়ী।

৩ অক্টোবর '৯৯ ইসলামী আদর্শের মূর্ত প্রতীক, অমাদের ইতিহাস ঐতিহ্যের নিশান বরদার, ইসলামী আন্দোলনের অন্যতম সিপাহ্সালার, বাংলার মুসলমানদের অকৃত্রিম দরদী, বাংলা ভাষায় ইসলামী জ্ঞান গবেষণা ও ইতিহাস চর্চার অগ্রনায়ক, আজীবন আল্লাহর দিকে আহ্বায়ক, আশিখরনখ আবেদ ও আল্লাহওয়ালা আব্বাস আলী খান তাঁর 'রফিকুল আ'লা'র আহ্বানে সাড়া দিয়ে চলে গেলেন প্রশান্ত চিত্তে।

৯ অক্টোবর '৯৯ ঢাকার ইঞ্জিনিয়ার্স ইনিস্টিটিউটে আয়োজিত আলোচনা সভা ও দু'আর মাহফিলে শ্রদ্ধেয় আমীরে জামায়াত অধ্যাপক গোলাম আযম প্রধান অতিথির ভাষণে জরুরিভাবে মরহুম খান সাহেবের জীবনেতিহাস লেখার প্রতি গুরুত্বারোপ করেন এবং এ বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

১০ অক্টোরব '৯৯ তারিখে সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রিসার্স একাডেমী নির্বাহী কমিটির এক জরুরি সভা অনুষ্ঠিত হয়। একাডেমীর ভারপ্রাপ্ত চেয়াম্যান মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীর সভাপতিতে অনুষ্ঠিত এ সভায় 'আব্বাস আলী খান স্মারকগ্রন্থ' প্রকাশের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ উদ্দেশ্যে একাডেমীর পরিচালককে আহ্বায়ক করে একটি 'স্মারকগ্রন্থ প্রকাশনা কমিটি'ও গঠন করা হয়। একথা সকলেরই জানা, মরহুম আব্বাস আলী খান কেবল জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ-এর সিনিয়র নায়েবে আমীর এবং দীর্ঘদিন ভারপ্রাপ্ত আমীরই ছিলেননা, বরং সেই সাথে তিনি সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রিসার্চ একাডেমীর চেয়ারম্যানও ছিলেন। ১৯৭৯ সালে একাডেমী প্রতিষ্ঠার পর থেকে আমৃত্যু তিনি এ প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান ছিলেন।

স্মারকগ্রন্থ প্রকাশের সিদ্ধান্ত হবার সাথে সাথে মরহুম খান সাহেব সম্পর্কে লেখা ও তথ্য চেয়ে পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেয়া হয়। আল্‌হামদ লিল্লাহ, প্রচুর সাড়া পাওয়া গেছে। অনেক লেখা এসেছে। স্মারকগ্রন্থ দ্রুত প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত নেবার কারণে আমরা লেখার জন্যে বেশি সময় দিতে পারিনি। সময় আরেকটু দিতে পারলে আরো অনেকেই লিখতেন।

লেখা সম্পাদনা করতে হয়েছে। তাছাড়া গ্রন্থটির পৃষ্ঠা সংখ্যা একটি নির্দিষ্ট পরিসরের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হয়েছে বিধায় অনেকের লেখাই কাটছাঁট করতে হয়েছে। ছোট করতে হয়েছে বড় আকারের লেখা। তবে আমরা সতর্ক থেকেছি, যাতে কোনো নতুন তথ্য বাদ না যায়।

গ্রন্থটিকে সুসজ্জিত, সুখপাঠ্য ও তথ্যবহুল করার জন্যে আমরা বিভিন অধ্যায় - অনুচ্ছেদ গঠন করেছি। সকলের লেখার প্রতিই আমরা বিশেষ যত্ন নেয়ার এবং গুরুত্ব দেয়ার চেষ্টা করেছি।

আরো সময় পেলে গ্রন্থটিকে আরো উন্নত করা যেতো। আরো লেখা এবং আরো তথ্য দেয়া যেতো। সুযোগ পেলে পরবর্তী সংস্করণকে আরো উন্নত করা হবে ইনশায়াল্লাহ। তাড়াহুড়া করার কারণে মুদ্রণ-প্রমাদ কিছু থেকেই গেছে, সেজন্যে আমরা দুঃখিত।

একাডেমীর সম্মানিত ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান মাওলানা মতিউর রমমান নিজামী গ্রন্থটি প্রকাশের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে উৎসাহিত করেছেন, প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিয়েছেন এবং তত্বাবধান করেছেন।

একাডেমী নির্বাহী কমিটির সদস্য এবং স্মারকগ্রন্থ উপকমিটির সদস্য জনাব মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম ও জনাব মুহাম্মদ নুরুযযামান সম্পাদনা কাজে আমাকে বিশেষভাবে সহযোগিতা করেছেন। এছাড়া গ্রন্থটি প্রকাশের ক্ষেত্রে পরামর্শ দিয়ে, উৎসাহ দিয়ে, লেখা দিয়ে, তথ্য দিয়ে, অর্থ দিয়ে এবং সময় ও শ্রম দিয়ে সহযোগিতা করেছেন অনেকে।

বিদগ্ধ পাঠকগণের দৃষ্টিতে কোনো তথ্যগত কিংবা মুদ্রণগত প্রমাদ ধরা পড়লে তা আমাদের জানাবার অনুরোধ করছি। তাছাড়া কারো কাছে কোনো নতুন তথ্য থাকলে তা-ও আমাদের জানাবার অনুরোধ করছি। ইনশায়াল্লাহ পরবর্তী সংস্করণে তার আলোকে গ্রন্থটি পরিমার্জন করা হবে।

আদর্শ পুরুষ আব্বাস আলী খানের আল্লাহওয়ালা জীবন আমাদের সকলকে আল্লাহর দিকে অনুপ্রাণিত করুক। আমীন

আবদুস শহীদ নাসিম　　　　তারিখ: ১০. ১২. ১৯৯৯
পরিচালক
সাইয়েদ আবুল আ'লা মুওদূদী রিসার্চ একাডেমী ঢাকা।

সূচিপত্র

(১৯১৪-১৯৯৯)

আব্বাস আলী খান
জীবন ও কর্ম

আবদুস শহীদ নাসিম

মরহুম আব্বাস আলী খান ইসলামী আন্দোলনের এক উজ্জ্বল প্রদীপ। বাংলাদেশের ইসলামী আন্দোলনে তাঁর অবদান অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে। বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের তিনি অন্যতম পুরোধা। এক যুগেরও বেশি সময় ধরে তিনি জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের ভারপ্রাপ্ত আমীর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। শিক্ষা ও জ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে তিনি এক বিদগ্ধ ব্যক্তিত্ব। ইসলামী ব্যক্তিত্ব এবং ইসলামী আন্দোলনের নেতা হিসেবে তিনি কেবল দেশের ভিতরেই সুপরিচিত নন, সারা বিশ্বের ইসলামী আন্দোলনগুলোর কাছেও তিনি সমভাবে পরিচিত।

জন্ম ও শিক্ষা

এই মহান ব্যক্তিত্ব ১৯১৪ সালে জয়পুরহাটে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পূর্বপুরুষেরা বহুকাল পূর্বে আফগানিস্তান থেকে এদেশে আগমন করেন। তাঁরা ছিলেন আফগানিস্তানের পাখতুন (পাঠান) বংশোদ্ভূত। এই সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে তিনি ধর্মীয় পরিবেশে বড় হয়ে উঠেন।

হুগলী নিউস্কীম মাদ্রাসা থেকে তিনি ১৯৩০ সালে মেট্রিক পাশ করেন। অতপর ১৯৩৫ সালে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ রংপুর কারমাইকেল কলেজ থেকে ডিস্টিংশনসহ বি. এ. পাশ করেন। কিছুদিন তিনি বি. টি. পড়েন। কিন্তু এরই মধ্যে তাঁর সরকারী চাকুরি হয়ে যায়।

চাকুরি

১৯৩৫ সাল থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত তিনি সরকারী চাকুরি করেন। সরকারী চাকুরির সুবাদে খান সাহেব অবিভক্ত বাংলার প্রধানমন্ত্রী শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হকের ব্যক্তিগত সেক্রেটারির দায়িত্বও পালন করেন। এরপর জয়পুরহাট হাইস্কুল ও হিলি হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করে যুব সমাজকে জ্ঞানের আলো বিতরণের ক্ষেত্রে বিরাট অবদান রাখেন।

প্রধান শিক্ষকের চাকুরি গ্রহণের পর পরই তিনি ফুরফুরার মরহুম পীর আবদুল হাই সিদ্দিকীর সান্নিধ্যে আসেন এবং তাঁর মুরীদ হন। পীর সাহেব তাঁর দীনি ইলেম ও আধ্যাত্মিক উন্নতিতে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে খলিফা নিযুক্ত করেন।

এরই মধ্যে ১৯৫৪ সালের শেষের দিকে তিনি জামায়াতে ইসলামীর দাওয়াত পান এবং মাওলানা মওদূদী র.-এর গ্রন্থাবলী পড়ে জামায়াতে ইসলামীতে যোগদান করেন। জামায়াতে ইসলামীতে যোগদানের খবর তিনি পীর সাহেবকে জানান এবং তাঁকে জামায়াতে ইসলামীর উদ্দেশ্যে, লক্ষ্য এবং দাওয়াত ও কর্মসূচি সম্পর্কেও অবহিত করেন। পীর সাহেব তাঁর বক্তব্য শুনে বলেন ঃ "বাবা! এটাইতো দীনের আসল কাজ। আমিতো এই উদ্দেশ্যেই লোক তৈরি করছি। আপনি জান প্রাণ দিয়ে এই কাজ করে যান।"

জামায়াতে যোগদান

১৯৫৪ সালের ডিসেম্বর মাসে তিনি তাঁর বাড়ি থেকে চার মাইল দূরে এক 'ধর্মসভায়' যোগদান করেন। এ ধর্ম সভায় প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত থাকার কথা ছিলো ডঃ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহর এবং বিশেষ বক্তা হিসেবে উপস্থিত থাকার কথা ছিলো অধ্যাপক গোলাম আযমের। অধ্যাপক গোলাম আযম সাহেব এ সময় রংপুর কারমাইকেল কলেজে রাষ্ট্র বিজ্ঞানের অধ্যাপক ছিলেন।

শেষ পর্যন্ত প্রধান অতিথি ডক্টর মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ সভায় উপস্থিত হতে পারবেন না বলে টেলিগ্রাফে জানিয়ে দিলেন। ফলে অধ্যাপক গোলাম আযমই প্রধান বক্তার বক্তৃতা করেন।

জনাব আব্বাস আলী খান এ ধর্মসভায় উপস্থিত হন। এসময় তিনি একদিকে হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক, অন্যদিকে ফুরফুরার পীর আবদুল হাই সিদ্দিকী সাহেবের খলিফা। অধ্যাপক গোলাম আযমের বক্তব্য বিশেষ ভাবে তাঁর মুখে কলেমা তাইয়্যেবার ব্যাখ্যা শুনে তিনি দারুণ মুগ্ধ ও প্রভাবিত হন।

সভাশেষে তিনি অধ্যাপক গোলাম আযম সাহেবের সাথে ব্যক্তিগতভাবে আলাপ করেন। অধ্যাপক সাহেব তাঁকে জামায়াতের দাওয়াত দেন এবং মাওলানা মওদূদী র.-এর কিছু বইও পড়তে দেন, সেই সাথে জামায়াতে ইসলামীর একটি মুত্তাফিক ফরম (সহযোগী সদস্য ফরম)ও দিয়ে দেন।

১৯৫৫ সালের ১লা জানুয়ারী খান সাহেব জামায়াতের মুত্তাফিক ফরম পূরণ করেন এবং '৫৬ সালের মাঝামাঝি রুকনিয়াতের শপথ গ্রহণ করেন। এসময় অধ্যাপক গোলাম আযম জামায়াতের রাজশাহী বিভাগীয় আমীর ছিলেন। তিনিই জনাব খান সাহেবকে রুকনিয়াতের শপথ গ্রহণ করান। এ প্রসংগে মরহুম খান সাহেব বলেন ঃ

"এই শপথের মাধ্যমে আমি আমার জান মাল আল্লাহর কাছে বিক্রয় করে দিলাম এবং আল্লাহর খরিদ করা জান মাল তাঁরই পথে ব্যয় করার শপথ নিলাম। এবার সত্যিই সঠিক পথের সন্ধান পেলুম, যে পথের সন্ধান এলমে তাসাউফ দিতে পারেনি। ভাগ্য ভালো নইলে আরো কিছু কাল এলমে তাসাউফের ময়দানে থাকলে বাতিলের সাথে সংগ্রাম করার হিম্মত হারিয়ে জিহাদের ময়দান থেকে পালিয়ে হুজরায় বসে অর্থহীন তপজপে জীবন কাটিয়ে দিতুম। (স্মৃতি সাগরের ঢেউ ঃ পৃঃ ১৩৩)

সাংগঠনিক দায়িত্ব পালন

মাওলানা মওদূদী র. ১৯৫৬ সালে প্রথম পূর্ব পাকিস্তান সফর করেন। এসময় থেকে জনাব খান সাহেব মাওলানা মওদূদীর র.-এর সান্নিধ্যে আসেন। মরহুম খান সাহেব খুব ভালো উর্দু জানতেন, তাই তিনি মূল উর্দু ভাষায় মাওলানার সবগুলো বই পড়ে ফেলেন এবং মাওলানার সান্নিধ্যে থেকে মাওলানার যাবতীয় বক্তৃতা এবং আলোচনা ভালোভাবে হজম করেন। মাওলানা দ্বিতীয় বার পূর্ব পাকিস্তান সফর করেন ১৯৫৮ সালে। এই সফরে তিনি রংপুর, গাইবান্ধা, বগুড়া ও রাজশাহীতে যে সব জনসভা ও সমাবেশে বক্তৃতা করেন, মরহুম খান সাহেব সে সব সভা সমাবেশে মাওলানার দোভাষীর দায়িত্ব পালন করেন।

অতপর ৫৭ সালের প্রথম দিকে জামায়াতের নির্দেশে তিনি হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষকের চাকুরি ত্যাগ করেন। অবশ্য স্কুলের ম্যানেজিং কমিটি এবং ছাত্ররা তাঁকে কিছুতেই স্কুল থেকে ছাড়তে রাজি হচ্ছিলনা। এমনকি স্কুলের শত শত ছাত্র এসে তাঁকে স্কুলে ফিরিয়ে নেবার জন্য তাঁর বাড়ি ঘেরাও করে। অবশ্য তিনি জামায়াতের মাছিগোট সম্মেলনে রওনা করে এ ঘেরাও থেকে রক্ষা পান। এ থেকেই বুঝা যায় তিনি কতো প্রিয় শিক্ষক ছিলেন। কিন্তু তিনি এ পদস্থ চাকুরির চাইতে সাংগঠনিক সিদ্ধান্তকেই অগ্রাধিকার দেন। আর ফিরে যানানি চাকুরিতে। ইসলামী আন্দোলনকেই জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হিসেবে গ্রহণ করেন।

১৯৫৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে মাছিগোটে অনুষ্ঠিত নিখিল পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামীর রুকন সম্মেলনে তিনি যোগদান করেন। এর বছরই তাঁর উপর রাজশাহী বিভাগীয় জামায়াতে ইসলামীর দায়িত্ব অর্পিত হয়। পাকিস্তান আমলের শেষ পর্যন্ত

তিনি বিভাগীয় দায়িত্ব পালন করেন। স্বাধীনতার পর ১৯৭৯ সালে জামায়াতে ইসলামী পূনর্গঠিত হবার পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত জনাব আব্বাস আলী খান জামায়াতে ইলসলামী বাংলাদেশের সিনিয়র নায়েবে আমীর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ১৯৭৯ সাল থেকে ১৯৯২ সাল পর্যন্ত জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের ভারপ্রাপ্ত আমীরের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৯২ সালের রমযান মাসে আমীরে জামায়াত অধ্যাপক গোলাম আযমকে যখন জেলে নেয়া হয় এবং ১৪ মাস বন্দী করে রাখা হয়, তখনো তিনি ভারপ্রাপ্ত আমীরের দায়িত্ব পালন করেন। তাছাড়া আমীরে জামায়াত অধ্যাপক গোলাম যখনই দেশের বাইরে গিয়েছেন, তখন তিনিই ভারপ্রাপ্ত আমীরের দায়িত্ব পালন করেছেন।

জনাব আব্বাস আলী খান ইসলামী আন্দোলনের সর্বজন শ্রদ্ধেয় নেতা। ১৯৫৫ সাল থেকে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি নিষ্ঠার সাথে একজন খাঁটি দায়ী ইলাল্লাহ হিসেবে ইকামতে দীনের কাজ করেছেন। এদেশের জনগণের ঘরে ঘরে তিনি ইসলামের আহ্বান পৌছে দিয়েছেন। আল্লাহর দীনের কাজের জন্য গড়েছেন হাজারো কর্মী।

রাজনৈতিক ভূমিকা

জননেতা আব্বাস আলী খান ১৯৬২ সালে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। এসময় তিনি জামায়াতে ইসলামীর পার্লামেন্টারি গ্রুপের নেতৃত্ব দেন এবং জাতীয় পরিষদে ইসলাম ও গণতন্ত্রের পক্ষে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন।

জনাব খান জামায়াতের সংসদীয় গ্রুপের নেতা হিসেবে আইয়ুব খানের কুখ্যাত মুসলিম পারিবারিক আইন বাতিলের জন্য ১৯৬২ সালের ৪ঠা জুলাই জাতীয় পরিষদে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিল পেশ করেন। অধিবেশন শুরুর আগের দিন ৩ জুলাই আইয়ুব খান জনাব আব্বাস আলী খানকে তার বাস ভবনে আমন্ত্রণ জানান। আইয়ুব খান তাঁকে মেহমানদারি করার ফাঁকে প্রস্তাবিত বিলটি জাতীয় পরিষদে পেশ না করার জন্য আকারে ইংগিতে শাঁসিয়ে দেন। সেই সাথে এর বিরোধিতা করার জন্য মহিলাদেরকে উসকিয়ে দেন। কিন্তু ভয়ংকর বিরোধিতার মুখেও জনাব খান বিলটি সংসদে উত্থাপন করেন।

প্রচন্ড বিরোধীতার মুখে বিলটি আলোচানার জন্য গৃহীত হয়। এসময় আইয়ুব খানের লেলিয়ে দেয়া 'আপওয়া' বাহিনীর উগ্র আধুনিক মহিলারা পিন্ডি, লাহোর ও করাচীতে জনাব খানের কুশ পুত্তলিকা দাহ করে। অবশ্য পাশাপাশি সারাদেশ থেকে জনাব আব্বাস আলী খানের নিকট অজস্র অভিনন্দন বার্তাও আসতে থাকে।

স্বৈরাচারী আইয়ুব বিরোধী গণতান্ত্রিক আন্দোলনে তিনি বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন। আইয়ুব বিরোধী আন্দোলনে বিরোধী দলগলো 'কপ', 'পিডিএম' এবং 'ডাক' নামে যেসব জোট গঠন করেছিল, তিনি ছিলেন এ জোটগুলোর অন্যতম নেতা। ১৯৬৯ সালের আইয়ুব বিরোধী গণঅভ্যূত্থানে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

জনাব আব্বাস আলী খান ১৯৭১ সালে পূর্বপাক মন্ত্রী সভায় শিক্ষামন্ত্রীর দায়িত পালন করেন। স্বাধীনতার পর আওয়ামী লীগ সরকার জনাব খানকে কারাগারে নিক্ষেপ করে। এ সময় তিনি দু'বছর জেল খাটেন।

আশির দশকে জামায়াতে ইসলামীর ভারপ্রাপ্ত আমীর হিসেবে তিনি রাজনৈতিক ময়দানে স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে আপোষহীন বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন। এসময় রাজধানী ঢাকাসহ সারা দেশের বিভিন্ন বিভাগ, জেলা ও থানা শহরে তিনি অসংখ্য বড় বড় জনসভায় ভাষণ দেন, বুদ্ধিজীবি ও সুধী সমাবেশে বক্তৃতা করেন। তাঁর শালীন, যুক্তিবাদী ও তেজস্বী বক্তৃতায় জনগণ স্বৈর শাসন বিরোধী আন্দোলনে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠে। গণতান্ত্রিক আন্দোলনে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালনের কারণে এ সময় তাঁকে কয়েকবার আটকও করা হয়।

দীনি ইল্‌ম ও চিন্তা গবেষণায় অগ্রগামিতা

ইসলামের ব্যাপারে তাঁর ইল্‌ম ও ফাহ্‌ম এবং জ্ঞান ও বুঝ ছিলো অগাধ ও দিবালোকের মতো পরিচ্ছন্ন। তিনি আধুনিক শিক্ষিত লোক ছিলেন, কিন্তু দীনের ইলম ও ফাহমের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন আলেমদেরও উস্তাদ। জামায়াতে ইসলামী হাজার হাজার আলেমের সংগঠন। অনেক বড় বড় খ্যাতিমান আলেমও এই সংগঠনে রয়েছেন। কিন্তু তাঁরা সকলেই মরহুম আব্বাস আলী খানকে নিজেদের উস্তাদ মনে করেন। উস্তাদের মতোই তিনি আমাদের তা'লীম ও তরবিয়ত দিয়েছেন। আব্বাস আলী খানের উপস্থিতিতে কোনো বড় আলেমও নিজেকে ইমামতির যোগ্য মনে করতেননা। তবে তিনি নিজেই আলেমদের অত্যন্ত সম্মান করতেন।

মরহুম আব্বাস আলী খান ছিলেন বাড় মাপের একজন ইসলামী চিন্তাবিদ। তাঁর রচিত গ্রন্থাবলীই এর সুস্পষ্ট প্রমাণ। ইসলামের উপর অনেক গ্রন্থই তিনি রচনা করেছেন। অনুবাদ করেছেন বহু গ্রন্থ। তাঁর রচিত ও অনূদিত গ্রন্থের সংখ্যা তিরিশের অধিক। তিনি ছিলেন একজন বড় ইতিহাসবিদ। তাঁর রচিত 'বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস' ইতিহাসের ছাত্র শিক্ষকদের জন্য এক অমূল্য সম্পদ। জামায়াতে ইসলামীর ইতিহাসও তিনিই লিখেছেন। তাঁর রচিত বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস, জামায়াতে ইসলামীর ইতিহাস, মাওলানা মওদূদী, মৃত্যু যবনিকার ওপারে, ঈমানের দাবি, স্মৃতি সাগরের ঢেউ বাংলাভাষাভাষী মুসলমানদের চিরদিন প্রেরণা যোগাবে। এছাড়া তাঁর রচিত আরো অনেক বই রয়েছে। এ নিবন্ধের শেষে তাঁর রচিত ও অনূদিত গ্রন্থাবলীর একটি তালিকা প্রদত্ত হলো।

বাংলা ইংরেজি ও উর্দু ভাষায় পারদর্শী জনাব আব্বাস আলী খান ছিলেন এক মহান বিদ্যুৎসাহী ব্যক্তিত্ব। শিক্ষাক্ষেত্রে রয়েছে তাঁর বিরাট অবদান। তিনি জয়পুরহাটে তা'লীমুল ইসলাম একাডেমী স্কুল এ্যান্ড কলেজ নামে একটি আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করেন।

১৯৭৯ সাল থেকে আমৃত্যু খান সাহেব ঢাকাস্থ সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রিসার্চ একাডেমীর চেয়ারম্যানের দায়ত্বি পালন করেন।

তিনি একাধিকবার হজ্জ ও ওমরা পালন করেন। ইসলামী সংগঠন ও সংস্থা সমূহের আহবানে দীনি ইল্‌ম ও দীনের আলো বিতরণের কাজে তিনি বিভিন্ন সময় যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, বৃটেন্, ফ্রান্স, জাপান মালয়েশিয়া, সিংগাপুর, সৌদি আরব, লিবিয়া, পাকিস্তান ও ভারত সফর করেন।

প্রিয় প্রভুর সান্নিধ্যে

অবশেষে তাঁর প্রিয় প্রভুর ডাক এলো। যে মহান আল্লাহর জন্যে জানমাল উৎসগ করে খান সাহেব সারাজীবন কাজ করেছেন এবার তাঁর দরবারে হাযির হবার পালা।

২১ জুলাই '৯৯ জামায়াতের কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার বৈঠক আরম্ভ হয়েছে। কিন্তু সিনিয়র নায়েবে আমীর জনাব আব্বাস আলী আলী খান অনুপস্থিত। তিনি সবসময়ই স্টেজে বৈঠকের সভাপতি আমীরে জামায়াত অধ্যাপক গোলাম আযমের ডান পাশ বসতেন। সবসময় তিনি বৈঠক শুরু হবার আগেই উপস্থিত হতেন। আজ সেই আসনটি খালি। শ্রদ্ধেয় খান সাহেবের অনুপস্থিতিরি কারণ জানার জন্যে আমরা সকলেই উদগ্রীব।

কিছুক্ষণ পর আমীরে জামায়াত জানালেন, তিনি খান সাহেবের পক্ষ থেকে একটি চিরকুট পেয়েছেন। তিনি লিখেছেন ঃ 'এক মাসের মধ্যে হঠাৎ আমার এক কেজি ওজন কমে গেছে। অসুস্থতা বোধ করছি। এখনই ডাক্তার দেখাবার প্রয়োজন।'

আমীরে জামায়াত অবিলম্বে খান সাহেবকে হাসাপাতালে নেবার জন্যে জামায়াতের অফিস সেক্রেটারীকে নির্দেশ দিলেন। তাঁকে হাসপাতালে নেয়া হলো। পরীক্ষা করা হলো। ডাক্তার বিস্মিত হলেন, তাঁর লিভার প্রায় সম্পূর্ণ ডেমেজ হয়ে গেছে। এ প্রক্রিয়া নিশ্চয়ই দীর্ঘদিন থেকে শুরু হয়েছে। কিন্তু খান সাহেব এতোদিন ব্যথা অনুভব না করে থাকলেন কিভাবে?

যাহোক, ডাক্তাররা চিকিৎসা শুরু করলেন। তবে তাঁরা বললেন, এখন আর অবনতি ছাড়া লিভারের অবস্থা উন্নতি হবার কোনো সম্ভাবনা নেই। বিদেশে নিয়েও কোনো লাভ হবেনা।

শেষ পর্যন্ত তাই হলো। তাঁর অবস্থার আর উন্নতি হলোনা। ক্রমান্বয়ে খাবার রুচি শেষ হয়ে গেলো। তিনি এগিয়ে চললেন অন্তিম অবস্থার দিকে। অবশেষে তাঁর 'আজাল' (মৃত্যুর সুনির্দিষ্ট দিন) এসে উপস্থিত হলো। তাঁর প্রিয় প্রভু তাঁকে ডাক দিলেন ঃ

> "হে প্রাশান্ত আত্মা! সন্তুষ্টচিত্তে ফিরে আসো তোমার প্রভুর কাছে। তোমার প্রভু তোমার প্রতি সন্তুষ্ট। এসো, মিলিত হও আমার প্রিয় দাসদের সাথে আর দাখিল হয়ে যাও আমার (তৈরী করে রাখা) মনোরম উদ্যানে।" (আল কুরআন ৮৯ ঃ ২৭-৩০)

সেদিন ছিলো ৩ অক্টোবর '৯৯। সময় ছিলো অপরাহ্ন ১.১৫ টা। তিনি ইনতিকাল করলেন। এই ক্ষণস্থায়ী দুনিয়া ত্যাগ করে প্রিয় প্রভুর সাথে মিলিত হাবার জন্যে পাড়ি জমালেন তিনি মহাজীবনের পথে।

খবর ছড়িয়ে পড়লো সর্বত্র। নেমে এলো শোকের ছায়া। সাথী, সহকর্মী ও ভক্ত অনুরাগীরা ফেললেন চোখের পানি।

আমীরে জামায়াত ছিলেন সফর ব্যাপদেশে সৌদি আরবে। প্রিয় সাথীর ইনতিকালের খবর শুনামাত্র ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। সফর সংক্ষেপ করে জরুরিভাবে ছুটে এলেন ঢাকায়। এসময় তাঁর প্রিয় সাথীর কফিন পল্টন ময়দানের উদ্দেশ্যে নেয়া হচ্ছে। পুরানা পল্টনে ঢাকা মহানগর জামায়াতের অফিস চত্বরে ক্ষণিকের জন্যে কফিনবাহী গাড়ি থামানো হলো। মুখমন্ডল উম্মুক্ত করা হলো। অশ্রুসজল অধ্যাপক গোলাম আযম তাঁর প্রিয় সাথীর কপালে শেষ চুম্বন করলেন।

৪ অক্টোবর বাদ জোহর পল্টন ময়দানে অনুষ্ঠিত হয় বিশাল জানাযা। ইমামিত করেন আমীরে জামায়াত অধ্যাপক গোলাম আযম।

৪ অক্টোবর দিবাগত রাত পৌনে দুইটায় বগুড়ায় তাঁর দ্বিতীয় জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। ইমামতি করেন মাওলানা আবদুর রহমান ফকীর।

৫ অক্টোবর তাঁর শেষ জানাযা অনুষ্ঠিত হয় জয়পুরহাট শহরের সিমেন্ট ফ্যাক্টরীর বিশাল ময়দানে। ইমামতি করেন জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারী জেনারেল মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী। দৈনিক ইত্তেফাক লিখেছে, এ জানাযায় লক্ষাধিক লোক উপস্থিত হয়েছে।

জয়পুরহাট শহরে খান সাহেবের নিজ বাড়ির অঙ্গিনায় তাঁকে সমাহিত করা হয়। মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী তাঁর কফিন কবরস্থ করেন। ৫ অক্টোবর সকালে জনতার চাপে কয়েক ঘন্টার জন্যে জয়পুরহাট শহর অচল হয়ে পড়েছিল।

আব্বাস আলী খানের মহোত্তম গুণাবলী ঃ

মহরহুম আব্বাস আলী খান পবিত্রতা পরিচ্ছন্নতা, নিয়্যতের নিষ্ঠা ও ইখলাস, তাকওয়া ও পরহেযগারী, আদল ও ইহসান, ইবাদত বন্দেগী ও ইত্তেবায়ে রসূলের দিক থেকে এবং ইকামতে দীনের আন্দোলনের ময়দানে সবর, ইস্তিকামাত, কুরবানী ও ইতমীনানে কল্‌বের দিক থেকে ছিলেন 'আস্‌-সাবিকুনাস্‌ সাবিকূন'? অর্থাৎ অগ্রগামীদের মধ্যে যারা অগ্রগামী তাদেরই অন্তর্ভুক্ত।

ইবাদত বন্দেগীতে অগ্রগামীতা

বড় তাহাজ্জদ গুজার ছিলেন তিনি। ফরয ওয়াজিব ও সুন্নত নামায সমূহ তো বটেই, নফল নামায সমূহও তিনি নিয়মিত আদায় করতেন। নামাযের হিফাযতের ক্ষেত্রে এবং খুশূ-খুজুর সাথে নামায পড়ার ক্ষেত্রে তাঁর অগ্রগামীতা আমাদেরকে সাহাবায়ে কিরামের কথা স্মরণ করিয়ে দিতো। পঁচাশি বছর বয়সেও বিশ রাকা'ত তরাবীহর নামায পড়তেন। আমরা তাঁরই ইমামতিতে তরাবি পড়তাম। আমাদের জোয়ানদের মধ্যে কেউ যদি কখনো বিশ রাকা'তের কম পড়ার কথা বলতো, তখন তিনি বলতেন, রমযান মাসতো দু'হাতে সওয়াব কামাই করার মাস! এ মাসে যতো বেশি সওয়াব সঞ্চয় করা যায়, ততোই লাভ। তিনি উদাহরণ দিয়ে বলতেন তাবেয়ী ও

তাবে তাবেয়ীদের যুগে মক্কার লোকেরা বিশ রাকা'ত তারাবি পড়ছে শুনে মদীনার লোকরা ছত্রিশ রাকা'ত পড়তে শুরু করে দিয়েছিল। এটা ছিলো সওয়াব অর্জনের প্রতিযোগিতা। তিনি প্রায়ই নফল রোযা রাখতেন, সপ্তাহে একটি রোযা রাখতেন।

কথাবার্তা ও বক্তৃতা

মরহুম আব্বাস আলী খান কখনো মিথ্যে কথা বলাতো দূরের কথা, কখনো কোনো কথাকে ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে পর্যন্ত বলতেননা। কখনো তিনি কৃত্রিম কথা বলেননি। প্রতিশ্রুতি ভংগ করেননি কখনো। কখনো কাউকেও মন্দ কথা বলেননি। বক্তৃতায় হোক, ব্যক্তিগত আলাপচারিতায় হোক, কখনো কারো ব্যাপারে তিনি কোনো অশালীন কথা উচ্চারণ করেননি। রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে গালাগাল করাতো দূরের কথা, কখনো কারো মর্যাদা হানিকর কোনো কথা তিনি বলেননি। তাঁর বক্তব্য হতো খুবই বলিষ্ঠ ও স্পষ্ট। আলাপচারিতায় কখনো কখনো নির্দোষ রসিকতা করতেন। বেশি সময় নীরব থাকতেন। কম কথা বলতেন। অর্থবহ কথা বলতেন। প্রত্যেককে সম্মানজনক সম্বোধন করতেন। তাঁর বক্তব্য হতো হৃদয়গ্রাহী, জ্ঞান গর্ভ ও শিক্ষণীয়।

পবিত্রতা, আনুগত্য শৃংখলা ও সময়ানুবর্তিতা

ব্যক্তিগত জীবনে ছিলেন তিনি খুবই পবিত্র পরিচ্ছন্ন ও সুশৃংখল। ভদ্র, মার্জিত ও পরিপাটি জীবন যাপন করতেন। তিনি অত্যন্ত রুচিবান ছিলেন। নিজের কাজ নিজেই করতেন। মৃত্যুর সময় তাঁর পঁচাশি বছর বয়েস হয়েছে, এই বয়স পর্যন্ত তিনি নিজের কাপড় চোপড় নিজেই ধুইতেন। নিজেই ইস্ত্রি করতেন। নিজের ঘরে অন্যান্য ব্যক্তিগত কাজ নিজেই করতেন। তিনি সব কাজেই পানচুয়াল ছিলেন। ঠিক সময় বৈঠকে উপস্থিত হতেন। কম বয়েসীরা তাঁর পূর্বে হাজির হতে পারতো খুব কমই। নামাযের জামাতে সামনের কাতারে গিয়ে বসতেন। কিন্তু আমরা কম বয়েসীরা পেছনের কাতারে গিয়ে জায়গা পাওয়াও কঠিন হয়। বৈঠকাদিতে ঠিক সময়ে উপস্থিত হতেন। কখনো কখনো নির্দিষ্ট সময়ের আগেই উপস্থিত হতেন। তিনি জামায়াতের নায়েবে আমীর ছিলেন। তাঁর বয়স আমীরে জামায়াতের চাইতে আট বছর বেশি ছিলো। কিন্তু তিনি সাধারণ কর্মীর মতোই তাঁর আনুগত্য করতেন। বাংলাদেশ হবার পর কিছু দিন তিনি ঢাকা মহানগরী জামায়াতের সাথে কাজ করেন। এ সময় ঢাকা মহানগরী জামায়াতের আমীর ছিলেন মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী। একজন বালকের মতোই ছেলের বয়েসী মাওলানা নিজামীর তিনি আনুগত্য করেছেন। আনুগত্য শৃংখলার তিনি ছিলেন এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

ইসলামী আন্দোলনে জান প্রাণ নিয়োগ

আমরা যুবকরা যা করতে পারিনা তিনি সকল ক্ষেত্রেই স্বাভাবিকভাবে তা করে যেতেন। ইবাদত বন্দেগীতে তো তিনি অগ্রগামী ছিলেনই, অন্যসকল ক্ষেত্রেও তিনি অগ্রগামী ছিলেন। তাঁকে দেখেছি সফর থেকে এসেছেন, জনসভা থেকে বক্তৃতা করে এসেছেন, কিংবা মিটিং বা বৈঠক সেরে এসেছেন এসেই চেয়ারে বসে কলম ধরে

লেখা শুরু করেছেন, যেনো তাঁর কোনো ক্লান্তি নেই, যেনো তাঁর কোনো বিশ্রামের প্রয়োজন নেই।

এ পঁচাশি বছর বয়সেও তাঁকে বিভিন্ন জেলায় সাংগঠনিক সফর দেয়া হতো। তিনি খুশি মনে এসব সফর করেতেন । বহু জেলায় যাতায়াতের রাস্তা খুব খারাপ। তাঁর অনেক কষ্ট হতো। কিন্তু কখনো তিনি নিজের কষ্টের কথা প্রকাশ করতেননা। মাত্র কয়েক মাস আগে এক সীমান্তবর্তী জেলা থেকে ফেরার পথে আমি তাঁর সফর সঙ্গী ছিলাম। পথে এসে গাড়ীর ইঞ্জিনে ত্রুটি দেখা দেয়। প্রায় তিন ঘন্টা রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। কিন্তু তাঁকে বিন্দুমাত্র বিরক্তি প্রকাশ করতে দেখিনি।

তাঁর জীবনটাই তিনি ইসলামী আন্দোলনের কাজে উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন। এই বৃদ্ধ বয়সে যুবকের মতোই ছুটে বেড়িয়েছেন। দীর্ঘদিন জামায়াতের ভারপ্রাপ্ত আমীরের দায়িত্ব পালন করার কারণে অনেক সময় তিনি বিশ্রাম করার সময়ও পেতেননা। এমন অনেকবার হয়েছে, তিনি দুপুরে একটু বিশ্রাম নিতে গিয়েছেন অমনি কোনো জরুরি সভা, সাংবাদিক সম্মেলন, কিংবা সাক্ষাতের জন্যে তাঁকে উঠে আসতে হয়েছে। বিরক্ত হননি কখনো।

তিনি বাংলাদেশের রাজনীতি, ইসলামী আন্দোলন এবং জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের ইতিহাসের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। বরং তিনি নিজেই ইতিহাস এবং ইতিহাসের অন্যতম পুরোধা।

ইসলামী জনশক্তির প্রেরণা

মরহুম আব্বাস আলী খান ছিলেন জামায়াতে ইসলামীর গোটা জনশক্তির প্রেরণা। পল্টন ময়াদানে মরহুমের জানাযার অনুষ্ঠানে বক্তব্য দান কালে আমীরে জামায়াত অধ্যাপক গোলাম আযম আবেগ জড়িত কণ্ঠে বলেছেন ঃ "মরহুম আব্বাস আলী খান আমার আট বছরের বড়। পচাঁশি বছর বয়সেও তিনি যেভাবে আন্দোলনের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করতেন, তাতে আমি তাঁর থেকে প্রেরণা লাভ করতাম।

মরহুম আব্বাস আলী খান সংগঠনের সকল স্তরের জনশক্তির প্রিয় নেতা ছিলেন। সকলেই তাঁকে প্রাণ খুলে ভালো বাসাতো। তিনি যখন সংগঠনের অভ্যন্তরীণ সম্মেলনে কিংবা প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে বক্তব্য রাখতেন অথবা কুরআনের দরস পেশ করতেন, তাঁর বক্তব্য এতোই মর্মস্পর্শী হতো যে, উপস্থিত সকলেই ঈমানী জযবায় আবেগাপ্লুত হয়ে উঠতো, সকলের চোখই অশ্রুসিক্ত হতো, গন্ড বেয়ে গড়িয়ে পড়তো সবারই চোখের পানি।

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের তিনি ছিলেন দ্বিতীয় পুরোধা প্রাণপুরুষ। জামায়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী র. যে নির্ভেজাল আকীদা, উদ্দেশ্য, দাওয়াত ও কর্মসূচি নিয়ে জামায়াতে ইসলামী প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তিনি ছিলেন সেই নির্ভেজাল ধারার বলিষ্ঠ প্রবক্তা এবং একনিষ্ঠ অনুসারী। তিনি ইদানিং আন্দোলনের জনশক্তির মধ্যে কিছুটা মানগত অবনতি লক্ষ্য করেন। এতে

তিনি ভয়ানক পেরেশান হয়ে পড়েন। জনশক্তির মানোন্নয়নের জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করেন। জনশক্তিকে এ ব্যাপারে সতর্ক করার জন্যে "একটি আদর্শবাদী দলের পতনের কারণ" শিরোনামে একটি পুস্তিকাও রচনা করেন। এ পুস্তিকা আন্দোলনের সর্বস্তরের জনশক্তির চোখ কান খুলে দেয়।

মরহুম খান সাহেবের মকবুলিয়াত

মরহুম আববাস আলী খান যেমন আল্লাহর কাছে প্রিয় ও মকবুল ছিলেন, তেমনি এদেশের ইসলাম প্রিয় জনতার তিনি ছিলেন প্রাণ প্রিয় নেতা। পল্টন ময়াদানে তাঁর জানাযায় মানুষের ঢল নেমেছিল। তাঁর কফিন নিয়ে যখন আমরা জয়পুরহাট যাচ্ছিলাম, রাত পৌনে ২টায় বগুড়া পৌছে দেখি সেখানে এতো রাত পর্যন্ত হাজার হাজার মানুষ তাঁর জানাযায় শরীক হবার জন্যে অপেক্ষা করছে। পাঁচ অক্টোবর জয়পুরহাট সিমেন্ট ফ্যাক্টরীর বিশাল ময়দানে লক্ষ মানুষের প্রাণাবেগ জড়িত যে জানাযার নামায দেখেছি এবং তাঁর চেহারাটি এক নযর দেখার জন্যে মানুষের মধ্যে যে ব্যাকুলতা দেখেছি তাতে আমার দৃঢ় প্রত্যয় জন্মেছে, আসমানেও যেমন যমীনেও তেমন তিনি সকলের ভালবাসা ও নৈকট্য অর্জন করেছেন।

আব্বাস আলী খান রচিত গ্রন্থাবলী

১. জামায়াতে ইসলামীর ইতিহাস
২. জামায়াতে ইসলামীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস
৩. বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস
৪. মাওলানা মওদূদী ঃ একটি জীবন একটি ইতিহাস একটি আন্দোলন
৫. আলেমে দীন মাওলানা মওদূদী
৬. মাওলানা মওদূদীর বহুমুখী অবদান
৭. মৃত্যু যবনিকার ওপারে
৮. ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের কাংক্ষিত মান
৯. ঈমানের দাবী
১০. ইসলাম ও জাহেলিয়াতের চিরন্তন দ্বন্দ্ব
১১. একটি আদর্শবাদী দলের পতনের কারণ ঃ তার থেকে বাচার উপায়
১২. ইসলামী বিপ্লব একটি পরিপূর্ণ নৈতিক বিপ্লব
১৩. সমাজতন্ত্র ও শ্রমিক
১৪. MUSLIM UMMAH
১৫. স্মৃতি সাগরের ঢেউ
১৬. বিদেশে পঞ্চাশ দিন
১৭. যুক্তরাজ্যে একুশ দিন
১৮. বিশ্বের মনিষীদের দৃষ্টিতে মাওলানা মওদূদী

১৯. ইসলামী আন্দোলন ও তার দাবি
২০. দেশের বাইরে কিছুদিন

তাঁর অনূদিত গ্রন্থাবলী

১.	পর্দা ও ইসলাম	সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী
২.	সীরাতে সরওয়ারে আলম (২ - ৫ খন্ড)	ঐ
৩.	সূদ ও আধুনিক ব্যাকিং (সহ-অনুবাদ)	ঐ
৪.	বিকালের আসর	ঐ
৫.	আদর্শ মানব	ঐ
৬.	ইসলাম ও সামাজিক সুবিচার	ঐ
৭.	জাতীয় ঐক্য ও গণতন্ত্রের ভিত্তি	ঐ
৮.	ইসলামী অর্থনীতি (সহ-অনুবাদ)	ঐ
৯.	ইসরা ও মিরাজের মর্মকথা	ঐ
১০.	মুসলমানদের অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যতের কর্মসূচী	ঐ
১১.	একটি ঐতিহাসিক সাক্ষাৎকার	ঐ
১২.	পর্দার বিধান	ঐ
১৩.	ইসলামের পূর্ণাঙ্গ রূপ	মাওলানা সদরুদ্দিন ইসলাহী
১৪.	আসান ফিকাহ (১ - ২ খন্ড)	মাওলানা ইউসুফ ইসলাহী
১৫.	তাসাউফ ও মাওলানা মওদূদী	মাওলানা আবু মনযুর শায়খ আহমদ

আব্বাস আলী খানের মৃত্যুতে বাংলাদেশের মুসলমানরা নিজেদের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব এবং জাতীয় আদর্শ ও চেতনার মূল ধারার এক পুরোধা প্রবক্তাকে হারালো। তাঁর মৃত্যুতে জাতীয় ইতিহাস ও ঐতিহ্যের এক সুবিজ্ঞ পন্ডিতের তিরোধান ঘটলো। তাঁর ইন্তিকালে ইসলামী আন্দোলনের হাজারো লাখো কর্মী বাহিনী তাদের এক বলিষ্ঠ প্রাণ পুরুষ ও প্রাণ প্রিয় নেতাকে হারালো।

আল্লাহ তাঁকে জান্নাতুন নায়ীম দ্বারা পুরস্কৃত করুন।
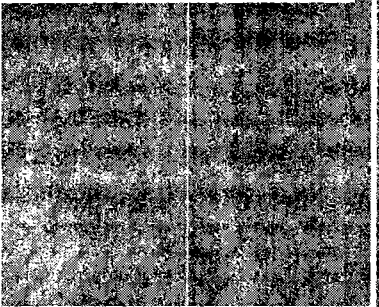
তোমরা আনুগত্য করো আল্লাহ্‌র এবং এই রসূলের আর তোমাদের নেতৃত্ব দানকারীদের। (আল কুরআন ৪ঃ৫৯)

আমীরে জামায়াত অধ্যাপক গোলাম আযমের কলম থেকে

অধ্যাপক গোলাম আযম জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের সম্মানিত আমীর। তিনি শুধু বাংলাদেশেরই নন, বিশ্ব ইসলামী আন্দোলনেরও অন্যতম প্রধান নেতা। মরহুম আব্বাস আলী খান ছিলেন তাঁর প্রিয় সাথী। তাঁরই দাওয়াত ও অনুপ্রেরণায় খান সাহেব জামায়াতে ইসলামীতে যোগদান করেন এবং তাঁরই মাধ্যমে রুকনিয়াতের শপথ গ্রহণ করেন। মরহুম আব্বাস আলী খান বয়েসে আমীরে জামায়াতের চেয়ে আট বছরের বড় ছিলেন। কিন্তু নায়েবে আমীর হিসেবে তিনি আমীরে জামায়াত অধ্যাপক গোলাম আযমের পূর্ণ আনুগত্য করেছেন। এ নিবন্ধে মুহতারাম আমীরে জামায়াত তাঁর প্রিয় সাথী মরহুম আব্বাস আলী খান সম্পর্কে হৃদয়ের পবিত্র অনুভূতি ব্যক্ত করেছেন। - সম্পাদক

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার প্রায় দেড়শ সদস্যের মধ্যে মরহুম জনাব আব্বাস আলী খান সবচেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন। কিন্ত আমরা সকলেই গৌরব বোধ করতাম যে আল্লাহর রহমতে বয়োবৃদ্ধদের মধ্যে তাঁর স্বাস্থ্যই সবচেয়ে ভালো ছিল। আজকাল ডাইবেটিস ত আমাদের মধ্যে অনেকেরই আছে। বেশ কয়েকজনের ব্লাড প্রেসার এবং হার্টের প্রবলেমও আছে। এ তিনটার কোনটাই খান সাহেবের ছিলনা বলে আমি তাঁকে প্রেরণার উৎস মনে করতাম। সুস্থ থাকলে আশির উপর বয়স হলেও কাজ করা যায় - তাঁকে দেখে এটাই আমাদের প্রেরণার বিষয় ছিল। তিনি আজীবন স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলেছেন। খাওয়া-শোয়া ইত্যাদির ব্যাপারে তিনি নিয়ম মেনে চলতেন এবং এ কারণেই পঁচাশি বছর বয়সে পদার্পণ করেও তিনি যুবক বয়সের অভ্যাসমত কাজ করতে পেরেছেন যা আমাদের সকলের জন্যই আদর্শ বলে অনুভব করতাম। শেষ বয়সেও তিনি দু'হাত পেছনে রেখে সমতলে হাটার মতই আলফালাহ মিলনায়তেনর সিঁড়ি বেয়ে একা একা চতুর্থ তলায় উঠে যেতেন।

আল্লাহ তায়ালা এসব রোগ থেকে খান সাহেবকে মুক্ত রেখেছিলেন। কয়েক বছর আগে তাঁর হার্টে একটু প্রবলেম দেখা দিয়েছিল এবং ডাক্তার এন. জি. ও. গ্রাম করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। আল্লাহর রহমতে হোমিও ঔষধের অছীলায় তিনি সুস্থ হয়ে যান বলে বাকী জীবন তাঁর হার্টের কোন সমস্যা হয়নি।

কি সুন্দর মৃত্যু!

মৃত্যু ত অবশ্যই অনিবার্য। দুরকম মৃত্যু বড়ই বেদনায়ক। তার একটি হ'ল হঠাৎ মৃত্যু। যার এ মৃত্যু হয় তিনি তার কোন দায়িত্বই কাউকে বুঝিয়ে দেবার সুযোগ পান না। বিশেষ করে দেনা থেকে মুক্ত হওয়ার সময়ও পান না। প্রত্যেকেরই ব্যক্তিগত এমন কিছু বিষয় থাকে যা তিনি ছাড়া আর কেউ জানেন না। হঠাৎ মৃত্যু হলে উত্তরাধীকারীদের অসিয়ত করার সুযোগ থেকেও বঞ্চিত হয়। আর এক প্রকার বেদনায়ক মৃত্যু হলো দীর্ঘকাল শয্যাগত থাকা। খান সাহেবের স্ত্রী দশ বছরেরও বেশী সময় শয্যাগত থাকায় নিজেও দীর্ঘ সময় কষ্ট পেয়েছেন। তাঁর একমাত্র কন্যা সন্তানকে এ দীর্ঘ সময় খেদমত করতে হয়েছে।

রাসূল (সাঃ) এ দু'রকম বেদানাদয়াক মৃত্যু থেকেই আল্লাহর নিকট আশ্রয়

চেয়েছেন। এ দোয়া খান সাহেব নিজের জন্যেও করতেন কিনা জানিনা। তবে আল্লাহতায়ালা তাঁকে এ'দুরকম মৃত্যু থেকেই হেফাযত করেছেন। শয্যাগত অবস্থায় ত তিনি মাত্র দু'মাস দুনিয়ায় ছিলেন। মৃত্যুর মাত্র আড়াই মাস আগে তাঁর কঠিন রোগ ধরা পড়ে। ২১শে জুলাই '৯৯ মাজলিসে শূরার অধিবেশন শুরু হয়। আমি সভাপতির আসনে বসে আমার ডানদিকের চেয়ার খালি দেখে বিস্মিত হই। খান সাহেব আমার আগেই সাধারণত পৌঁছেন। তাঁকে অনুপস্থিত দেখে আমি জানতে চাইলাম, খান সাহেব এখনও আসেননি কেন? ঠিক তখনি তাঁর খাদেম এক টুকরা কাগজ এনে আমার হাতে দিল। তাতে লেখা ছিল "আমি হঠাৎ করে অসুস্থতা বোধ করছি এবং গত একমাসে আমার ওজন ৫ কে. জি. কমে গেছে। ডাক্তারের কাছে যাওয়া দরকার মনে করছি।" আমি সংগে সংগে জামায়াতের কেন্দ্রীয় অফিস সেক্রেটারী অধ্যাপক মাযহারুল ইসলামকে বললাম যেন অবিলম্বে খান সাহেবকে ইবনে সিনা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করেন।

শূরার তিন দিনব্যাপী অধিবেশনে এই সর্বপ্রথম তিনি সম্পূর্ণ অনুপস্থিত রইলেন। ডাক্তারী পরীক্ষা নিরীক্ষার পর তাঁর লিভার সিরোসিস হয়েছে জানতে পেরে আমরা পেরেশান হলাম। লিভারের অভিজ্ঞ বড় ডাক্তার এ. কিউ. এম. মুহসীন তাঁর লিভারের অবস্থা জেনে অত্যন্ত বিস্মিত ও দুঃখিত হলেন। বিস্মিত হওয়ার কারণ, তিনি বললেন যে লিভার সম্পূর্ণ damage হয়ে গেল অথচ এতদিন পর ব্যথা বেদনা শুরু হল- এটা ত অস্বাভাবিক। যদি আগে রোগ ধরা পড়ত তাহলে চিকিৎসা করার সুযোগ থাকত। এখন যে অবস্থায় পৌঁছছে তাতে চিকিৎসায় কোনই সুফল পাওয়ার সম্ভাবনা নেই। এই অবস্থা ত দু'চার মাসে হয়নি। অনেক আগেই তাঁর বেদনা বোধ করার কথা। কিন্তু খান সাহেব দীর্ঘদিন কোন ব্যথা বেদনা বোধ না করাটা সত্যিই বিস্ময়কর। তিনি দুঃখ প্রকাশ করলেন এ কথা বলে যে, বছরে নিয়মিত এক দু'বার স্বাস্থ্যের চেকআপ করা উচিত ছিল। তাহলে যথাসময়ে রোগ ধরা পড়ত এবং চিকিৎসাও সম্ভব হত। ডাক্তারের একথা ঠিক। কিন্তু রোগী যদি নিজেই টের না পায় যে তাঁর কঠিন অসুখ হয়েছে তাহলে ডাক্তারের কাছে যাবে কি করে?

১৯৯৪ সালের অক্টোবর মাসে ডাঃ আবদুল ওয়াহহাব আমার Prostrate Gland Operation করেছেন। Operation থিয়েটারেই তিনি খান সাহেব সম্পর্কে মন্তব্য করলেন, কয়েক মাস আগে আমি আব্বাস আলী খানের Prostrate Gland-এর অপারেশন করলাম। তাঁর অবস্থা এমন serious ছিল যে প্রশাব-এর সাথে প্রচুর রক্ত ক্ষরণ হলো। তাই তাড়াহুড়া করে হাসপাতালে এনেই অপারেশন করা হলো। তাঁর প্রশ্রাব নালী থেকে যে বর্জ্য পদার্থ বের করা হলো তার ওজন ২০০ গ্রাম ছিল। আমি হাজার হাজার Operation করেছি কিন্তু এত serious আবস্থার কোন রোগীকে আর দেখিনি।"

এ অবস্থা ত হঠাৎ করে হয়নি। প্রশ্রাবের সংগে রক্ত যাওয়ার অনেক আগে থেকেই প্রশ্রাবের রাস্তা block হওয়ার কারণে ব্যথা-বেদনার কষ্ট পাওয়ার কথা। এতদিন তিনি এ অবস্থায় ছিলেন কি করে এটা বিস্ময়ের বিষয়। সবশেষে ডাক্তার সাহেব

বললেন, "আপনাদের মত আল্লাহওয়ালাদের কারবারই মনে হয় আলাদা। ডাক্তারী বিদ্যা দিয়ে আপনাদের অবস্থা বিচার করা অসম্ভব।"

এবার লিভার সিরোসিস ধর পড়ার পর তিনি মাত্র ৯ সপ্তাহ বেঁচে ছিলেন। এক হোমিও ডাক্তার তাঁকে ঔষধ দিতেন যাতে ব্যথা-বেদনা কম হয়। তিনি ৩রা অক্টোবর ইন্তিকাল করেন। ২১শে সেপ্টেম্বর সৌদী আরব যাওয়ার আগের দিন সন্ধ্যায় তাঁর সাথে আমার সর্বশেষ সাক্ষাৎ। এর দিন দশেক আগেও তাঁকে দেখতে যাই। এরও এক সপ্তাহ আগে দেখতে গিয়েছিলাম। এ তিনবারের কোন বারই ব্যথায় কাতরাতেও দেখলাম না এবং অস্থিরতা প্রকাশ করতেও দেখলাম না। চোখ বন্ধ করে শুয়ে থাকতেন। কিছু জিজ্ঞেস করলে ইশারায় জওয়াব দিতেন। সর্বশেষ সাক্ষাতের দিন অস্পষ্ট স্বরেও কোন কথা বলেননি। এর আগের দিনে চোখ খুলে তাকালেন, খাওয়ার রুচি বেড়েছে কিনা জিজ্ঞেস করলে একটু মুচকি হেসে সম্মতি জানালেন। নিম্নস্বরে দু'একটি কথাও বললেন। এটা তাঁর ইন্তিকালের মাত্র তিন সপ্তাহ আগের কথা। আমি অনুভব করলাম তাঁর মৃত্যু কতইনা সুন্দর। হঠাৎ মৃত্যু হলোনা। দীর্ঘকাল বিছানায় পড়েও থাকতে হলোনা। কতই প্রশান্ত অবস্থায় নীরবে আপন প্রভুর নিকট ফিরে গেলেন।

তাঁর তিরোধানের বেদনা

জনাব আব্বাস আলী খান সাহেবের উপর কেন্দ্রীয় জামায়াতের কয়েকটি দায়িত ন্যাস্ত ছিল। আমি দেশের বাইরে গেলে আমার অনুপস্থিতিতে ভারপ্রাপ্ত আমীরের দায়িত্ব, দেশের বিভিন্ন স্থানে জনসভার প্রধান অতিথির দায়িত্ব, জিলা পর্যায়ে রুকন সম্মেলন, কর্মী সম্মেলন ও সুধী সমাবেশে প্রধান অতিথির দায়িত্ব, ছাত্র শিবিরের বিভিন্ন প্রোগ্রামে এবং বিভিন্ন ধরনের সেমিনার ও সিম্পোজিয়ামের বক্তব্য রাখার দায়িত্ব এবং রমযানে ঢাকা মহানগরীসহ গুরুত্বপূর্ণ শহরে ইফতার মাহফিলে ভাষণ প্রদান, প্রবাসী বাংলাদেশীদের দাওয়াতে সফরে গমন ইত্যাদি দায়িত্ব তিনি পালন করতেন। এখন তাঁর অভাব সংগঠনের সর্বস্তরে বহুদিন তীব্রভাবে অনুভূত হবে।

ইসলামী আন্দোলনে তাঁর যে দীর্ঘ অভিজ্ঞতা এবং ইসলামী সাহিত্যে তাঁর যে গভীর পান্ডিত্য ছিল তার ফলে কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরা ও কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদে বিভিন গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে তাঁর সুচিন্তিত মতামত সিদ্ধান্ত গ্রহণে অত্যন্ত সক্রিয় ভূমিকা পালন করত। জামায়াতে ইসলামী এদিক দিয়ে চিরকালের জন্য তাঁর মূল্যবান মতামত থেকে বঞ্চিত হলো। ব্যক্তিগতভাবে তাঁর সাথে আমার যে ঘনিষ্ট সম্পর্ক ছিল তার ফলে তাঁর সংগে বিভিন্ন বিষযে পরামর্শের সুযোগ পেতাম। এ সুযোগও আর আমার জীবনে পাবোনা। এদিক থেকে আমি তার মত একজন আল্লাহওয়ালা মানুষের সান্নিধ্য ও বন্ধুত্ব হারালাম। এভাবে তাঁর তিরোধানে বিভিন্ন দিক দিয়ে ইসলামী আন্দোলনে যে শূন্যতা সৃষ্টি হয়েছে তা পূরণ হওয়া সহজ নয়।

বহু গুণের সমাবেশ

মরহুম আব্বাস আলী খান বয়সের দিক দিয়ে ত আমার মুরুব্বী ছিলেনই, দ্বীনের ইল্‌ম, মজবুত ঈমান, উন্নত নৈতিক চরিত্র, তাকওয়া, দ্বীনদারী, আল্লাহর খাঁটি প্রেমিক হিসেবেও আমার অত্যন্ত শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন।

আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর মধ্যে অনেক গুণের সমাবেশ ঘটিয়েছিলেন। একজনের মধ্যে এতসব গুণ খুব কম লোকের ভাগ্যেই জোটে।

প্রথমতঃ তাঁকে আমি সত্যের অত্যন্ত নিষ্ঠাবান সাধক মনে করি। জামায়াতে ইসলামীতে আসার পূর্বে তাসাউফের লাইনে অগ্রসর হয়ে ফুরফুরা শরীফের খলীফা হওয়ার মর্যাদায় অধিষ্ঠিত থাকা সত্ত্বেও ইসলামী আন্দোলনের পথে এগিয়ে আসতে সামান্য দ্বিধাও অনুভব করেননি। ফুরফুরার মরহুম পীর হযরত মাওলানা আবুবকর সিদ্দিকীর পুত্র আবদুল হাই সিদ্দীকি (রহঃ)-এর সান্নিধ্য উনি পেয়েছিলেন। তাসাউফের সাথে সাথে তিনি দ্বীনি ইলমের চর্চা যথেষ্ট করতেন। তাই ইকামতে দ্বীনের ডাকে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি সাড়া দিতে সক্ষম হয়েছেন। তাঁর মত জ্ঞানী এবং উন্নত চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তি পীরের খলীফা হিসেবে লোকদের মুরিদ করতে চাইলে তিনি খ্যাতিমান পীরও হতে পারতেন।

দ্বিতীয়তঃ তিনি উচ্চমানের একজন সাহিত্যিক ছিলেন। তাঁর 'স্মৃতি সাগরে ঢেউ' বইতে সাহিত্য রসিক হিসেবে তাঁর পরিচয় মেলে। উনি নিজেও যে বেশ রসিক ছিলেন তাঁর পরিচয়ও এই বইতে যথেষ্ট রয়েছে। পাঠকের নিকট কোন বক্তব্য উপভোগ্য আকারে পেশ করার যে যোগ্যতা তাঁর ছিল তা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। ইসলামী আন্দোলনের প্রয়োজনে তিনি যে কয়টি গ্রন্থ রচনা করেছেন তা বড়ই সুখপাঠ্য। তিনি আরও ১/২ বছর হায়াতে থাকলে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের বিস্তারিত ইতিহাস উপহার দিয়ে যেতে পারতেন। তিনি এ কাজ শুরু করেছিলেন কিন্তু সমাপ্ত করার সুযোগ পেলেন না।

তৃতীয়তঃ আল্লাহ্ পাক তাঁকে বিরল স্মৃতি শক্তি দান করেছিলেন। তিনি বয়সে আমার মরুব্বী হওয়ার কারণে এবং পরহেযগার হিসেবে তাঁকে আমি শ্রদ্ধা করতাম বলে প্রায়ই জামায়াতের সমাবেশে তাঁকে আমি ইমামতি করতে দিতাম। তিনি কুরআনের এমন সব জায়গা থেকে নামাযে আয়াত পড়তেন যা আমার মুখস্থের বাইরে। হাফেজ ছাড়া আর কাউকেও ধরনের uncommon জায়গা থেকে আয়াত পড়তে আমি শুনিনি। বিস্ময়ের বিষয় যে কোন দিন তাঁকে নামাযের কেরাতের লোকমা দেয়ার দরকার হয়নি। যা তিনি মুখস্ত করেছিলেন তা যেন স্থায়ীভাবে মুখস্থ ছিল। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করতাম আপনি কি কুরআনে হাফেয? তিনি শুধু একটু মুচকি হাসতেন।

সেই ছাত্র জীবনে - যৌবনকালে যে সব কবিতা তিনি মুখস্থ করেছিলেন তা কেমন করে মুখস্থ রাখলেন তা আমার কাছে বিস্ময়। এই কয়েক মাস আগে মাত্র ইঞ্জিনিয়ার্স ইন্সটিটিউটে নজরুলের বার্ষিকী অনুষ্ঠানে নজরুলের এক হাস্য রসাত্মক বিরাট কাবিতা অনর্গল আবৃত্তি করে সাবাইকে স্তম্ভিত করে দিলেন।

চতুর্থতঃ সকল ব্যাপারেই তিনি অত্যন্ত সুশৃঙ্খল ছিলেন। কোন বিষয়ে তিনি অনিয়ম করতেন না। কোথাও অনিয়ম দেখলে প্রদিবাদ না করে ছাড়তেন না। তাঁর দীর্ঘ সময় রাজশাহী বিভাগের আমীরের দ্বায়িত্ব পালনকালে তাঁর সাংগঠনিক কড়াকড়িতে যারা বিরক্ত বোধ করতেন, তারাও তাঁকে শ্রদ্ধা করতে বাধ্য হতো। তাঁর কড়া

মেজাযের ব্যাপারে জিলা ও মহকুমা পর্যায়ের দায়িত্বশীলদের কেউ কেউ আমার নিকট অভিযোগ করলে আলোচনা শেষে দেখা গেল অভিযোগকারী শুধু তাঁর রাগত মন্তব্যই আপত্তিকর বলে প্রকাশ করলেন। কিন্তু সাংগঠনিক দৃষ্টিতে খান সাহেবের প্রতি আরও শ্রদ্ধাশীল হলেন। তিনি তাঁর ২৪ ঘন্টার রুটিনে যে নিয়ম মেনে চলতেন তাতেই মনে হয় তিনি আজীবন সুস্বাস্থ্যের অধিকারী ছিলেন। খাওয়া-দাওয়া, বিশ্রাম, ঘুম ইত্যাদি ব্যাপারে তিনি তাঁর জন্য নির্ধারিত নিয়ম কঠোরভাবে পালন করতেন।

পঞ্চমতঃ তিনি অত্যন্ত আকর্ষণীয় কণ্ঠস্বরের অধিকারী ছিলেন। এ বৃদ্ধ বয়সেও তাঁর কণ্ঠে মাধুর্যের কোন পরিবর্তন আসেনি। আমাদের অনেকেরই বেশী বক্তৃতা করলে পরে গলা ভেঙ্গে যায়। কিন্তু খান সাহেবের গলা ভেঙ্গে গেছে এমন কোন প্রমাণ নেই। তাঁর বক্তৃতা দীর্ঘ হলেও কখনও শ্রুতিকটু মনে হতো না। যে পল্টন ময়াদনে ৪ঠা অক্টোবর তাঁর জানাযা নামায অনুষ্ঠিত হলো ঐ ময়দানেই মাত্র তিন মাস পূর্বে ৪ঠা জুলাই আমার আমেরিকায় থাকার কারণে জামায়াতে ইসলামীর রাজনৈতিক সমাবেশে তিনি তাঁর সুপরিচিত দরাজ গলায় প্রধান অতিথি হিসেবে দীর্ঘ বক্তব্য পেশ করেন।

ষষ্ঠতঃ আল্লাহর প্রতি তাঁর গভীর ভালোবাসা থাকার কারণে পার্থিব দুঃখকষ্ট, বিপদ আপদে তিনি কখনও পেরেশান হয়ে ইসলামী আন্দোলন ও সংগঠনের দায়িত্ব এড়াবার চেষ্টা করেননি। তাঁর কোন পুত্র সন্তান ছিল না। এ অভাব পূরণের জন্য তাঁর এক বন্ধুর ছেলের সাথে তাঁর একমাত্র মেয়ের বিয়ে দিয়ে এ জামাতার হাতে বাড়ীঘর, জমি-জমা ইত্যাদির দায়িত্ব তুলে দিলেন এবং নিশ্চিন্ত মনে তাঁর মেধা, শ্রম ও সময় আল্লাহর দ্বীনের পথে নিয়োগ করলেন। ছয় বছর আগে তাঁর পুত্রতুল্য জামাতার মৃত্যু হলে বৃদ্ধ বয়সেও তিনি বিচলিত হননি। এরপর তাঁর স্ত্রী জয়পুরহাটের বাড়ীতে দশ বছর রোগশয্যায় পড়ে থাকা সত্ত্বেও আন্দোলনের দায়িত পালনে কোন ত্রুটি করেননি। তাঁর রুগ্ন স্ত্রীর খেদমতের দায়িত্ব তাঁর কন্যার উপর দিয়ে তিনি ঢাকা ও দেশের বিভিন্ন স্থানে সাংগঠনিক দায়িত্ব পালন করতেন। এ দীঘ সময় মাসে একবার কয়েকদিনের জন্য স্ত্রীর কাছে অবস্থান করতেন। এ অবস্থায় তাঁকে আমি পরামর্শ দিয়েছিলাম, তিনি ইচ্ছা করলে জয়পুরহাট শহরের বাড়ীতেই থাকতে পারেন এবং সেখান থেকেই সংগঠনের প্রোগ্রামে যেতে পারেন। কিন্তু আল্লামা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী একাডেমীর চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত পালন এবং জামায়াতের কেন্দ্রীয় অফিসে তার জন্য নির্দিষ্ট কামরায় বসে লেখাপড়ায় মগ্ন থাকাকেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন।

এতসব গুণাবলী একই ব্যক্তির মধ্যে পাওয়া অত্যন্ত বিরল। তিনি আল্লাহ তায়ালা প্রদত্ত এসব গুণাবলী নিষ্ঠার সংগে প্রয়োগ করে গেছেন বলে আমার ধারণা। আল্লাহতায়ালা তাঁর যাবতীয় খেদমত কবুল করুন এবং আখেরাতে উচ্চ মার্যাদা দান করুন। দুনিয়াতে তাঁর শূন্যস্থান পূরণ করার জন্য সুব্যবস্থা করুন। আমীন।
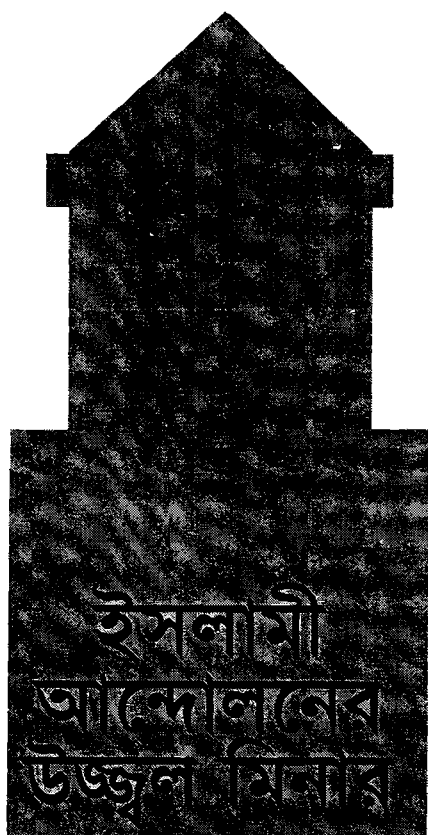
সহকর্মী
নেতৃবৃন্দের
কলম
থেকে

আমার প্রিয় ভাই আব্বাস আলী খান

জনাব শামসুর রহমান জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের নায়েবে আমীর। পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি থেকে মরহুম আব্বাস আলী খানের মৃত্যুর দিন পর্যন্ত তিনি খান সাহেবের একান্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও সাথী হিসেবে ইসলামী আন্দোলনের দায়িত্ব পালন করে আসছেন। মরহুম খান সাহেব যে সময় রাজশাহী বিভাগীয় জামায়াতে ইসলামীর আমীর ছিলেন, সে সময়ই জনাব শামসুর রহমান জামায়াতের খুলনা বিভাগের আমীর ছিলেন। ১৯৬২ সালে দু'জনই জামায়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। একই সাথে পার্লামেন্টে কাজ করেন। মৃত্যুর সময় খান সাহেব ছিলেন জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের সিনিয়র নায়েবে আমীর আর জনাব শামসুর রহমান সাহেব দ্বিতীয় নায়েবে আমীর। এ থেকেই মরহুম খান সাহেবের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা পরিষ্কার হয়। - সম্পাদক

আমার ঘনিষ্ঠ সাথী জনাব আব্বাস আলী খান আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন। ৩রা অক্টোবর ১৯৯৯ ঈসায়ী তারিখ তিনি দুনিয়া থেকে চির বিদায় নিলেন। সকলকেই এ দুনিয়া ছেড়ে চলে যেতে হবে। আল্লাহ পাকের অমোঘ ঘোষণা "কুল্লু নাফসিন জায়িকাতুল মাউত।" মহান রব্বুল আলামীন আরো বলেন "কুল্লুমান আলাইহা ফানিউ, ওয়াইবকা ওয়াজহু রাব্বিকা জুল জালালি ওয়াল ইকরাম।" অর্থাৎ দুনিয়ার উপর অবস্থিত সবই ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে এবং (কেবল) তোমার প্রতিপালকের সত্তাই অবশিষ্ট থাকবে - যিনি মহত্ব ও গৌরবের অধিকারী। (সূরা আর রহমান ২৬-২৭ আয়াত)

আব্বাস আলী খান সাহেব বয়সেও আমার চেয়ে বড় ছিলেন। আমার এক বছর আগে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিস্টিংশনসহ গ্রাজুয়েশন লাভ করে কিছুদিন সরকারী চাকুরী করেন। এক পর্যায়ে তদানীন্তন অবিভক্ত বাংলার মুসলমানদের জাগরণের দিশারী শের-এ বাংলা এ. কে. ফজলুল হক সাহেবের ব্যক্তিগত সচিব হিসেবে কাজ করে রাজনৈতিক ময়দানের বাস্তব অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ পান।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর তিনি শিক্ষকতার পেশা বেছে নেন এবং হিলি ও জয়পুরহাট হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক হিসেবে কাজ করেন।

তিনি ছিলেন দৃঢ় ঈমানের অধিকারী। তাই তিনি ফুরফুরার পীর সাহেবের মুরীদ হন। কিছু দিনের মধ্যেই তিনি পীর সাহেবের খেলাফত লাভ করেন। কিন্তু ঐ পথে তিনি আটকে থাকেননি। সেই পথে থাকলে সারা উত্তর বঙ্গের ধর্মীয় ময়দানে একচ্ছত্র আধিপত্যের অধিকারী হয়ে অঢেল ট্যাক্স ফ্রি অর্থের মালিক হতে পারতেন এবং লক্ষ লক্ষ মানুষ তার কদমবুচি করে ধন্য হতো। কিন্তু জামায়াতে ইসলামীর দাওয়াত পেয়ে তিনি ইসলাম প্রতিষ্ঠার অপরিহার্যতা বুঝতে পারেন। তাই তিনি দ্বীপ্ত ঈমানে

বলীয়ান হয়ে নবী রসূলদের বিপদ সংকুল জেল, জুলুম, নির্যাতনের পথ জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন।

১৯৫৫ সালে তিনি জামায়াতে ইসলামীতে যোগদান করার পর আমার সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। প্রাদেশিক মজলিসে শূরার অধিবেশনেই তাঁকে পেতাম। প্রথম থেকেই তাঁকে আমি বড় ভাইয়ের মতো শ্রদ্ধা করতাম। ইসলামী আন্দোলনে আসার পর তিনি একজন সাধারণ কর্মীর মতো কাজ করতে কুণ্ঠাবোধ করতেননা। খুলনা থেকে আমার প্রকাশিত ইসলামের মুখপত্র পরবর্তীতে জামায়াতে ইসলামীর মুখপত্র "সাপ্তাহিক তাওহীদ" হাতে নিয়ে যেখানে সেখানে যেতেন এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে এ পত্রিকা প্রচারের মাধ্যমে মানুষকে ইসলামী আন্দোলনে আকৃষ্ট করতে কুণ্ঠাবোধ করেননি। তাঁর হাতে এই পত্রিকা দেখে রংপুরের মরহুম জবান উদ্দীন সাহেব তাঁর নিকট ছুটে যান এবং তাঁর ঘনিষ্ঠতা লাভ করেন। অথচ তিনি যে বেঙ্গল আসামের সর্বশ্রেষ্ঠ পীর সাহেবের খলিফা সেই গৌরববোধ তাঁকে ইসলামী আন্দোলনের সাধারণ কর্মী হিসেবে কাজ করা থেকে দূরে রাখতে পারেনি।

১৯৬২ সালে আমরা দু'জনই পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হই। তখন থেকে তাঁকে আরও কাছে পেলাম। খুলনা পি, আই, এ'র অফিস থেকে আমি তাঁর এবং আমার টিকেট সংগ্রহ করে আনতাম এবং একত্রে পাকিস্তান যেতাম জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে যোগদানের জন্য। আমরা দু'জন থাকতামও এক সাথে। এভাবেই তাঁর একান্ত সান্নিধ্য লাভ করি আমি।

তিনি ছিলেন অত্যন্ত অমায়িক ও স্বল্পভাষী, কিন্তু সব সময় তাঁর কথার মধ্যে হাস্য রসের মিশ্রণ থাকতো। তিনি যে এককালে ফুরফুরার পীর সাহেবের খলিফা ছিলেন - এর জন্য তাঁর মধ্যে কোনো বাড়াবাড়ি লক্ষ্য করা যায়নি। অত্যন্ত সহজ সরলভাবে তিনি জীবন যাপন করতেন।

পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের সদস্য হিসেবেও আমরা কোনো দিন নিজেদের সাধারণ মানুষ থেকে আলাদা মনে করিনি। বাজার ঘাটে, চলা-ফেরায়ও তিনি ছিলেন নেতা। তাঁর সাথে প্রত্যেক ছুটির দিন এবং অধিবেশন মুলতবীর সময় আমরা পাকিস্তানের অনেক শহর যেমন - মারী, পেশোয়ার, মুলতান, সারগোদা, মর্দান, শিয়ালকোট, গুজরান ওয়ালা, করাচী, সোয়াতসহ বিভিন্ন শহরের বিভিন্ন স্থান ঘুরে দেখেছি। কোয়েটার অদূরে জিবারাত-এ অবস্থিত জিন্নাহ সাহেবের শেষ দিনগুলো যে বাড়ীতে কেটেছে সেটা দেখতে গিয়েছি। খান সাহেব আযাদ কাশ্মীরের রাজধানী মোজাফফারাবাদও সফর করেন।

এতোসব ব্যস্ততার মধ্যেও তিনি তাঁর সাহিত্য চর্চার অভ্যাস ভুলে যাননি। চরম ব্যস্ত অবস্থায় তিনি মাওলানা মওদূদী র.-এর জীবনী একটি জীবন ও একটি ইতিহাস বইটার রচনা সমাপ্ত করেন। সাহিত্যিক হিসেবে তিনি পরবর্তীকালে আরও অনেকগুলো পুস্তক রচনা করে ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য বিরাট অবদান রেখে গেছেন। তাঁর "বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস" প্রত্যেক মুসলমানের অবশ্য পাঠ্য একখানা বই।

খান সাহেব ইসলামী আন্দোলনের ডাকে সাড়া দিতে অসুস্থ অবস্থায়ও কখনো কসুর করতেননা। তার "পস্ট্রেট গ্লান্ড" অপারেশন করে ডাক্তার আশ্চার্যান্বিত হয়ে বলেছেন, এতো বড় অপারেশন তিনি ১০ বছরের মধ্যেও করেননি। এতো বেশী পরিমাণ এই বাড়তি মাংসপিন্ড পেটের কোণায় বহন করে তিনি ইউরোপ ও আমেরিকার ১০/১২টি দেশ সফর করেছেন। এই বিরাট অপারেশনের পরপরই জামায়াতে ইসলামীর রুকন সম্মেলনের উদ্বোধন, পরিচালনা ও সভাপতিত্ব তিনিই করেন। তাঁর সমাপ্তি ভাষণে তিনি নিজে উত্তেজিত হননি, নিজে কাঁদেননি, কিন্তু শ্রোতারা তাঁর বক্তৃতা শুনে ডুকরে কেঁদেছে এবং অঝোরে চোখের পানি ফেলেছে। তাঁর এ বক্তৃতার কথাগুলো তাঁর অন্তর নিংড়ানো, তাই শ্রোতাদের মধ্যে এতো প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়েছে। মহিলা প্যান্ডেলেও শুনেছি কান্নার রোল পড়ে গিয়েছিল।

এই সম্মেলনে পাকিস্তান, মালয়েশিয়া, ইংল্যান্ড, আমেরিকা প্রভৃতি দেশের ইসলামী আন্দোলনের প্রতিনিধিগণ যোগদান করে সম্মেলনকে সাফল্যমন্ডিত করেন। ইতিপূর্বে কোনো রুকন সম্মেলনে এরূপ আর দেখা যায়নি। মনে হচ্ছিল আমীরে জামায়াতের জেলে বন্দী থাকা এবং অসুস্থ খান সাহেবের আকুতির প্রেক্ষিতে আল্লাহ পাকই এই সম্মেলনের উপর বিশেষ রহমত নাযিল করেন।

আব্বাস আলী খান সাহেব ছিলেন একজন শিক্ষাবিদ। তিনি ৭১ সনে পূর্ব পাকিস্তানের মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করে শিক্ষা দফতরের দায়িত্ব পালন করেন। সেই সুযোগে তিনি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে 'মেরিন বায়োলজি' পাঠ্য তালিকাভুক্ত করে অমর কীর্তি রেখে যেতে সক্ষম হয়েছেন।

৭৯ সালে তাঁকেই ভারপ্রাপ্ত আমীর করে পূনরায় জামায়াতে ইসলামী কাজ করা শুরু করে এবং আমাকে সেক্রেটারী জেনারেল নিয়োগ করা হয়। দীর্ঘ দিন তিনি ভারপ্রাপ্ত আমীর হিসেবে এদেশের ইসলামী আন্দোলন পরিচালনা করেন।

তিনি বড় সমাজ সেবকও ছিলেন। উত্তর বঙ্গে শিক্ষা বিস্তারের জন্যে তিনি তালিমুল ইসলাম ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠা করেন। এই ট্রাস্ট্রের পরিচালনায় চলছে একটি আদর্শ স্কুল এবং একটি কলেজ।

আমার কাছে সব সময় তাঁকে একটা বিরাট বট গাছের মতো মনে হয়েছে। মনে হয়েছে যেনো তার ছায়াতলে নির্বিঘ্নে ইসলামী আন্দোলনের পথ অতিক্রম করছি। তাঁর মৃত্যুতে তাই নিজেকে অসহায় মনে হচ্ছে। আল্লাহপাক তাঁর খেদমত কবুল করুন এবং আন্দোলনে তাঁর অভাব পূরণের ব্যবস্থা করুন এই দোয়া করছি।

ইসলামী আন্দোলনের মহান শিক্ষক
মরহুম আব্বাস আলী খান

মতিউর রহমান নিজামী

মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী বাংলাদেশে ইসলামী আন্দোলনের অন্যতম অগ্রসেনানী। ছাত্র জীবন থেকেই তিনি আল্লাহর এই যমীনে তাঁর দীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে আসছেন। পাকিস্তান আমলে তিনি তিন সেশন (অর্থাৎ ১৯৬৬-৬৭, ১৯৬৭-৬৮ এবং ১৯৬৮-৬৯ সেশন) ইসলামী ছাত্র সংঘের পূর্ব পাক সভাপতি এবং দুই সেশন (অর্থাৎ ১৯৬৯-৭০ এবং ১৯৭০-৭১ সেশন) কেন্দ্রীয় সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭৮-৮২ সাল পর্যন্ত তিনি জামায়াতে ইসলামী ঢাকা মহানগরীর ইমারতের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৮৪ থেকে '৮৮ সাল পর্যন্ত তিনি জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল-এর দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৮৮-এর ডিসেম্বর থেকে তিনি জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের সেক্রেটারী জেনারেলের গুরু দায়িত্ব পালন করে আসছেন। এ দীর্ঘ দায়িত্ব পালনকালে তিনি প্রিয় নেতা আব্বাস আলী খান র.-কে অতি নিকট থেকে দেখার, জানার ও সান্নিধ্য লাভ করার সুযোগ লাভ করেছেন। এ নিবন্ধে মরহুম খান সাহেব সম্পর্কে তিনি তাঁর হৃদয় নিংড়ানো অনুভূতি তুলে ধরেছেন। - সম্পাদক

বাংলাদেশে ইসলামী আন্দোলনের অন্যতম স্থপতি আব্বাস আলী খান আর আমাদের মাঝে নেই। আল্লাহর প্রিয় বান্দা তাঁর রবের কাছে চলে গেছেন তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে। তিনি এ ধরাধাম ছেড়ে মৃত্যু যবনিকার ওপারে চলে গেছেন পরিণত বয়সে- ৮৪ বছর অতিক্রম করে প্রায় ৮৫ বছর বয়সে। তাই তাঁর মৃত্যুকে কোনো অবস্থায়ই অকাল মৃত্যু বলা যায়না। কিন্তু তারপরও কেন যেনো তিনি আমাদের মাঝে আজ আর নেই এটা ভাবতে বড় কষ্ট লাগে আবেগ অনুভূতিতে মাঝে মধ্যেই সাংঘাতিকভাবে আঘাত লাগে। জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় অফিসে মরহুম নেতার নির্দিষ্ট কামরাটির দিকে তাকাতেই তাঁর ঈমানদীপ্ত চেহারা জীবন্ত হাসি নিয়ে ভেসে ওঠে। কর্মপরিষদের বৈঠকে বসলে তাঁর নির্দিষ্ট চেয়ারটিতে তাঁকে না দেখে মনটা যেনো কিসের এক বিরাট অভাব উপলব্ধি করে ব্যাকুল হয়ে ওঠে। এতো পরিণত বয়সে তিনি বিদায় নিলেও তাঁর অভাব অনুভূত হচ্ছে হৃদয়ের পরতে পরতে।

১৯ ডিসেম্বর '৯৯ ঢাকার পল্টন ময়দানে অনুষ্ঠিত হলো ঢাকা মহানগরী শাখা জামায়াতে ইসলামী আয়োজিত বিশাল কর্মী সম্মেলন। সেদিনের সেই সম্মেলন মঞ্চে বসে বার বার ভেসে উঠেছে মরহুম খান সাহেবের হাস্যোজ্জ্বল জ্যোতির্ময় চেহারাখানি। এই ময়দানেই '৯৯-এর ৪ঠা জুলাইয়ের বিশাল জনসভায় তিনি দিকনির্দেশনা মূলক বক্তব্য রাখেন ইসলাম ও স্বাধীনতা রক্ষায় ঐতিহাসিক ভূমিকা পালনের আহ্বান জানিয়ে। ঠিক দুই মাস পর ৪ঠা সেপ্টেম্বর লক্ষ জনতা তাঁর নামাযে জানাযায় শরীক হয়ে অশ্রুস্বজল চোখে সৃষ্টি করে ভক্তি শক্তি শ্রদ্ধা ও আবেগের এক মর্মস্পর্শী দৃশ্যের। এই ঐতিহাসিক পল্টন ময়দান সাক্ষী মরহুম আব্বাস আলী খানের জীবনটাও ছিলো যেমন স্বার্থক, তেমনি তাঁর মৃত্যুও ছিলো স্বার্থক।

আল্লাহ্ মেহেরবান যেভাবে এ যুগের শ্রেষ্ঠ ইসলামী চিন্তা নায়ক মাওলানা মওদূদী র. প্রতিষ্ঠিত ইসলামী আন্দোলনের বাংলাদেশের অন্যতম স্থপতি আব্বাস আলী খানকে কবুল করেছেন, তেমনি তাঁর রেখে যাওয়া আন্দোলনকেও কবুল করেছেন, আমরা নিশ্চিতভাবে এ আশা করতে পারি।

মরহুম নেতা পরম শ্রদ্ধেয় আব্বাস আলী খান ছিলেন লক্ষ লক্ষ ইসলামী জনতার মহান শিক্ষকের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত। গতানুগতিক অর্থে তিনি কেবল একজন রাজনৈতিক নেতাই ছিলেননা। তাঁর কাছ থেকে হাজারো লাখো জনতা অনেক অনেক কিছু শিখেছে। তাঁর পরও মনে হয় আরো অনেক শেখার ছিলো তাঁর নিকট থেকে। শিক্ষা জীবন শেষে তাঁর কর্মজীবনের সূচনা হয়েছিল শিক্ষক হিসেবে। পরবর্তী পর্যায়ে সরকারী চাকুরী করলেও সেখান থেকে ফিরে যান মহান পেশা শিক্ষকতায়। ইসলামী আন্দোলনের তাকিদে ছাড়তে হয়েছিল এই শিক্ষকতার পেশাও। কিন্তু এই পেশার নৈতিক ছাপ ছিলো তার দীর্ঘ জীবনের শেষ অবধি। মানবতার মহান শিক্ষক মুহাম্মদ স. প্রেরিত হয়েছিলেন শিক্ষক হিসেবে। শিক্ষক হিসেবে তাঁর দায়িত্ব ছিলো নৈতিক চরিত্রের পূর্ণ বিকাশ সাধনের। প্রিয় নবীর স্বার্থক উত্তরসূরী উম্মতের জীবনে এই বৈশিষ্ট্যের পরিস্ফুটন ঘটাই স্বাভাবিক।

মরহুম নেতা ছিলেন উপমহাদেশের বিংশ শতাব্দীর ইতিহাস ঐতিহ্যের জীবন্ত সাক্ষী। তিন বিশাল ব্যক্তিত্বের সান্নিধ্য তাঁকে ধন্য করেছিল। বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের শেষ ১৫/২০ বছরের ঘটনা প্রবাহের তিনি ছিলেন জীবন্ত সাক্ষী। এই সময়ের মুসলিম লীগ ও কংগ্রেসের শীর্ষ স্থানীয় নেতৃবৃন্দকে যেমন তিনি কাছে থেকে দেখার এবং জানার সুযোগ পেয়েছেন, তেমনি শীর্ষস্থানীয় ওলামা মশায়েখগণের সাহচর্য লাভেরও তিনি দুর্লভ সুযোগ পান। বিশেষ করে তৎকালীন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হকের একান্ত সচিবের দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতি প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করার সুযোগ পান। অপরদিকে সে সময়ের বাংলা ও আসামের অবিসংবাদিত আধ্যত্মিক পুরুষ শাহ সুফী আবু বকর সিদ্দিকী র. এবং তার সুযোগ্য পুত্র আবদুল হাই সিদ্দিকী র. ও ফুরফুরার সিলসিলাভুক্ত অসংখ্য আলেম ওলামা এবং পীর মাশায়েখদের সাথে উঠা বসার মাধ্যমে আধ্যাত্মিকতা সম্পর্কে সম্যক অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ পান। পঞ্চাশের দশকের মধ্যবর্তী সময় তিনি সম্পৃক্ত হন এ যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইসলামী চিন্তাবিদ এবং ইসলামী আন্দোলনের পথিকৃত সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী র.-এর চিন্তা ধারা এবং তাঁর নেতৃত্বে পরিচালিত ইসলামী আন্দোলনের সাথে।

ব্যাপক পড়াশুনা ও জ্ঞান গবেষণার পাশাপাশি বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে মাওলানা মওদূদী পরিচালিত ইসলামী আন্দোলনের মধ্যে তিনি দীন ইসলামের পূর্ণাঙ্গ রূপ ও তার দাবী অনুধাবন ও উপলব্ধি করেই ইসলামী আন্দোলনকে মনেপ্রাণে গ্রহণ করেন। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত নানা ঘাত, প্রতিঘাত, চড়াই উৎরাই সত্ত্বেও অটল অবিচল থাকতে সক্ষম হন। শেরে বাংলা একে ফজলুল হক মরহুমের সাহচর্যে ক্ষমতার রাজনীতির সাথে ওতোপ্রতভাবে জড়িত হবার সুযোগ পেয়েও এবং শেরে

বাংলার প্রতি অগাধ ভক্তি-শ্রদ্ধা থাকা সত্ত্বেও আল্লাহর এই প্রিয় বান্দা ক্ষমতার রাজনীতির প্রতি ঝুঁকে পড়েননি। কুরআন সুন্নাহর আলোকে সত্যিকারের আধ্যাত্মিকতা বা তাজকিয়ায়ে নফসের দাবী পূরণে পূর্ণরূপে সক্ষম ও সহায়ক মনে করেই তিনি মনেপ্রাণে ইসলামী আন্দোলনকে গ্রহণ করেন। সাধারণ কর্মী হিসেবে এ আন্দোলনে শরীক হবার মুহূর্তে নফসানিয়াত তাকে ধোকা, প্রতারণা বা প্রবঞ্চনার ফাঁদে আঁটকাতে পারেনি। আন্দোলনের একজন সাধারণ কর্মী হিসেবে কাজ করতে গিয়ে জামায়াতের আনুগত্য ও শৃংখলার প্রশ্নে কখনো তার অতীতের ক্যারিয়ার বা কোনো প্রকার মর্যাদার অনুভূতি অন্তরায় সৃষ্টি করতে পারেনি। এভাবে উপমহাদেশের একজন শীর্ষ স্থানীয় রাজনীতিবিদ এবং একজন শীর্ষ স্থানীয় আধ্যাত্মিক পুরুষের একান্ত ঘনিষ্ঠ ও নিকটতম সঙ্গী হিসেবে কাজ করার পর একেবারেই প্রাথমিক পর্যায় থেকে জামায়াতে ইসলামীর মাধ্যমে ইসলামী আন্দোলনের কাজ শুরু করে আন্তরিকতা, নিষ্ঠা, তাকওয়া, ত্যাগ কোরবানী এবং ময়দানের সক্রিয় ভূমিকা পালন করার বদৌলতে উঠে আসেন তিনি জামায়াতের নেতৃত্বের শীর্ষ পর্যায়ে। রাজশাহী বিভাগীয় জামায়াতের আমীর, কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার সদস্য, তৎকালীন পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের সদস্য এবং জামায়াতের সংসদীয় গ্রুপের নেতা হিসেবে পরিচিত ব্যক্তিত্ব হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হন জাতীয় পর্যায়ে। স্বাধীন বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে মরহুম আব্বাস আলী খান বিবেচিত হন অন্যতম সর্বজন শ্রদ্ধেয় কেন্দ্রীয় ব্যক্তিত্ব হিসেবে। কিন্তু ঘটনাক্রমে তাঁকে কেন্দ্রীয় সংগঠন থেকে ঢাকা শহরের সংগঠনে কাজ করতে হয় প্রায় এক বছর সাধারণ রুকন হিসেবে। ১৯৭৮ সনের এই ঘটনা আমার মতো অনেকের সাংগঠনিক জীবনের বিশেষ শিক্ষণীয় এবং স্মরণীয় ঘটনা। মরহুম আব্বাস আলী খান ছিলেন আমার পিতৃতুল্য নেতা এবং পরম শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি। আমি ঢাকা শহর জামায়াতের আমীর হিসেবে দায়িত্ব পালন করছি, আর মরহুম আব্বাস আলী খান উক্ত শহরের একজন রুকন এবং মজলিসে শূরার সদস্য হিসেবে বিনা দ্বিধায় সংগঠনের আনুগত্যের যে নজীর স্থাপন করেন তা সত্যিই বিরল। আল্লাহ তায়ালা তাঁর নেক বান্দার এই নিষ্ঠা ও ইখলাসের পুরস্কার স্বরূপ যে মর্যাদা তাকে দুনিয়ায় দিয়েছেন, আখেরাতেও যেনো সেভাবে বরং তার চেয়ে আরো উত্তমভাবে পুরস্কৃত করেন (আমীন)।

বাংলাদেশের বিশেষ প্রেক্ষাপটে জামায়াতে ইসলামী সনামে প্রকাশ্য ময়দানে কাজ শুরুর ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা তাঁকে বিশেষ খেদমত, বিশেষ অবদান ও ভূমিকা পালনের জন্যে কবুল করেন। আমীরে জামায়াত অধ্যাপক গোলাম আযমের নাগকিত্ব সমস্যার কারণে জনতার ময়দানে জামায়াতের পতাকা তাঁকেই বহন করতে হয়েছে। এই দীর্ঘ সময় মাঠে ময়দানে, আলোচনার টেবিলে সর্বত্র তিনি নিষ্ঠার সাথে জামায়াতের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। বয়স অনুপাতে কঠোর পরিশ্রম করেছেন। ধৈর্য, সহনশীলতার পরিচয় দিয়েছেন। জনসভায়, সুধী সমাবেশে, কর্মী সম্মেলনে, ঘরোয়া অনুষ্ঠানে, কর্ম পরিষদ ও মজলিসে শূরার অধিবেশনে সর্বত্র ইসলামী আন্দোলনের বৈশিষ্টময় কর্মনীতির আলোকে তাঁর ভারসাম্যপূর্ণ ভূমিকা পালন আন্দোলনের সকল পর্যায়ের নেতা কর্মীদের জন্যে অনুকরণ ও অনুসরণযোগ্য দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে।

আজ তাই জামায়াতে ইসলামীর প্রতিটি অনুষ্ঠানেই তাঁকে মনে পড়ে। তাঁর স্মৃতি জীবন্ত প্রতিচ্ছবি হিসেবে ভেসে উঠে সাথী সঙ্গীদের মানসপটে। মনে পড়ে তাঁর সাথে অংশ গ্রহণ করা প্রতিটি অনুষ্ঠানের কথা। বিশেষ করে মনে পড়ে ১৯৯২ সনের ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত রুকন সম্মেলনের কথা। আমীরে জামায়াত অধ্যাপক গোলাম আযম কারান্তরালে থাকা অবস্থায় চলছিল উক্ত ত্রিবার্ষিক রুকন সম্মেলনের প্রস্তুতি। ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে অনুষ্ঠিতব্য সম্মেলনের প্রস্তুতিপর্ব এগিয়ে চলছে। এমতাবস্থায় ভারপ্রাপ্ত আমীর আব্বাস আলী খান হঠাৎ মারাত্মকভাবে অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে শয্যাশায়ী হয়ে পড়েন। তার প্রস্ট্রেটগ্লান্ড-এর অপারেশন হবে। নভেম্বরের শেষের দিকে আমি জার্মান সফর শেষে ফিরে বিমান বন্দর এসেই শুনতে পেলাম এই দুঃসংবাদ। অসুস্থতা এমনিতেই একটি দুঃসংবাদ, তদুপরি আমীরে জামায়াতের জেলে থাকা অবস্থায় রুকন সম্মেলনের অল্প আগে খান সাহেবের এভাবে অসুস্থ হয়ে পড়াটা ছিলো বজ্রাঘাতের মতো। আমরা সবাই চরম দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়ি। সম্মেলনের আগে তিনি কতোটা সুস্থ হয়ে উঠবেন। আদৌ কি সম্মেলনে তিনি উপস্থিত হতে পারবেন? এ চিন্তা সবাইকে বেশ বিচলিত করে তোলে। আল্লাহর দরবারে তখন রুকন সম্মেলনের সাফল্যের জন্যে হৃদয়ের গভীর থেকে খান সাহেবের সুস্থতার জন্যে দোয়া করেছি। অপারেশনের দিন পর্যন্ত তিন দিন আমি নিজে নফল রোযা রেখেছি। এই তিনদিনের শেষ দিন ইফতার শেষে শ্রদ্ধেয় নেতাকে ওটিতে নেবার মুহূর্তে বিশেষভাবে দোয়া করেছি। আল্লাহ সেদিন সকলের অন্তরের ফরিয়াদ কবুল করে নেতাকে অলৌকিকভাবেই সুস্থ করে দেন। অল্প দিনের মধ্যেই এতো বড় অপারেশনের ধকল সামলিয়ে তিনি রুকন সম্মেলনে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অংশ গ্রহণ করলেন। সম্মেলনে আগত হাজার হাজার প্রতিনিধি সে দিন ভাবতেই পারেননি যে মাত্র কয় দিন আগে তাঁর অপারেশন হয়েছে।

রুকন সম্মেলন ১৯৯২-এ শ্রদ্ধেয় নেতার উদ্বোধনী ভাষণ, সমাপণি ভাষণ ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের মূল্যবান পাথেয় হয়ে থাকবে। ঐ সম্মেলনে আছে তার ইমামতিতে নামাযের স্বর্গীয় পরিবেশের কথা আমার হৃদয়ে দাগ কেটে। তাকে আল্লাহ সুন্দর একটি কণ্ঠ দান করেছিলেন। তাঁর আওয়াজের বলিষ্ঠতা ও মাধুর্য সব সময়ই ভাল লাগতো। কিন্তু আমীরে জামায়াতের অনুপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত ঐ রুকন সম্মেলনে তাঁর ইমামতিতে নামায পড়তে গিয়ে হৃদয়ে যে অনুভূতির সৃষ্টি হয়েছিল তা যেনো জীবনের দুর্লভ পাওয়া। ইমাম হিসেবে তাঁর ঐ ক'টি দিনের তেলাওয়াত ছিলো সত্যি অবিস্মরণীয়। তাঁর তেলাওয়াত শুধু কণ্ঠে নয়, হৃদয়ের পরতে পরতে সৃষ্টি করেছিল অদ্ভুত শিহরণ। আন্দোলনের একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় মুহূর্তে এটা ছিলো আল্লাহর প্রত্যক্ষ রহমতের অন্যতম প্রকাশ। তাঁর জীবন সায়াহ্নে আবার দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলাম। আমীরে জামায়াত সৌদী আরবে সফরে থাকার কারণে। মরহুমের অন্তিম ইচ্ছা ছিলো আমীরে জামায়াত তাঁর জানাযায় ইমামতি করবেন। এ ব্যাপারে তিনি ১৯৯২ সালে আমীরে জামায়াত জেলে থাকা অবস্থায় কর্মপরিষদের একটি বৈঠকে তাঁর একটি স্বপ্নের কথা আমাদের বলেছিলেন। ১৯৯৯

অক্টোবরের ১/২ তারিখ থেকেই ভাবছিলাম আমীরে জামায়াত সফর শেষে ফিরে আসার আগেই কিছু হলে কী করা যাবে? আল্লাহ্ বড় মেহেরবান তাঁর এই নেক বান্দার প্রতি, সমস্ত অনিশ্চতার অবসান ঘটিয়ে মরহুমের অন্তিম ইচ্ছা পূরণের ব্যবস্থা তিনি করলেন-পল্টন ময়দানের ঐতিহাসিক এ নামাযে জানাযার ইমামতি করলেন আমীরে জামায়াত অধ্যাপক গোলাম আযম । তিনি তাঁর সফর অসমাপ্ত রেখে সীমাহীন কষ্ট করে চরম অনিশ্চয়তার মধ্য দিয়ে এসে পৌঁছুলেন প্রিয় সাথীর জানাযায় শরীক হতে। ৪ঠা সেপ্টেম্বর ঐতিহাসিক পল্টন ময়দানে এবং ৫ই সেপ্টেম্বর জয়পুরহাটের বিশাল সিমেন্ট ফ্যাক্টরী ময়দানে লক্ষ লক্ষ জনতার উপস্থিতিতে নজিরবিহীন ভক্তি শ্রদ্ধা ও আবেগ প্রকাশের মাধ্যমে মরহুমের নামাযে জানার পরিসমাপ্তি তাঁর একটি বিরল সম্মান। আল্লাহ্ যাকে দুনিয়ায় এতোবড় সম্মান দান করলেন, যার অন্তিম ইচ্ছা বাসনা এভাবে অক্ষরে অক্ষরে পূরণ করলেন, আল্লাহ তায়ালা আখেরাতে তাঁকে এভাবেই বরং আরো ভালভাবে সম্মানিত করবেন নাবীয়ীন, সিদ্দিকীন, শোহাদা ও সালেহীনের কাতারে তাকে শামিল করবেন-প্রাণ উজাড় করে এই দোয়াই করি তার জন্য।

"যারা আল্লাহ্ ও রসূলের আনুগত্য করবে, তারা হবে ঐসব লোকদের সাথী ও সহযোগী, যাদেরকে আল্লাহ্ পুরস্কৃত করেছেন নবী, সিদ্দিক, শহীদ এবং শুদ্ধ-সৎকর্মশীলদের মধ্য থেকে। কতো উত্তম সাথী এরা।" (সূরা আন নিসা ঃ ৬৯)

সত্যপন্থী ন্যায় পরায়ণ আব্বাস আলী খান

মকবুল আহমদ

জনাব মকবুল আহমদ জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের অন্যতম সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল। মরহুম খান সাহেবের ঘনিষ্ঠ সাথী তিনি। সাংগঠনিক জীবনে একান্ত নিকট থেকে তিনি খান সাহেবকে দেখেছেন। কেমন দেখেছেন তিনি খান সাহেবকে? তাঁর এই হৃদয় নিংড়ানো লেখায় মরহুম খান সাহেব অমর হয়ে হয়ে ফুটে উঠেছেন। -সম্পাদক

বর্তমান বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম ইসলামী আন্দোলন জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের সিনিয়র নায়েবে আমীর জনাব আব্বাস আলী খান গত ০৩/১০/৯৯ ইন্তেকাল করেছেন। সারাদেশে দ্রুত বেগে খবর ছড়িয়ে পড়লো। অগণিত মানুষ শেষ শ্রদ্ধা নিবেদন করার জন্য আসলো। সেকি ব্যাকুল আকুতি, বর্ষীয়ান জননেতার জন্য বুক ভরা দোয়া - না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না।

০৪-১০-৯৯ তারিখে ঢাকার পল্টন ময়দানে, ঐদিন রাত ২ টায় বগুড়ায় এবং ০৫-১০-৯৯ জয়পুরহাট নামাযে জানাযা হয়। জয়পুরহাটের জানাযা ছিলো এক জন সমুদ্র - লক্ষাধিক লোকের সমাবেশ। জয়পুরহাটের লোকদের মতে, বিগত কয়েক দশকে এতো লোকের সমাগম দেখেনি কেউ। দলমত নির্বিশেষে অগণিত মানুষের কেমন প্রাণপ্রিয় মুরুব্বী ছিলেন তিনি এ বিশাল সমাবেশ দেখলে তা বুঝা যায়। রাষ্ট্রীয় পদে অধিষ্ঠিত কোনো নেতা-নেত্রী এই মর্দে মুমিনের জন্যে শোকবাণী পর্যন্ত দেয়নি। আফসোস এই লোকদের জন্যে।

আখিরাতে এ শোকবাণীর আলাদা কোনো মর্তবা নেই, কিন্তু যেখানে নাস্তিক, মুরতাদ প্রয়াত হলে তাদের মুখ খোলে, সেখানে তারা এ রকম একজন রাজনীতিবিদ, জ্ঞান তাপস, সার্থক মহা পুরুষের মৃত্যুতে এতোটুকু উদার্য দেখাতে পারলোনা। এদের চিন্তা-চেতনা, বিবেক আর মন-মানসিকতা কেমন এ থেকেই তা বুঝা যায়।

এ ধরনের হৃদয়হীন, প্রতিহিংসাপরায়ণ মানসিকতার লোকেরা ভুলে যায় তাদেরকেও একদিন এ দুনিয়া ছেড়ে চলে যেতে হবে। এসব লোক এবং তাদের অনুসারীদের বিবেকের কাছে এ কথাগুলো রেখে এ বিষয়ে ইতি টানছি।

ছাত্র জীবনে যখন আমাদের মহান স্রষ্টা আল্লাহকে চিনতে, তাঁর নির্দেশ জানতে এবং বুঝতে চেষ্টা করেছি, তখন থেকে এ মহাপুরুষ জ্ঞান সাধক জনাব আব্বাস আলী খান সাহেবের নাম শুনেছি, তখন দেখার সুযোগ কম হয়েছে।

১৯৭৯-এর দিকে বিভিন্ন দায়-দায়িত্বে যখন ঢাকায় এলাম তখন তাঁর সান্নিধ্যে আসলাম তাঁকে কাছে থেকে চিনবার-জানবার, তাঁর থেকে অনুপ্রেরণা পাবার সুযোগ পেলাম।

আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর মধ্যে অগণিত গুণের সমাহার করে ঘটিয়েছিলেন।

তিনি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন চলতেন। তাঁর কাপড়-চোপড়, টেবিল-পত্র সুন্দরভাবে গুছানো থাকতো। তাঁর রুমে গেলে বুঝা যেতো তিনি একজন রুচিশীল মানুষ। সময়ানুবর্তিতায় তিনি খুবই সতর্ক ছিলেন। আমার জানা মতে কোনো প্রোগ্রামে তিনি দেরী করে হাজির হননি। যখন ইসলামী আন্দোলনে শামিল হয়েছি তখন প্রশিক্ষণ শিবিরে একটা বিষয় থাকতো - কে কি ভাবে জামায়াতে দাখিল হয়েছি? তখন অনেককে বলতে শুনেছি, জামায়াতের শৃঙ্খলা ও সময়ানুবর্তিতা আমাদেরকে বেশী আকৃষ্ট করেছে।' অবশ্য আজকাল আমরা উপর থেকে নীচ পর্যন্ত এ ব্যাপারে যেনো নজর দিতে পারছিনা। হতে পারে ব্যস্ততা এবং কাজের চাপ বেড়েছে। আম্বীয়ায়ে কেরাম এবং সলফে সালেহীনও তাদের জীবন এবং কর্মে ব্যস্ত ছিলেন। তবুও তারা সময় মতো কাজ করার উপর খুব বেশী গুরুত্ব দিতেন।

খান সাহেব প্রকৃতিগতভাবে একটু গম্ভীর প্রকৃতির লোক ছিলেন। কিন্তু আলাপ শুরু করলে বুঝা যেতো কতো রসিক ব্যক্তি ছিলেন! তাঁর সাথে সফর করাটা যেমন ছিলো তাৎপর্যপূর্ণ এবং শিক্ষণীয় তেমন ছিলো বেশ রসালো।

আমি একবার মন্তব্য করেছিলাম, খান সাহেব নারিকেলের মতো। উপরেরের ছাল ছাড়াতে হয়, শক্ত আটিটা ভাংতে হয়, তবেই পাওয়া যায় সুস্বাদু পানি, সুস্বাদ নারিকেল যা দিয়ে তৈরী হয় অসংখ্য ধরনের মিষ্টান্ন, গ্রামীণ ঐতিহ্যবাহী পিঠা।

তিনি শিক্ষামন্ত্রী থাকতে চট্টগ্রামে ঐতিহ্যবাহী 'মেরিন একাডেমী' প্রতিষ্ঠিত হয়। এর মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে দুনিয়ায় আমাদের নৌ বাণিজ্য। বড় বড় জাহাজের সুযোগ্য নাবিকও তৈরি হচ্ছে।

তিনি ছিলেন নিরলস লেখক আবার রাজনৈতিক ময়দানের লড়াকু সৈনিক। স্বৈরাচারী আমলে ভারপ্রাপ্ত আমীরের যে ভূমিকা তিনি বৃদ্ধ বয়সে পালন করেছেন তা তাঁর অসীম সাহসিকতা ও আদর্শের প্রতি দৃঢ়তারই পরিচয়।

আমাদের দেশে একটা প্রবাদ আছে ঃ 'যে যায় লঙ্কা সে হয় রাবন।' অর্থাৎ ভালো কথা বলেও ক্ষমতায় গেলে আর তা মনে থাকেনা। আল্লাহর মেহেরবাণী জামায়াতে ইসলামী একমাত্র দ্বীনী সংগঠন, ঐতিহ্যবাহী রাজনৈতিক দল যারা নির্বাচনে জিতেছে, হেরেছে; কিন্তু কালো টাকা, সন্ত্রাস, জালভোটের আশ্রয় গ্রহণ করেনি। জামায়াত অনেকবার তাঁর রাজনৈতিক স্বচ্ছতার উদাহরণ স্থাপন করতে পেরেছে।

ইসলামী আন্দোলনের এটা একটা নৈতিক বিজয়। নোংরা রাজনীতির ভয়ে দূরে গিয়ে পরহেযগারীর দাবী না করে জামায়াত এ পথে নেমে সংস্কার করেছে, যার ফল জাতি পাচ্ছে।

রাজনীতিতে গেলেই সব বেচা-কেনা হয়, জামায়াত এটা মিথ্যা প্রমাণ করেছে। ক্ষমতা, টাকা কিংবা প্লট দিয়ে তাদেরকে কিনতে পারেনি। নৈতিকতার এ ধ্বস নামার যুগেও বিরাট আলোর স্তম্ভ জনাব আব্বাস আলী খানদের মতো নির্লোভ সিংহদিল ত্যাগী পুরুষদের পক্ষে এটা সম্ভব হয়েছে। এ উদাহরণ সৃষ্টি করার জন্য আল্লাহপাক আখিরাতে তাঁদেরকে জান্নাত নসীব করুন।

তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রমে জয়পুরহাটে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তা'লীমুল ইসলাম একাডেমী ও কলেজ। একটা প্রতিষ্ঠান চালানো যে কতো কঠিন! অভ্যন্তরীণ ও বাইরে হাজারো সমস্যা। এ রকম সমস্যা মোকাবিলা করতে তিনি বেশ পরিশ্রম করেছেন। সবাই তাঁকে সমীহ্ করতেন। সকল ছাত্রের তিনি ছিলেন প্রিয় 'নানা' এলাকায় গেলে সবাই তাঁকে ঘিরে ধরতো যেনো আপনজন এসেছেন।

ব্যবস্থাপনায় ত্রুটির কারণে একদিন সবাইকে বললেন, এ প্রতিষ্ঠান আমি করেছি। আমি নিজে দেখব কি করা যায়? সবাই তো হতবাক। ঐ বৈঠকে আমি হাজির ছিলাম

পরিস্থিতিটাকে Normalise করার জন্য আমি বললাম, দেখুন ভাইয়েরা! এ মহত প্রতিষ্ঠান তিলেতিলে মুহতারাম খান সাহেবের অক্লান্ত চেষ্টায় গড়ে উঠেছে। কেউ যদি কিছু সহযোগিতা করে থাকে, তবে তা মুহতারাম আব্বাস আলী খান জয়পুরহাটের অধিবাসী হিসেবে করেনি, করেছে মুহতারাম আব্বাস আলী খান সিনিয়র নায়েবে আমীর জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ হিসেবে। এটা কারো ব্যক্তিগত বা পারিবারিক প্রতিষ্ঠান নয়। ট্রাস্ট এবং কমিটি System অনুযায়ী চলবে। আপনাদেরকে আরো খেয়াল রাখতে হবে, জনাব খান সাহেব যা করেছেন তা তাঁর ব্যক্তি বা পরিবারের জন্য করেননি। তাঁর ছেলে-মেয়েরা এখানে পড়বে না, পড়বে আপনাদের এলাকাবাসী, আপনাদের সন্তানরাই। তাই সহনশীলতার সাথে মিলেমিশে মুরুব্বীর পরামর্শ এবং কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজ চালিয়ে যান, সমস্যা ইনশাআল্লাহ্ থাকবে না। প্রতিষ্ঠান চালাতে গেলে একটু সমস্যা হবে, ইনসাফ অনুযায়ী চালালে সমাধানও হয়ে যাবে। সবাই চুপচাপ। খান সাহেব কি মন্তব্য করেন, সবাই সেদিকে চেয়ে আছেন। আল্লাহর মেহেরবাণী তিনি সুন্দরভাবে সমাধান করে বিদায় নিলেন।

সবাই আমাকে বললেন, আমরাতো মনে করেছি আপনার মন্তব্য কড়া হয়েছে, React করবেন তিনি। কিন্তু না, সত্যের সামনে খান সাহেব একদম নরম। সঠিক কথা মেনে নিতে মোটেই দ্বিধা করেননি তিনি।

একটা প্রতিষ্ঠান দাঁড় করালে তার পরিচালনা দু'ভাবে হয়। ওয়ারিস সূত্রে এবং System অনুযায়ী। আদর্শবাদী প্রতিষ্ঠান ওয়ারিস সূত্রে নয়, আদর্শসূত্রে চালাতে হয়। তাই মাওলানা মওদূদী মরহুমের ঐ কথাটা মনে হয়, চৌধুরীর ছেলে চৌধুরী হয়, ব্রাহ্মণের ছেলে ব্রাহ্মণ হয়। কিন্তু হেড মাস্টারের ছেলে জন্মসূত্রে হেড মাস্টার হয় না। তাকে অর্জন করেই ঐ পদে পৌঁছতে হয়।

আজ আমরা বংশীয় মুসলমান-পিতা মাতা মুসলমান, তাই আমিও মুসলমান। কিন্তু ইসলাম বলে, শুধু জন্মসূত্রে মুসলমান হয় না। ইসলাম জানতে হবে, মানতে হবে, বাস্তবায়নের চেষ্টা করতে হবে, তবেই মুসলমান হওয়া যাবে। কিন্তু আমরা এটা খেয়াল রাখি না।

তাঁর কালামে পাকের তেলাওয়াত ছিল সুমধুর, চমৎকার, স্পষ্ট ধরনের। আমীরে জামায়াত প্রায় সময় মাগরিবের ও এশার জামায়াতে ইমামতির দায়িত্ব তাঁকে

দিতেন। তিনি কুরআনের ঐতিহাসিক কাহিনী এবং হক বাতিলের দ্বন্দ্ব সংঘাতপূর্ণ আয়াতগুলো পড়তেন আর শ্রোতারা অজান্তে ভেসে যেতো সেই সংগ্রামের ঐতিহাসিক পটভূমিতে।

সাধারণত আমরা তাঁকে একটু কঠিন, কঠোর মনের লোক মনে করে ভয়ে তাঁর কাছে কম যেতে চাইতাম। একবার একটি বিষয়ে খান সাহেবের মত বদলানো যাচ্ছিলনা। আমরা ৪/৫ জন বসে চিন্তা করছি কি করা যায়? সবাই আমাকে বললো, তাঁর রুমে গিয়ে বিষয়টা আলোচনা করতে। আমি গিয়ে ভয়ে ভয়ে খুব মোলায়েমভাবে বললাম, খান সাহেব বিষয়টা এভাবে হলে আমাদের মনে হয় ভাল হয়। চুপ করে থেকে একটু মুচকি হেসে বললেন, ঠিক আছে, করে ফেলুন। আমি ধারণাও করিনি যে এতো সহজে তিনি সম্মতি দিয়ে দিবেন। এমন দরাজ দিল কম দেখা যায়।

জয়পুরহাটে জামায়াতের বিশাল জনসভা, লোকে লোকারণ্য। প্রধান মেহমান মুহতারাম আমীরে জামায়াতে অধ্যাপক গোলাম আযম। বিশেষ মেহমান জনাব আব্বাস আলী খান। সেদিন তাঁর বিবি ইন্তেকাল করলেন।

তিনি নিজ বাড়ীতে একটা ট্রাস্ট করেছেন। যেখানে তিন তলা দালানের একটি তলা ইসলামী আন্দোলনের ও ইসলামী পাঠাগারের জন্য ওয়াক্ফ করেছেন। সারা জীবনের সঞ্চিত বই কেতাবপত্র-পড়তে পারবে অগণিত লোক। স্থানীয় দ্বীনী ভাইয়েরা এ পাঠাগারকে জ্ঞান চর্চার কেন্দ্র হিসেবে বিরাট আকারে গড়ে তুলতে পারেন।

তিনি ছিলেন মাওলানা মওদূদীর ঘনিষ্ঠ সাথী। তাই আমরা তাকে মাওলানার উপর বিশেষজ্ঞ মনে করতাম। মাওলানার বিরাট জীবনী গ্রন্থে তিনিই লিখেছেন 'একটি জীবন একটি ইতিহাস'। মাওলানার জীবনের অনেক অজানা তথ্য তিনি তুলে ধরেছেন তার সেই জীবনী গ্রন্থে। এ শুধু জীবনীই নয়-একটি আন্দোলনের ইতিহাসও।

সর্বশেষ ছোট্ট একটা ঘটনা । তাঁকে যে ছোটবড়, যুবক-বৃদ্ধ সব মানুষ কেমন ভালবাসতো তা টের পেলাম জয়পুরহাট গিয়ে। তিনি অক্টোবর মাসে মারা গেলেন, ঐ মাসেই তাঁকে নানা ডাকে তাঁর এমন একটি নাতি নাজমুস সাকিব, (এইচএসসি প্রথম বর্ষের ছাত্র) একটা ছোট বই লিখে আমাদের হাতে দিলে, আমি আশ্চর্য হলাম। এ কয়েক দিনের মধ্যে সে খান সাহেব সম্পর্কে বই লিখে ফেললো!

কতো আবেগ, কতো প্রেরণা থাকলে এমনটি সম্ভব! আমি দোয়া করি ছোট নাজমুস সাকিব যেনো ভালো লেখক হতে পারে। আমিন। ২৩/১১/৯৯ ইং।

আব্বাস আলী খান আপোষহীনতার প্রতীক

আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ

জনাব মুজাহিদ জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ-এর অন্যতম সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল। ১৯৮৮ সাল পর্যন্ত তিনি ঢাকা মহানগরী জামায়াতের আমীর ছিলেন। তিনি তিন সেশন ইসলামী ছাত্র সংঘের সভাপতি ছিলেন। মহানগরী জামায়াতের আমীর থাকাকালীন সময় থেকে নিয়ে '৯৬-এর জাতীয় নির্বাচন পর্যন্ত তিনি জামায়াতের লিয়াঁজো কমিটির আহবায়ক ছিলেন। এই সুবাদে তিনি স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলন, আমীরে জামায়াতের নাগরিকত্ব ও মুক্তি আন্দোলন এবং কেয়ারটেকার সরকার আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। সংগঠনের অভ্যন্তরীণ পরিবেশ এবং বিভিন্ন গণ আন্দোলনে তিনি মরহুম আব্বাস আলী খানের একান্ত ঘনিষ্ঠে থেকে কাজ করেছেন। মরহুম খান সাহেবও তাঁকে খুব স্নেহ করতেন। এ নিবন্ধে তিনি খান সাহেব সম্পর্কে বাস্তব অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করেছেন। সম্পাদক

'এসো বাসায় এসো।' - এ কথাটিকে নির্দেশ মনে করে অতি সন্তর্পণে পেছন পেছন হেঁটে যেতাম। তখনও অতো বৃদ্ধ নন, তবে শুভ্র শ্মশ্রুমণ্ডিত এক ভাবগম্ভীর ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন নেতা আব্বাস আলী খানের কথা বলছি। কোনো কথা না বলে মোহময় আকর্ষণে পিছে পিছে তাঁর বাসায় গিয়ে হাজির হতাম। অতি যত্ন করে ও স্নেহসিক্ত হৃদয় দিয়ে কাছে বসাতেন। এরপর সযত্নে রক্ষিত কয়েকটি আম হাতে করে নিয়ে এসে বসতেন। নিজ হাতে লাগানো গাছের উন্নত মানের আম কেটে কেটে দিতেন। তিনি অবশ্য ঐ সময় খেতেননা। পরম তৃপ্তিতে খাওয়া দেখতেন। একইভাবে কুরবানী ঈদের পরে ফিরে খুঁজে বের করতেন। ডেকে বলতেন 'জয়পুরহাট থেকে পায়া নিয়ে এসেছি। কয়েকদিন জ্বাল দিয়ে ওটাকে সুস্বাধু করা হয়েছে। বাসায় চলো'। সাথে যেতাম নিজ হাতে পরাটা তৈরি করে নিজের তত্ত্বাবধানে রান্না করা পায়া দিয়ে নাস্তা করাতেন। আসলেই তৃপ্তি ভরে খেতাম। সে এক অবিস্মরণীয় স্মৃতি। যা মাঝে মাঝে বিস্মিত করে, গর্বিতও করে। মৃত্যু শয্যায় শায়িত অবস্থায় যতবার গিয়েছি চেতনা থাকলে কিছু খেতে বাধ্য করেছেন। একদিন ছোটো ছেলেকে নিয়ে গিয়েছিলাম। অর্ধচেতন অবস্থায় তিনি শুয়েছিলেন। ঐ অবস্থায়ও ফ্রিজে রক্ষিত আম না খেয়ে আসতে দিলেন না। সহযাত্রীদের প্রতি, ছোটদের প্রতি এমন হৃদয় নিংড়ানো ভালোবাসা আজকের দিনে কল্পনা করা যায়না। আজকের দিনে যা কল্পনা করা যায়, সচরাচর বাস্তবে তার নজীর পাওয়া যায়না। সফরকালীন সময়ে গাড়ীর ড্রাইভারসহ সকলের খোঁজ-খবর নিতেন। তাদেরকে রেখে কখনও একা খেতেননা। ভিন্ন ধরনের খাবারও সমর্থন করতেননা। একই সাথে বসে একই খাবারের ব্যবস্থা না হলে অনেক সময় তিনি না খেয়ে অপেক্ষা করতেন।

আজ তিনি আমাদের মাঝে নেই। তাই বারবার এ স্মৃতিগুলো ভেসে উঠছে। জীবিত থাকাকালীন সময়ের চেয়ে তাঁর অনুপস্থিতিতে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি ক্রমান্বয়ে বেড়েই চলেছে। তবে এই স্মৃতিগুলোর চেয়ে তাঁর নীতিনিষ্ঠা, আপোষহীনতা চারিত্রিক দৃঢ়তা, আন্দোলনের দৃষ্টিভঙ্গিগত স্বচ্ছতা সংক্রান্ত স্মৃতিই আজ প্রতিদিন মানসপটে জ্বলজ্বল করে ভেসে উঠছে। আর বারবার মনে হচ্ছে সত্যিই আমরা এক অমূল্য সম্পদ হারিয়ে ফেলেছি। আজকের দিনে যা দুর্লভ, আজকের দিনে যা বেশী প্রয়োজন তাঁর জীবন জুড়ে তাই পরিবেষ্টিত ছিলো।

তাঁকে আমি আল্লাহর রহমতে মৃত্যুর আগের রাতেও দেখার সুযোগ পেয়েছি। কিন্তু মন খুলে উদার চিত্তে সবশেষে দীর্ঘ কথা হয়েছে মক্কা মুকাররমায়। কাবা বায়তুল্লাহর নিকটতম একটি ঘরে প্রাণ উজাড় করে তিনি আমার সাথে কথা বলেছেন। ঐ আলাপচারিতায় তিনি আমাকে অত্যন্ত স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বুঝাতে চেষ্টা করেছেন যে, মাওলানা মওদূদী র. কুরআন এবং সুন্নাহর ভিত্তিতে জামায়াতে ইসলামী নামে একটি পূর্ণাঙ্গ ইসলামী আন্দোলনের গোড়া পত্তন করে গেছেন। এর লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, কর্মসূচী, কর্মপদ্ধতি, কর্মনীতি ইত্যাদি সবই কুরআন এবং রাসূল স. পরিচালিত আন্দোলন থেকেই গ্রহণ করা হয়েছে। সেই ভিত্তিমূলকে অবলম্বন করেই ধীরে ধীরে আন্দোলন আজ এ পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে। তিনি বুঝাতে চেষ্টা করলেন, আন্দোলন যতো বড় হবে বাঁধা-বিপত্তি, সংকট, জুলুম, নির্যাতন ততোই বাড়বে। লোভাতুর অনেক কিছুই সামনে এসে হাজির হবে। পদের লোভ, মর্যাদার লোভ, কিছু একটা হওয়ার লোভ এবং সস্তা জনপ্রিয়তার লোভ বারবার এসে আঘাত হানবে। এহেন অগ্নি পরীক্ষায় ওদূদী র. কুরআন ও সুন্নাহর ভিত্তিতে যে থীমের উপর (ভিত্তির উপর) আন্দোলনর দাঁড় করিয়েছিলেন সে ক্ষেত্রে আপোষহীন থাকতে হবে। কোনো অবস্থাতেই আপোষ কামীতাকে প্রশ্রয় দেয়া যাবেনা। ইতিহাস বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, কোনো একটা আন্দোলন যে থীম বা ভিত্তির উপর যাত্রা শুরু করে তার উপর আপোষহীন থাকতে পারলে ঐ আন্দোলন সফলতার মঞ্জিলে পৌছতে পারে। সমাজতন্ত্রের মতো একটি মানব রচিত মতবাদ যা নিঃসন্দেহে ত্রুটিপূর্ণ এবং মানবতার বিরোধী সেই মতবাদ কেন্দ্রিক আন্দোলন রাশিয়াতে সফল হলো। প্রায় পঞ্চাশ বছরের মতো তো বিশ্বের একাংশে নেতৃত্ব দিতে সক্ষম হলো। কারণ ততোদিন পর্যন্ত তারা মৌলিক ক্ষেত্রে কোনো আপোষ করেনি। কিন্তু বিশেষ করে গরভাচেভ এসে যখন প্রেসত্রোয়কার নামে ঐ ভিত্তিমূলে আঘাত দিলেন তখন ঐ আন্দোলনও টিকে থাকতে পারলোনা। ঐ জগৎ থেকে সমাজতন্ত্র বিদায় নিতে বাধ্য হলো। আমরা যদি মাওলানা মওদূদী র. যে ভিত্তির উপর আন্দোলন দাঁড় করিয়েছিলেন সেই ভিত্তির উপর আন্দোলন অব্যাহত রাখতে পারি তাহলে দুনিয়ার কোনো শক্তিই আন্দোলনের অগ্রযাত্রাকে প্রতিহত করতে পারবেনা ইন্‌শাআল্লাহ। একটি আদর্শবাদী আন্দোলন বাইরের শত্রুর আক্রমণ বা নির্যাতনে স্তিমিত হয়ে যায়না। বরং তা আরো ফুঁসিয়ে উঠে। অভ্যন্তরীণ অবক্ষয়ই একটি আন্দোলনকে স্তিমিত করে, অনেক সময় ধ্বংসও করে দেয়। এজন্য সর্বাবস্থায় 'সবর' অত্যন্ত

জরুরী। সবর দৃঢ়তা সৃষ্টি করে। আন্দোলনকে বলিষ্ঠ করে তোলে। এর বিপরীত তড়িঘড়ি পদক্ষেপ আন্দোলনকে বিপথগামী করে। একটার পর একটা অবক্ষয়ের তালিকা বাড়তেই থাকে। অতএব, ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিয়ে এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট সকলকে সদা সজাগ ও সচেতন থাকতে হবে। মরহুম আব্বাস আলী খান সাহেব আন্দোলনের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মঞ্জিলে এ ব্যাপারে জীবন্ত স্বাক্ষর রেখে গেছেন। নীতি নৈতিকতা এবং আদর্শের প্রতি অবিচল থাকার ক্ষেত্রে তিনি অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন।

মরহুম আব্বাস আলী খান অনুসরণ করার মতো বহু দিক-নির্দেশনা রেখে গেছেন। জীবন সায়াহ্নে এসে বিশেষ করে ৩টি বিষয়ের উপর বারবার তাগিদ দিয়ে গেছেন। সকলের অবগতি ও অনুসরণের জন্য তা উল্লেখ করা দরকার ঃ

এক. ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের নামাযকে তিনি সুন্দর করার জন্য বারবার তাগিদ দিয়ে গেছেন। আল-কুরআন এবং রাসূল স.-এর উদ্ধৃতি দিয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। রাসূল স. ও সাহাবায়ে কেরাম রা. যেভাবে নামায আদায় করেছেন সেভাবে নামায আদায় করতে তিনি নিজেও সচেষ্ট ছিলেন। ক্বিয়াম, তেলাওয়াত, রুকু, সেজদা, তাসবীহ, দরূদ ইত্যাদি একনিষ্ঠ মনোযোগী হয়ে আদায় করেছেন। সুন্দর প্রস্তুতি নিয়ে নামাযে দাঁড়ানো এবং নামায শেষে প্রশান্ত চিত্তে বের হয়ে আসাকে তিনি গুরুত্ব দিতেন। জীবন সায়াহ্নে তিনি তাঁর পরিবারের সদস্যদেরকেও নামাযের ব্যাপারে আরো আন্তরিক, আরো একনিষ্ঠ হতে বলে গেছেন। প্রকৃতপক্ষে মুসলমান হিসেবে যে চরিত্রের ধারক হওয়া আমাদের প্রয়েজন, নামাযই সেই চরিত্র সৃষ্টিতে সহায়ক। নামায এমনসব ত্রুটি থেকে মানুষকে মুক্ত রাখে যা অন্য কোনোভাবে হয়না।

দুই. প্রতিটি ক্ষেত্রে সত্যের সাক্ষ্যদাতা হওয়ার জন্য তিনি ব্যাকুল থাকতেন। অন্যদেরকেও তিনি সেভাবে উদ্বুদ্ধ করেছেন। জীবনের বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে ইসলামের সঠিক প্রতিনিধিত্ব করার নামই সত্যের সাক্ষ্যদান। ব্যক্তিগত,পারিবারিক, সামাজিক ইত্যাদি প্রতিটি ক্ষেত্রে ঈমানের প্রতিফলন ঘটানো মু'মিনের বৈশিষ্ট্য। ঘরের অভ্যন্তরীণ জীবনে, আন্দোলনের সাংগঠনিক পর্যায়ে, পেশাগত জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে অর্থাৎ আয় উপার্জন এবং ব্যয় ও জীবিকা নির্বাহে আপোষহীনভাবে ইসলামের নীতিমালা মেনে চললেই কেবল সঠিক সাক্ষ্যদাতার ভূমিকা পালন করা সম্ভব। যেনো সকলেই আমাদেরকে দেখে, আমাদেরটা শুনে এবং আমাদের তৎপরতা অবলোকন করে একটা পবিত্র স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য খুঁজে পায়। এ কাজটা যতো নিখুঁতভাবে আমরা করতে পারবো ততোই আমাদের সফলতা দেখা দেবে।

তিন. আখেরাত কেন্দ্রিক জীবন গড়ার প্রয়োজনীয়তা তিনি তীব্রভাবে অনুধাবন করতেন। ইসলামী আন্দোলন যে ত্যাগ, কুরবানী, ধৈর্য, অধ্যাবসায়, বলিষ্ঠতা, দৃঢ়তা আশা করে তা কেবল জীবনকে আখেরাতকেন্দ্রিক করে গড়ে তুলতে পারলেই সম্ভব। পার্থিব জীবনের প্রাচুর্য, বিত্ত বৈভব ইত্যাদি সবই মানুষকে পিছুটান দেয়। যারা এর কবলে পড়ে তাদের পক্ষে পিছুটান মুক্ত হয়ে সামনে ঝাঁপিয়ে পড়া সম্ভব হয় না। এমনকি জমি কেনা, বাড়ী করা, সম্পদ বৃদ্ধি করার চিন্তা যদি দৈনন্দিন চিন্তার

অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায় তাহলেও সে পিছুটানে পড়ে যাবে। নেহায়েত বেঁচে থাকার জন্য যা প্রয়োজন অর্থাৎ যা না হলে নয় অতটুকু চিন্তাতেই সীমাবদ্ধ থাকতে হবে। আর আখেরাতের চিন্তা প্রবল হলেই এহেন চিন্তা মজবুত হতে পারে। রাসূলুল্লাহ্ স.-এর নির্দেশে মক্কার সাহাবাগণ রা. যখন মদীনায় হিজরত করেন তখন কোনো পিছুটানই তাদেরকে আটকে রাখতে পারেনি। বাড়ী-ঘর, বিত্ত, বৈভব, চাকরি, ব্যবসা-বাণিজ্য কোনো কিছুর আকর্ষণই বাঁধা হয়ে দাঁড়াতে পারেনি। অত্যন্ত প্রশান্ত মনে প্রিয় জন্মভূমি মক্কা ছেড়ে মদীনায় চলে গেছেন। অন্যদিকে মদীনার আনসার সাহাবা গণ রা. এই অসহায় মুহাজীরদের র. ভরণপোষণের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। আর্থিক অবস্থা তাদেরও ভালো ছিলোনা। কিন্তু অত্যন্ত আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সাথে প্রশান্ত মনে এ দায়িত্ব পালন করেছেন। মুহাজির ও আনসার উভয়ের পক্ষে এহেন ভূমিকা পালন সম্ভব হয়েছে এজন্য যে, তাঁরা তাদের জীবনকে পূর্ণ মাত্রায় আখেরাত কেন্দ্রিক করে গড়ে তুলেছিলেন। মরহুম আব্বাস আলী খান সাহেব এ নজীরগুলো তুলে ধরে বলতে চেয়েছেন যে, আজকের দিনে কেবল ঐ পথেই সফলতা সম্ভব। পার্থিব কিছু পাওয়ার চিন্তা সাময়িক উত্তেজনা সৃষ্টি করতে পারে কিন্তু একটি আদর্শবাদী আন্দোলনকে সঠিক খাতে প্রবাহিত করতে পারে না। পার্থিব কিছু পাওয়া আকাঙ্খার ব্যাপার নয় তা আল্লাহর মর্জির ব্যাপার। দুনিয়াতে আল্লাহ্ তায়ালা যার জন্য যা রেজেক নির্দিষ্ট করেছেন এবং পদমর্যাদা ঠিক করেছেন তা পূরণ হচ্ছে। তাই আকাঙ্ক্ষা করতে হবে, প্রতিযোগিতা করতে হবে মাগফেরাতের জন্য এবং আল্লাহর রাহমত পাওয়ার জন্য।

মরহুম আব্বাস আলী খান আমাদের কাছ থেকে চির বিদায় নিয়ে চলে গেছেন। তিনি আর ফিরে আসবেন না। তাঁর কণ্ঠ আর শোনা যাবেনা। টেবিলের সামনে বসে নিবিষ্ট মনে বই পড়তে আর দেখা যাবেনা। কলম দিয়ে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা আর তিনি লিখবেননা। কিন্তু তিনি আমাদের মাঝে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। স্মৃতির পাতায় তিনি মাঝে মাঝে দোল খেয়ে যাবেন। হৃদয় নিংড়ানো তাঁর উপদেশাবলী আমাদের অন্তরে সব সময় ভাস্বর হয়ে থাকবে। আন্দোলনের কন্টকাকীর্ণ পথে সবর ও বলিষ্ঠতার নজীর স্থাপনকালে তাঁর কথা বারবার মনে পড়বে। আর তাই আজ একান্তভাবে কামনা করি আমরা যেনো কর্মের মাধ্যমে তাঁকে স্মরণ করি।

আব্বাস আলী খান ঃ একটি ইতিহাস

বদরে আলম

ফাইন্যান্স সেক্রেটারী, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ।

আব্বাস আলী খান তিনটি রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে সক্রিয় রাজনৈতিক ভূমিকায় থাকার যে বিরাট অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন তা খুব কম লোকের মধ্যে পাওয়া যায়। তিনি বৃটিশ ইন্ডিয়া, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ-এর ইতিহাসের সাথে জড়িত ছিলেন। বৃটিশ ইন্ডিয়ার সময় অভিন্ন বেঙ্গলের চীফ মিনিস্টার শের-এ বাংলা মৌওলবী এ, কে, ফজলুল হক সাহেবের পি এস হিসেবে কলকাতায় রাইটারস বিল্ডিং-এ দায়িত্ব পালন করেন এবং রাজনীতি সম্পর্কে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। এরপর পাকিস্তান আমলে রাজশাহী বিভাগে জামাাতে ইসলামীর আমীর হিসেবে বহুদিন দায়িত্ব পালন করেন এবং ইসলামী আন্দোলনকে উত্তরবঙ্গে প্রসার করার বিরাট খেদমত আনজাম দেন। তিনি ঐ সময় পাকিস্তানের জাতীয় সংসদের সদস্য (এম, এন, এ) নির্বাচিত হয়েচিলেন। ১৯৬৪ সালে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদে জামায়াতে ইসলামীর চারজন সদস্যের সংসদীয় দলের নেতা ছিলেন। আইয়ুব খানের পারিবারিক আইনের বিরুদ্ধে ও ইসলামী শরীয়তের পক্ষে মজবুত ভূমিকা পালন করেন।

বাংলাদেশ আমলে জামায়াতে ইসলামীর ভারপ্রাপ্ত আমীর হিসেবে যে ভূমিকা পালন কছেন তা অনুসরণীয়। রাজনৈতিক বক্তব্য রাখার সময় তিনি আল্লাহ্ ছাড়া কাউকে ভয় করতেননা। স্পষ্টভাবে শাসকদের সমালোচনা করতেন। কেয়ারটেকার সরকারের দাবী প্রথমে তিনিই তুলেন এবং '৯০ সালের সরকার বিরোধী আন্দোলনে বিরাট ভুমিকা পালন করেন। এভাবে তিনটি রাষ্ট্রে রাজনীতি করার অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন।

লেখক ও সাহিত্যিক হিসেবে আব্বাস আলী খান-এর আলাদা মর্যাদা ছিলো। তিনি বাংলা, উর্দু ও ইংরেজী ভাষায় পারদর্শী ছিলেন এবং আরবী ও ফার্সি ভাষাও জানতেন। তিনি বহু বই অনুবাদ করেছেন। এছাড়া তিনি নিজেও অনেক মুল্যবান বই লিখেছেন। দেখা গেছে অবসর সময়ে তিনি হয় বই পড়ছেন, না হয় লিখছেন। তিনি অর্থহীন গল্প-গুজন ও কতাবার্তা বলে সময় নষ্ট করতেন না।

ইসলামী চিন্তাবিদ হিসেবে দেশে বিদেশে তাঁর বেশ খ্যাতি ছিলো। ইউরোপ, আমেরিকা, জাপান ও আরো অনেক দেশের তিনি দাওয়াতে বিভিন্ন ইসলামী সংগঠন-সংস্থার তাদের সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করেন। ১৯৮২ সালের এক ঘটনা। ভারতের হায়দারাবাদে জামাযাতে ইসলামী হিন্দের একটি সম্মেলন। আব্বাস আলী খানকে বক্তৃতার বিষয় দেয়া হয়েছিলো, "পনের শতাব্দীর হিজরী-ইসলামের শতাব্দী।" আব্বাস আলী খান সাহেবের সাথে আমার যাওয়ার কথা ছিলো। ভারত

সরকার তাঁকে ভিসা দেয়নি। আমি একা গেলাম, নিয়ে গেলাম তাঁর প্রবন্ধটি। হায়দারাবাদ সম্মেলনে দুই লক্ষ মানুষের সভায় আমাকেই প্রবন্ধটি পাঠ করতে দেয়া হলো। আমি তাঁর প্রবন্ধ পাঠ করলাম। তাঁর চিন্তাধাা এতো আকর্ষণীয় ছিলো যে ঐ সেসনের যতো স্থানীয় বক্তা ছিলেন সবাই তাঁর উপস্থাপিত মতামতাকে সমর্থন করেই বক্তব্য রাখলেন।

ইসলাম সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণার অধিকারী ছিলেন তিনি। তাঁর লেখা বইপত্রে এর প্রমাণ মেলে। তাঁর একটি গবেষণামূলক বই "বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস" পড়লে তিনি যে কতো বড় মাপের গবেষক ছিলেন তা বুঝা যায়। মাওলানা মওদূদীর জীবনী, তাঁর এক ঘনিষ্ঠ সাথী হিসেবে তিনি লিখেছেন। ইসলামী গবেষণা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর নেতৃবৃন্দের মধ্যে তাঁরই অবদান বেশী। একবার আমি শের-এ বাংলা ফজলুল হক-এর উপর একটি লেখা চাইলাম আমার ইস্টার্ন ফিচার সার্ভিসের জন্য। তিনি স্বতঃস্ফূর্তভাবে দু'দিনের মধ্যে একটি সুন্দর প্রবন্ধ লিখে দিলেন। আমি তাঁকে কিছু পারিশ্রমিক দিতে চাইলাম। তিনি নিলেননা। বললেন, যান আপনারা মিষ্টি খেয়ে নিবেন। কত বড় মন তাঁর।

তিনি ব্যক্তিগত জীবনে খুবই আবেদ পরহেজগার ছিলেন। জামায়াতে ইসলামীর আন্দোলনে আসার আগে তিনি একটি পীর সিলসিল্লার খলিফা ছিলেন। আধ্যাত্মিক দিক দিয়েও তাঁর অনেক উচ্চ মান ছিলো। স্থানীয় মসজিদে সব সময়ে প্রথম কাতারে নামায পড়তে দেখেছি। চলাফেরার মধ্যে কোনো অহংকারের লক্ষণ দেখিনি। বেশীরভাগ সময় তিনি গম্ভীর থাকতেন। কথাবার্তা কম বলতেন। তাঁর লিখিত 'স্মৃতির সাগরে ঢেউ' ও ভ্রমণ কাহিনীগুলোর মধ্যে তাঁর জবিনের রসালো দিক পাওয়া যায়। বাইরে থেকে দেখতে যতো গম্ভীর মনে হতো কাছে মিশলে বুঝা যেতো তিনি কতো রসিক ছিলেন।

হুগলী মাদ্রাসায় পড়ার সময় কবি নজরল ইসলামের সাথে তাঁর যোগাযোগ হয়। বিখ্যাত গায়ক আব্বাস উদ্দিনের সাথেও তাঁর বন্ধুত্ব ছিলো। কবি নজরুল ইসলামের অনেক কবিতা মরহুম খান সাহেবের মুখস্ত ছিলো। মাঝে মাঝে তিনি আমাদের শুনাতেন। তিনি হাফেজ ছিলেননা কিন্তু কুরআনের অনেক অংশ তাঁর মুখস্ত ছিলো। এশার নামাযে ইমামতি করতে গেলে প্রায়ই সূরা ইউসুফ কেরাত করতেন। একবার তাঁর পেছনে নামায পড়তে যেয়ে সূরা ইউসুফ শুনে যে আনন্দ ও মজা পেয়েছিলাম আজও তা ভুলিনি। শেষের বছরগুলোতে রমযানে তারাবীর ইমামতি করতেন।

আব্বাস আলী খান খুবই ধৈর্যশীল ব্যক্তি ছিলেন। কোনো সময় কোনো অভিযোগ তাঁর মুখ থেকে শুনিনি। একবার আমার বাসায় দাওয়াত ছিলো। খাবার ব্যাপারে ডাক্তার তাঁকে কিছু নিষেধ করেছিল। কিন্তু যেটা নিষেধ সেটাই রান্না করা হয়েছিল, আমরা জানতামনা। ওই অবস্থায় দেখলাম তিনি ঐ খাবারই খেলেন কোনো অভিযোগ করছেননা। মেজবানকে কোনো অসুবিধার মধ্যে ফেলা পছন্দ করলেননা।

সবচেয়ে বড় ধৈর্যের পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর পারিবারিক জীবনে। খান সাহেবের স্ত্রী বহু বছর যাবত প্যারালাইসড অবস্থায় বিছানায় শয্যাশায়ী ছিলেন। এ অবস্থায় স্ত্রীকে রেখে

ইসলামী আন্দোলনের জন্য সারাদেশে ও বিদেশে ঘুরে বেড়াতেন, কারো কাছে তার স্ত্রীর অসুখের কথা প্রকাশও করতেননা। এটা কতো বড় ধৈর্যের উদাহরণ! মাসে একবার করে বাড়ী যেতেন; বাড়ীতে স্ত্রীর খেদমত করতেন একমাত্র মেয়ে।

শুনেছি তাঁর পূর্বপুরুষ পাঠান মুল্লুক থেকে ঘোড়ায় চড়ে এসে জয়পুরহাটে বসতি স্থাপন করেছিলেন। খাস পাঠান হিসেবে তাঁর মধ্যে রাগও ছিলো। অন্যায় দেখলে মাঝে মাঝে রেগে যেতেন। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই আবার ধৈর্য ধরতেন। আল্লাহ্ তাঁকে সেই গুণ দিয়েছিলেন।

আব্বাস আলী খান অনেক উচ্চ পর্যায়ের লোক; কিন্তু সাংগঠনিক শৃংখলা খুবই মেনে চলতেন। জামায়াত যে সিদ্ধান্ত নিতো তা কোনো কোনো সময় মতের পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও তিনি মেনে নিতেন এবং সেই মোতাবিক কাজ করতেন।

আব্বাস আলী খানের সাথে আমার পরিচয় পঞ্চাশ দশক থেকে। তাঁর সাদাসিধা জীবন আমাকে মুগ্ধ করেছে। তাঁর মুখে কারো গীবত ও নিন্দা শুনিনি। খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে তাঁর রুচি অনেক উন্নত ছিলো। জিনিসপত্র নিজে সংগ্রহ করে রাখতেন, কিন্তু না পেলে বেজার হতেননা। অসুখ হলে জিজ্ঞাসা না করা পর্যন্ত নিজের কষ্টের কথা বলতেননা। কোনো মসলিসে বসলে মাওলানা মওদুদীর মতো চুপ থাকতেন। প্রশ্ন করলে উত্তর দিতেন। বেশী কথা বলতেননা। সাংগঠনিক বৈঠকেও খুব কম কথা বলতেন। প্রয়োজন ছাড়া কথা বলতেননা। তিনি এক নিবেদিত প্রাণ মুজাহিদ ছিলেন। সব সময় আন্দোলনের চিন্তা করতেন অন্য কোনো চিন্তা বা ব্যস্ততা দেখিনি তাঁর জীবনে।

আব্বাস আলী খানের জীবন ৯ দশকের ইতিহাস। তাঁর জীবনী লিখলে এক বিরাট গ্রন্থ হয়ে যাবে। ইসলামী আন্দোলনের নেতা ও কর্মীদের জন্য তাঁর জীবনে অনেক শিক্ষণীয় ও অনুস্মরণীয় উদাহরণ আছে। দোষে গুণে মানুষ। তাঁর জন্য এই দোয়া করতে চাই যে আল্লাহ্ তাঁর ত্রুটিগুলো মাফ করেদিন ও ভাল কাজগুলো কবুল করুন। আমাদেরকেও আল্লাহ্ তাঁর মতো ইসলামী আন্দোলনে খেদমত করার তৌফিক দান করুন- আমিন।

আমাদের প্রিয় নেতা আব্বাস আলী খান

মুহাম্মদ কামারুজ্জামান

সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ। সাবেক সভাপতি
বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির। সম্পাদক, সাপ্তাহিক সোনার বাংলা।

আমাদের সকলের প্রিয় নেতা বাংলাদেশে ইসলামী আন্দোলনের সংকটকালের কাণ্ডারী আব্বাস আলী খান আর আমাদের মাঝে নেই। লক্ষ লক্ষ ভক্ত-অনুরক্তদের শোক সাগরে ভাসিয়ে তিনি চলে গেছেন মহান প্রভুর দরবারে। তিনি ছিলেন জামায়াত নেতাদের মধ্যে প্রবীণতম। তাঁর ইন্তেকালে জামায়াত হারিয়েছে এক মহান অভিভাবক এবং দিশারীকে আর জাতি হারিয়েছে একজন সুপণ্ডিত ও নিষ্ঠাবান দেশ প্রেমিককে।

মরহুম আব্বাস আলী খানের গভীর সান্নিধ্যে যতো বেশী গিয়েছি ততোই উপলব্ধি করেছি তাঁর অসাধারণ ব্যক্তিত্বকে। বয়সের হিসেবে আমরা ছিলাম মরহুমের নাতির সমতুল্য। ঘটনাক্রমে আমার ডাক নামের সাথে তার নাতির নাম মিলে যাওয়ায় আমিও বনে গিয়েছিলাম তার নাতি এবং নিজ নানাকে চোখে দেখার সৌভাগ্য না হলেও মরহুম আব্বাস আলী খানকেই বসিয়েছিলাম সেই আসনটিতে। ফলে মরহুমের সাথে আমার ব্যক্তিগত সম্পর্কও ছিলো খুবই সহজ ও মধুর।

মরহুম আব্বাস আলী খানের মধ্যে সমাবেশ ঘটেছিল চমৎকার সব গুণাবলীর। একাধারে তিনি ছিলেন একজন রাজনীতিবিদ, শিক্ষাবিদ, লেখক, সুবক্তা এবং বড় মাপের একজন আল্লাহওয়ালা ও দেশপ্রেমিক। বৃদ্ধ বয়সেও তাঁর কণ্ঠ ছিলো যুবকের মত পরিচ্ছন্ন এবং আকর্ষণীয়। অনেকবার তাকে অসুস্থ অবস্থায় অনেকটা জোরপূর্বক হাজির করেছি জনসভায়। কিন্তু তিনি যখন মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলা শুরু করতেন তাঁর সাবলীল বাচনভঙ্গি এবং ওজস্বি বক্তব্যে বিমোহিত হয়েছে ছাত্র-জনতা। জামায়াতে ইসলামীর কয়েকটি সদস্য সম্মেলনে ভারপ্রাপ্ত আমীর হিসেবে তাঁর উদ্বোধনী ভাষণ এবং হৃদয়গ্রাহী আলোচনার কথা উপস্থিত জামায়াত রুকন ও অতিথিবৃন্দের কাছে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। মরহুমের এসব ভাষণে যেমন ছিলো গভীর পাণ্ডিত্যের ছাপ, তেমনি ছিলো ভাষার মাধুর্য এবং উম্মতের জন্য সঠিক দিক দর্শন।

মরহুম আব্বাস আলী খানের বাংলা, ইংরেজী ও উর্দু ভাষায় দখল ছিলো ঈর্ষা করার মতো। আরবীও তিনি একজন আধুনিক ধারায় শিক্ষিত ব্যক্তি হিসেবে অনেক ভালো জানতেন যা আজ আমরা কল্পনাও করতে পারিনা। তাঁর হাতের লেখা ছিলো অতি চমৎকার। কী বাংলা বা ইংরেজী এবং উর্দু। অল্প যে দু'চারজন লোককে দেখেছি বাংলা বানান বিভ্রম হয়না আব্বাস আলী খান তাদের একজন। তাঁর লেখার তিনি নিজে প্রুফ দেখতেন যাতে লেখাটি বিশুদ্ধভাবে ছাপা হয়।

অনেক সফরে তাঁর সাথে ছিলাম এবং প্রত্যক্ষ করেছি জুমআর নামাযের খুতবা দেয়ার জন্য কোনো কিতাব হাতে নেয়া ছাড়াই খুতবা দিতেন। পবিত্র কুরআন মজিদ অধ্যয়ন ও অনুশীলনের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন এক অগ্র সৈনিক। পাঁচ ওয়াক্ত নামায মসজিদে গিয়ে জামায়াতের সাথে আদায় করার ব্যাপারে তাঁর একাগ্রতা এবং সেই সাথে সিরিয়াসনেস ছিলো সত্যিই উৎসাহ ব্যঞ্জক।

যেসব মহান ও প্রবীণ ব্যক্তিকে বলা হয়ে থাকে ত্রিকালের সাক্ষী মরহুম নেতা আব্বাস আলী খানও ছিলেন তেমনি এক ব্যক্তিত্ব। বর্ণাঢ্য ছিলো তাঁর কর্মময় জীবন। সরকারী কর্মচারী-হিসেবে যাত্রা শুরু, শেরে বাংলার সচিবের দায়িত্ব, প্রধান শিক্ষক হিসেবে এবং অতঃপর ইসলামী দলের নেতা, লেখক, জাতীয় পরিষদ সদস্য, প্রাদেশিক শিক্ষামন্ত্রী, সমাজ সেবক হিসেবে তাঁর কর্ম অক্ষয় হয়ে থাকবে এবং ইসলাম প্রতিষ্ঠাকামী মানুষকে প্রেরণা যোগাবে যুগ যুগ ধরে।

ঝঞ্জা বিক্ষুব্ধ ও বৈরী রাজনৈতিক পরিবেশে মরহুম আব্বাস আলী খান প্রায় সাড়ে চৌদ্দ বছর জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের ভারপ্রাপ্ত আমীর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। জামায়াতের আমীর মজলুম নেতা অধ্যাপক গোলাম আযমের নাগরিকত্ব সমস্যার কারণে মরহুম আব্বাস আলী খানই রাজনৈতিক ময়দানের নেতৃত দিয়েছেন। ১৯৭৯ সালের মে মাসে প্রকাশ্যভাবে জামায়াতে ইসলামীর কর্মকান্ড শুরু হয় সাবেক হোটেল ইডেন চত্বরে একটি জাতীয় কনভেনশনের মাধ্যমে। এ বছরই জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জামায়াত ৬টি আসন লাভ করে। ১৯৮৬ সালে নির্বাচনে ১০টি এবং ১৯৯১ সালের নির্বাচনে ২০টি আসন পেয়ে জামায়াত পার্লামেন্টের বাইরে ও ভিতরে এদেশের ইসলাম প্রিয় জনতার মুখপাত্রে পরিণত হয়। ১৯৯০ সালের গণ-অভ্যুত্থানে জামায়াত ১৫ দলীয় জোট ও ৭ দলীয় জোটের পাশাপাশি আব্বাস আলী খানের নেতৃত্বেই যুগপৎ আন্দোলনে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে। মরহুমের নেতৃত্বে রাজপথের আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করার কারণেই জামায়াত বিরোধী একতরফা মিথ্যা প্রচারণা ও ষড়যন্ত্র সত্ত্বেও জামায়াত ১৯৯১-এর নিরপেক্ষ নির্বাচননে দেশের প্রায় ১৩ শতাংশ ভোটারের সমর্থন লাভে সক্ষম হয়।

উল্লেখ্য যে কেয়ারটেকার সরকারের বিধান আজ বাংলাদেশের সংবিধানে স্থান পেয়েছে সেই দাবী প্রথম উত্থাপন করেন মরহুম আব্বাস আলী খান বায়তুল মোকাররমের দক্ষিণ গেটে আয়োজিত এক জনসভায় ২০শে নবেম্বর ১৯৮৩ সালে। কেয়ারটেকার সরকারের ফর্মুলা দিয়েছিলেন জামায়াতের আমীর অধ্যাপক গোলাম আযম। কিন্তু এটা বাস্তবায়নে আন্দোলনের পতাকাবাহী ছিলেন মরহুম আব্বাস আলী খান। এই দীর্ঘ আন্দোলন চলাকালে আব্বাস আলী খানের আপোসহীন ভূমিকা এবং দেশ ও জনগণের প্রতি দায়িত্বশীলতার কারণে দলীয় পরিমন্ডলের বাইরেও অনেকের শ্রদ্ধা ও সম্মান অর্জন করেছেন তিনি। একজন বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা লিখিতভাবে আব্বাস আলী খানের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। বৃদ্ধ বয়সেও সংকটকালে ছুটে

গিয়েছেন দুঃখী মানুষের কাছে। জগন্নাথ হলের ছাদ ধ্বসে পড়লে সেদিন যে হৃদয় বিদারক দৃশ্যের অবতারণা হয়েছিল তা দেখতে তিনি রাতেই ছুটে গিয়েছিলেন জগন্নাথ হলে। শোকার্ত ছাত্র-শিক্ষিকদের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন এবং হৃদয় নিঙড়ানো সমবেদনা জানিয়েছিলেন তিনি। অনুরূপভাবে ভারতে মুসলিম হত্যার জন্য ঢাকায় সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা দেখা দিলে আব্বাস আলী খান নিজে ছুটে গিয়েছিলেন রামকৃষ্ণ মিশনে এবং আশ্বস্ত করেছেন সংখ্যালগু হিন্দু সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দকে। রাজনৈতিক দায়িত্ব পালন খুবই কঠিন এবং জটিল। বিশেষ করে শীর্ষ নেতাদের বক্তব্য নিয়ে এক শ্রেণীর পত্রপত্রিকা বিকৃত তথ্য পরিবেশন করে থাকে। তাঁর কথাকে যেনো অবলম্বন করে কোনো বিভ্রান্তি না ঘটে সে ব্যাপারে তিনি যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করতেন। স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলন এবং কেয়ারটেকার আন্দোলনের দীর্ঘ সাড়ে ১৪ বছর জামায়াতের শীর্ষ দায়িত্ব পালনের সময় তিনি বক্তব্য রাখতে গিয়ে এমন কোন ফাউল কথা বলেননি যা নিয়ে প্রতিপক্ষ উত্তেজনা সৃষ্টি করতে পারে। একবার তার পাকিস্তান সফরের উদ্ধৃতি দিয়ে সরকারী টেলিভিশন বিভ্রান্তি সৃষ্টির পরদিনই ঘটনাক্রমে আব্বাস আলী খান সাহেবের বায়তুল মোকাররমের দক্ষিণ গেটে বিশাল এক জনসভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বলিষ্ঠ ভাষণ দেয়ার ফলে আল্লাহর মেহেরবাণীতে সরকার ব্যর্থ হয়। একজন নেতা হিসেবে এটাও একটি উল্লেখ করার মত ব্যাপার বলে মনে করি। কারণ অনেক বড় বড় নেতা কথাবার্তা বলতে গিয়ে ভারসাম্য হারান এবং সঙ্গীদের জন্য সমস্যার সৃষ্টি করেন।

১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবার বছর দুই পর একবার জানতে পারলাম মরহুম আব্বাস আলী খান আমাকে হন্যে হয়ে খুঁজছেন। আমি সম্ভবতঃ রাজধানীর বাইরে ছিলাম। বাসায় ফিরতেই আমার স্ত্রী জানালেন খান সাহেব আমাকে ফোনে খোঁজ করেছেন। সাথে সাথেই ফোন করলাম। তিনি আমাকে বললেন আছরের সময় তুমি কি অফিসে দেখা করতে পারবে? আমার বিশেষ কথা আছে। বললাম, আপনি বললে অবশ্যই পারবো ইনশাআল্লাহ। দেখা করার পর তিনি দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে তাঁর অবজারভেশন পেশ করে বললেন, তোমরা অত্যন্ত দ্রুততার সাথে কাজ করে যাও। ইসলামী ও জাতীয়তাবাদী শক্তিসহ সকল বিরোধী দলকে ঐক্যবদ্ধ করে যদি ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তুলতে না পারো তাহলে আমাদের দেশটির ভবিষ্যত বড় অন্ধকার। তিনি বললেন, বিএনপি, জামায়াতসহ সাবইকে রাজনৈতিক সংকটের গভীরতা বুঝতে হবে। প্রচণ্ড আন্দোলন গড়ে তোলা ছাড়া কোন বিকল্প নেই। তিনি তাঁর অভিব্যক্তির কথা সেক্রেটারী জেনারেল মতিউর রহমান নিজামীসহ জামায়াতের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ যারা রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সাথে সম্পৃক্ত তাদের সবাইকে জানিয়ে দিলেন। তিনি আমাকে এই বলেও সতর্কবাণী উচ্চারণ করে দিলেন, এবারের আন্দোলনের ঐক্য যেনো অবশ্যই নির্বাচনী ঐক্য হয়। নির্বাচনী ঐক্য ছাড়া এই জোটবদ্ধ আন্দোলনের ও শেষ রক্ষা হবেনা।

যে মরণের জন্য আমার লোভ হয়

আব্দুল কাদের মোল্লা

পাবলিসিটি সেক্রেটারী, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ, সাবেক আমীর
জামায়াতে ইসলামী ঢাকা মহানগরী।

গত ৬ই অক্টোবর। ভোর সাড়ে সাতটা। বাসায় বেল বাজলো। দরজা খুলে দেখি আমার শিক্ষকতা জীবনের এক প্রিয় ছাত্র শহীদ কোনো একটি কাজে হাজির। বর্তমানে জামায়াতে ইসলামীর একজন কর্মী। বাসা উত্তরার কাছে। কথাবার্তা বলতেই শহীদ মরহুম আব্বাস আলী খানের প্রতি তার ভক্তি শ্রদ্ধার কথা তুললো।। তার ভাষায়- 'জনাব খান আকার আকৃতিতে খুব বড় দেহের লোক ছিলেননা। কিন্তু হাঁটা চলায়, কথা বলার ধরণে, তাঁর চাহনীতে মনে হতো যেনো এক বিশাল ব্যক্তিত্ব। জনসভায় তিনি যে বক্তৃতা দিতেন তা অন্যান্য নেতাদের মতো ছিলোনা। ভাষার গাঁথুনি, বলার ভঙ্গি, যেখানে যে শব্দের উপর যতোটা জোর দেয়া দরকার তা দিতেন খুব মযবুতভাবে। স্যার, আসলে খান সাহেবের প্রতি আমার কিযে ভক্তি শ্রদ্ধা এবং মহব্বত ছিলো তা ভাষায় বলতে পারবোনা। মনে হয় যদি মরহুম খান সাহেবের জন্য প্রাণভরে চিৎকার করে কাঁদতে পারতাম একেবারে শিশুর মতো গড়াগড়ি দিয়ে তাহলে মনটা একটু হালকা হতো।"

আমার ছাত্রটি জামায়াতের সাথে যুক্ত হয়েছে খুব বেশীদিন নয়। কিন্তু এতো অল্প দিনে খান সাহেবের প্রতি তার শ্রদ্ধা এবং মহব্বতের কথা যেভাবে সহজ সরল ভাষায় অশ্রুসিক্ত চোখে বলে গেলো এটা হুবহু আমার মনেরই কথা।

বয়সে আমাদের চেয়ে অনেক বড় এবং ব্যক্তিত্বটি বেশী ভারী হওয়ার কারণে আমরা সাধারণত কেউই তাঁর নাম সচরাচর উচ্চারণ করতামনা। আমীরে জামায়াত থেকে সকলেই বলতাম 'খান সাহেব'। তাঁর পাণ্ডিত্য ছিলো সুগভীর। বাংলা ছাড়াও ইংরেজী ও উর্দু ভাষায় তাঁর দখল ছিলো প্রায় মাতৃভাষার মতো। আরবীতেও তাঁর দখল এতোটা ছিলো যে একজন আধুনিক শিক্ষিত লোক হওয়ার পরও জুমআর নামাযে খুতবা দেয়ার অনুরোধ আসলে কোনো দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ছাড়াই উঠে পড়তেন মিম্বরে। খুতবা দিতেন একজন যোগ্য আলেমের মতোই। নামাযে ইমামতি করতেন অত্যন্ত সাবলিল ভাষায় কুরআন মজীদ তেলাওয়াত করে। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ওয়াক্তে প্রায়ই নতুন নতুন আয়াত তেলাওয়াত করতেন।

ব্যক্তিগত আলাপচারিতায় একদিন জিজ্ঞেস করলাম, "আচ্ছা খান সাহেব আপনি মাদ্রাসায় না পড়েও এতো সূরা বা আয়াত মুখস্থ করলেন কি করে? তিনি একটু মুচকি হেসে বললেন, "বুঝলেন মোল্লা সাহেব, আমি ছোটবেলা থেকেই গানের পাগল ছিলাম। গান গাইতামও খুব। বিশেষ করে ঘুমন্ত মুসলিম জাতির জন্য কবি নজরুল ইসলামের জাগরণী গানগুলো আমার ছিলো খুব পছন্দ। কিন্তু ফুরফুরার মরহুম পীর আব্দুল হাই সিদ্দিকী সাহেবের মুরীদ হয়ে যখন গানের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলাম,

তখন তিনি তা অপছন্দ করলেন। আমি পীর সাহেবের খলাফত পেয়েছিলাম। তাই গান ছেড়ে দিয়ে কুরআন সুর দিয়ে পড়া শুরু করলাম। আর মুখস্ত করতে লাগলাম নতুন নতুন সূরা ও আয়াত। যখন সময় পাই, গুণ গুণ করে আমার বেশী পছন্দের আয়াতগুলো আবেগ ভরে তেলাওয়াত করি। একা একা থাকলে বেশ সুর দিয়েই তা করি। এ জন্যেই বেশ আয়াত মুখস্থ করতে পেরেছি। বয়স হলেও আল্লাহর মেহেরবাণীতে আমার স্মরণ শক্তিতে ভাটা পড়েনি। এখনও নতুন নতুন আয়াত মুখস্থ করার কোশেশ করি। মনেও থাকে বেশ।"

আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম পীর মুরীদি ছাড়লেন কেন? হেঁসে বললেন, একেবারে তো ছাড়িনি। আমি মাওলানা মওদূদীর র. মুরীদ। আপনারা আমার মুরীদ। বলেই জামায়াতে আসার ঘটনাটি বললেন। তিনি বললেন, 'হেডমাস্টারীর জীবনে অধ্যাপক গোলাম আযমের কাছ থেকে ইসলামী আন্দোলনের দাওয়াত পাই। বগুড়ায় গিয়ে জেলা জামায়াত অফিস থেকে কিছু বই সংগ্রহ করে পড়ি আর আকৃষ্ট হতে থাকি। একদিন ট্রেনে ভ্রমণের আমার পীর সাহেবকে মাওলানা মওদূদী র. লিখিত কয়েকটি বই থেকে উর্দুতে কিছু পড়ে শুনাতে থাকি। তিনি মুগ্ধ হয়ে শুনতে থাকেন। এক পর্যায়ে তিনি বলে উঠেন, "বাবা এটাই তো আসল কাজ। ইক্বামাতে দীনের জন্যই তো আমি আপনাদের তৈরি করছি। এ কাজই যখন আপনার পছন্দ, তখন জান প্রাণ দিয়ে করেন। এ কাজে কিন্তু ঝুঁকি আছে।" তখন থেকেই জাময়াতে যোগ দিয়ে কাজ শুরু করি।

উর্দু ভাষায়ও তাঁর দখল ছিলো বেশ। মাওলানা মওদূদীর র. বেশ কয়েকটি কঠিন বই তিনি তরজমা করেছেন। তার তরজমা যে কোনো আলেমের চেয়ে মোটেই কম সার্থক নয়। বইগুলো পড়লেই বুঝা যাবে উর্দু ভাষায় তাঁর দখল কতটা ছিলো। শুনেছি জেলখানায় প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মরহুম শাহ আজিজুর রহমান একদিন উদু ভাষায় আল্লামা ইকবাল, মির্জা গালিবসহ অন্যান্য অনেক কবি ও লেখকের কবিতা বই পত্র নিয়ে আলোচনার এক পর্যায়ে মরহুম খান সাহেবকে উস্তাদ হিসেবে মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। উর্দু ভাষায় মরহুম শাহ আজিজের দখল সম্বন্ধে যাদের ধারণা আছে তারা অবশ্যই তাঁর স্বীকৃত উস্তাদের ভাষা জ্ঞান সম্পর্কে সহজেই ধারণা করতে পারবেন।

খান সাহেবের কোনো পুত্র সন্তান ছিলোনা। এ জন্যে কোনো সময়ই তাঁকে আসফোস করতে দেখিনি। স্ত্রী অসুস্থ হয়ে বিছানায় ছিলেন দীর্ঘ নয় দশ বছর। কিন্তু কোনো সময়ই তাঁর জন্য তাঁকে পেরেশান দেখিনি। এমনকি ব্যক্তিগত আলাপচারিতায় নিজের থেকে কোনো সময়ই এসব কথা তুলতেননা। বরং ইসলামী আন্দোলন, তাকওয়া, উত্তম নামায, আল্লাহর ওয়াস্তে যে সব কাজ করা হয় তাতে নিয়তের বিশুদ্ধতা বা এখলাস্, দেশের ভবিষ্যত, বিশেষ করে বর্তমানে ভারতপন্থী এবং মারদাঙ্গা ও খুনাখুনিতে পারঙ্গম দলটি সরকারী ক্ষমতায় আসায় দেশের ভবিষ্যত কি হবে- এগুলোই ছিলো তাঁর আলোচনার বিষয়। বিগত কয়েক বছর ধরে দেশ নিয়ে তাঁর পেরেশানি এতটাই ছিলো যে, তার প্রতিক্রিয়া তিনি বিভিন্ন বৈঠকেও প্রকাশ করেছেন।

একদিন আমাদেরই নির্বাহী পরিষদের এক সদস্য নাসের ভাই বর্তমান দেশ ও জাতিদ্রোহী সরকারের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের গুরুত্ব দিতে গিয়ে বলছিলেন, দেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে আমি এতটাই শংকিত যে, যদি এ সময় ইবলিসও এসে বলে, "আমিও বর্তমান সরকারের বিরুদ্ধে একটা ঢিল ছুড়তে চাই, এদের কুকর্মের জন্য এদের মুখে থুথু মারতে চাই।" তাহলে আমি বলবো বেশক। একটু মুচকি হেসে খান সাহেব বললেন, "নাসের আমার মনের কথাই বলেছে।"

ইতিহাসের উপর তাঁর দখল ছিলো দারুণ রকমের। ১৯৩৫ সালে যখন মুসলমানেরা ইংরেজ ও হিন্দুদের ডাবল গোলামীর জিঞ্জিরে আবদ্ধ, সে সময়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একজন মুসলিম ছাত্রের ইতহাসে গ্রাজুয়েশন পরীক্ষায় ডিষ্টিংকশন পাওয়া মোটেই সহজ ব্যাপার ছিলোনা। বিশেষ করে হিন্দুদের চরম সাম্প্রদায়িক মানসিকতার কারণে মুসলমান ছাত্রদের পক্ষে ভালো ফল করা খুবই কঠিন ছিলো। কারণ শিক্ষকদের প্রায় সকলেই ছিলেন হিন্দু সম্প্রদায়ের লোক। তাঁর লিখিত 'বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস' ইতিহাসের প্রতি মরহুমের দখলের অন্যতম দলিল। এই বইটির প্রকাশনা উৎসবে সুসাহিত্যিক ও সকলের শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত ব্যক্তি জাতীয় অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান বলেছিলেন, "আমার ধারণা ছিলো রাজনীতিবিদরা পড়াশুনা করেননা। কিন্তু খান সাহেবের বইখানা পড়ে মনে হয়েছে এমন কিছু রাজনীতিবিদ এখনো আছেন যাঁরা শুধু পড়াশুনাই করেননা, মনে হয় বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে আমরা যাঁরা পড়াশুনা ও বিদ্যাবুদ্ধির অহংকার করি তাদের চাইতে বেশীই করেন। বরং শুধু পড়াশুনা নয়, গবেষকদের মতই লেখাপড়া করেন"। সত্যিই আমি নিজে সাক্ষী যে অসুস্থতাপূর্ব পর্যন্ত দিনের অধিকাংশ সময়ই জনাব আব্বাস আলী খান পড়াশুনায় কাটাতেন।

ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন বড় ধরনের আবেদ এবং মুত্তাকী। ফরজ ওয়াজিব সুন্নাত ছাড়াও নফলের প্রতি তিনি ছিলেন বেশ আগ্রহী। বিশেষ করে তাহাজ্জুদ নামাযে দীর্ঘ সময় কাটাতেন। দুয়েকবার তাঁর সাথে শেষ রাতে নামযের সময় তাঁকে শিশুর মতো কাঁদতে দেখেছি। শুনেছি একা একা কুরআন পড়ার সময় তিনি অত্যন্ত আবেগভরে তেলাওয়াত করতেন। মাঝে মাঝেই তাঁর চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠতো। অসুখে যখন বেহুশ অবস্থায় প্রায়ই জিজ্ঞেস করতেন ক'টা বাজে? উত্তর শুনার পর নামাযের সময় হলে তিনি যে ইশারায় নামায আদায় করছেন তা বুঝা যেতো। নাতি নাতনীদের প্রায়ই বলতেন, "ভালভাবে চলো। আল্লাহকে ভয় করো। আন্দোলনের কাজ করো। তাহলে জান্নাতে একসঙ্গে থাকতে পারবো। খালি আমার খেদমত করে লাভ হবেনা।" চরম অসুস্থ অবস্থায় তাঁর স্নেহের এক নাতনীর উদ্দেশ্যে থর থর করে কম্পমান হাতে লিখলেন, "তুই তো একটা পাগল, অথচ আমার সময় ফুরিয়ে গেছে, ইনশাআল্লাহ জান্নাতে দেখা হবে।"

আব্বাস আলী খান র.-এর চিন্তাভাবনা ও কর্মজীবনের আলেখ্য

অধ্যাপক মুজিবুর রহমান

সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ

জনাব আব্বাস আলী খান ইন্তেকাল করেছেন গত ৩ অক্টোবর ১৯৯৯। সহস্রাব্দ শেষ হবার ৮৯ দিন আগেই। দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জীবন থেকে আখেরাতের স্থায়ী জীবনে যেতে হলে মৃত্যুর পর্দা ডিঙিয়ে যেতে হয়।

তাঁর জীবনের শেষ সমাবেশ ছিলো সিরাজগঞ্জ জেলার উল্লাপাড়া থানায়। কর্মীসমাবেশ। তারিখটা ছিলো ১৫ই জুন' মঙ্গলবার। সেদিন বিকেল ৪টায় মরহুম খান সাহেবকে জয়পুরহাটের পথে বিদায় দিয়েছিলাম। এরপর রোডমার্চ হলো বগুড়া থেকে রাজশাহী হয়ে নবাবগঞ্জ পর্যন্ত। ৩ আগস্ট ইউরোপে সাংগঠনিক সফরে চলে যাই। অনেক দিন তাঁর কোনো খোঁজ খবর নিতে পারিনি। ৭ সেপ্টেম্বর দেশে ফিরেই খান সাহেবকে দেখতে গেলাম বাসায়। দেখলাম শরীর অনেকখানি শুকিয়ে গেছে। গলার আওয়াজ অনেক দুর্বল। তাঁর জনসভার কণ্ঠস্বর ছিলো অত্যন্ত মজবুত ও জোরালো। আজকে সেই কণ্ঠ হয়ে গেছে ক্ষীণ। আমার সাথে শেষ বাক্য যা সেদিন উচ্চারিত হয়েছিল তা ছিলো এ রকম। আমি বললাম খান সাহেব জামায়াতে ইসলামীর ইতিহাস লেখার কাজটাতো শেষ হয়নি? তিনি শুধু বললেন, নাসিম সাহেবকে বলেছি তিনি লিখবেন।

তার জীবনের শেষ কয়টি দিন সম্পর্কে জানার চেষ্টা করেছি।

১৭ই জুন জয়পুরহাটে তার পিঠে প্রচণ্ড ব্যথা শুরু হয়। স্থানীয় ডাক্তার রক্ত পরীক্ষা করার জন্য বললেন, ব্যথ্যার জন্য কিছু মলম দিলেন এবং 'বিশ্রাম' নিতে বললেন। ১৮ই জুন বিশ্রাম নিলেন। ১৯শে জুন ঢাকায় আসলেন এবং তাঁর জীবনের সর্বশেষ কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ বৈঠকে অংশ গ্রহণ করলেন। এটাই তাঁর অফিসে শেষ আগমণ ও প্রস্থান। এরপর আর কেন্দ্রীয় অফিসে আসতে পারেননি।

২১শে জুন মুহতারাম আমীরে জামায়াতের কাছে একটা স্লিপ লিখলেন। খুব সম্ভব আমীরে জামায়াতের কাছে এটাই ছিলো তার সর্বশেষ লিখা।তিনি লিখেছিলেন— "মুহতারাম আমীরে জামায়াত, আসসালামু আলাইকুম। আমি খুবই অসুস্থ, পিঠে প্রচণ্ড ব্যথা। আমার জন্য দোয়া করবেন। আমি হাসপাতালে ভর্তি হবো কি?" মুহতারাম আমীরে জামায়াত কেন্দ্রীয় শূরায় খান সাহেবের সুস্থতার জন্যে পরম করুনাময় আল্লাহতায়ালার দরবারে দোয়া করেন। হাসপাতালে তাড়াতাড়ি ভর্তি হবার জন্য বলে দিলেন।

মরহুম খান সাহেব নেতার প্রতি আনুগত্যের উজ্জল দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন। কেন্দ্রীয়

শূরায় আসতে না পারার জন্য ভীষণ অসুস্থতার মাঝেও কাগজে লিখে পাঠালেন। হাসপাহতালে ভর্তি হবার জন্য পরামর্শ চাইলেন। সারাজীবন যিনি পরামর্শের ভিত্তিতে আন্দোলন সংগঠন করে গেছেন, জীবনের শেষ প্রান্তে এসেও তা আমল করেন।

সেদিনই অর্থাৎ ২১শে জুন বিকেল ৫-১৫ টায় ইবনে সিনা মেডিক্যাল সেন্টারে ভর্তি হলেন, ৩১০ নম্বর কেবিনে।

মুহতারাম খান সাহেবের শরীরে স্যালাইন ও অক্সিজেন চলছিল। লিকুইড খাবারও কিছু করে দেয়া হয়। ৩রা অক্টোবর বেলা ১২-৪৫ মিনিটে সর্বশেষ লিকুইড দুধ জাতীয় খাবার দেয়া হয়। এরপর আর কিছু খাননি। ২৫শে সেপ্টেম্বর ফজর পর্যন্ত তায়াম্মুম করে করে পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করতে পেরেছেন।

২৫শে সেপ্টেম্বর যোহর হতে তিনি চেতনা হারাতে থাকেন। চেতনা থাকা অবসস্থায় আযান শুনলেই বলতেন 'তায়াম্মুম করিয়ে দাও নামায পড়ব'। মাঝে মধ্যে রাত ২টার দিকে রহুল আমীনকে বলতেন 'ব্রাশ দাও, দাত মাজব, ওজু করবো।

মৃত্যুর দিনটি ছিল ৩রা অক্টোবর হরতালের দিন। স্বৈরাচারী আওয়ামী দুঃশাসনের বিরুদ্ধে আহূত হরতালের মধ্যেই তিনি ইন্তেকাল করেন ক্লিনিকে। বিকেল ৪টার দিকে কেন্দ্রীয় অফিসে তার লাশ আনা হয়।

মাওলানা আব্দুল মোনেম, মোস্তফা হুসাইন সরকার ও রুহুল আমীন মরহুম খান সাহেবকে শেষ গোসল করান।

আমীরে জামায়াত অধ্যাপক গোলাম আযম তাঁর নামাজে জানাযায় ইমামতি করেন এবং সেক্রেটারী জেনারেল মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী তাকে কবরে নামান। মরহুমের এটা ছিলো   কামনা এই শেষ স্বপ্নও আল্লাহ পূরণ করে দিয়েছেন।

জয়পুরহাটে পারিবারিক গোরস্থানে ইসলামী পাঠাগারের পাশেই তাকে দাফন করা হয়। এখানে তার স্ত্রী ও জামাই-এর কবর। তাঁর কবর ইসলামী পাঠাগারের প্রাচীর ঘেঁষে। মনে হয় সারাজীবন যিনি কুরআনের বাণী উচ্চারণ করেগেছেন, শুনেছেন ও শুনিয়েছেন মরার পরেও কুরআনের বাণী যাতে শুনতে পান সে ভাবেই শুয়ে আছেন তার কবরের শেষ শয্যায়। এখন শুধু তার শেষ ইচ্ছা 'ইসলামী পাঠাগারটি' চালু হতেই বাকী। যেদিন পাঠাগার চালু হবে সেদিনই তার স্বপ্ন বাস্তবায়িত হবে।

হাসপাতালে ভর্তি হয়েও জয়পুরহাটের আন্দোলনের কর্মী ও দায়িত্বশীলইদের স্মরণ করতেন, খোজ-খবর নিতেন। ইচ্ছ ব্যক্ত করতেন সুস্থ হলেই জয়পুরহাট যাবেন। বলতেন অনেক কাজ পড়ে আছে। কাজগুলো যেয়ে করতে হবে।

মরহুম খান সাহেবের শেষ স্বপ্ন ছিলো কিছু সাদকায়ে জারীয়া রেখে যাওয়া। সেই নিয়তেই গড়ে তুলেছেন জয়পুরহাট আদর্শ স্কুল এন্ড কলেজ। হাজার হাজার ছাত্র তাঁকে নানা বলে ডাকতো। তাদের নানা স্কুল ও কলেজে আসলে স্কুলের আদরের নাতিরা তাঁকে ঘিরে ধরতো। আবাসিক হোস্টেলের রুমে রুমে গিয়ে তিনি নাতিদের খোঁজ নিতেন ঃ কেমন পড়াশুনা করছে-নামায-কালাম ঠিকমত পড়ছে কিনা।

শেষ দিকে এসে তিনি আফসোস করতেন একটা কামিল মাদ্রাসা করতে পারলে বেশী ভাল রেজাল্ট পাওয়া যেতো। আখেরাতের চেতনায় এসব কথা বেশী বেশী বলতেন। তাঁর সর্বশেষ চিন্তা ছিলো তার কবরের পাশে ইসলামী পাঠাগার গড়ে তোলা। ব্যাংকের একাউন্টে যা ছিলো এবং তাঁর ব্যক্তিগত যা সম্পদ ছিলো তা দিয়ে তিনতলা ইসলামী পাঠাগারের বিল্ডিং তৈরি করেছেন। প্রথম তলার জানালা দরজা হয়েছে বাকীগুলো এখনও অসম্পূর্ণ। আলমারীসহ বিভিন্ন ফার্নিচার এখনও হয়নি। কুরআন-হাদিস, ইসলামী সাহিত্য কিছুই কেনা হয়নি। তাঁর এ অসম্পূর্ণ কাজ কে সম্পন্ন করবে? ৮৫ বছর বয়স্ক ইসলামী আন্দোলনের নেতার এ অন্তিম মহান ইচ্ছা পূরণ করার জন্য কেউ কি এগিয়ে আসবেননা? কোন সহৃদয় সক্ষম ব্যক্তির মনের কোণায় এ সাদকায়ে জারীয়ার স্কীম বাস্তবায়নের আগ্রহ সৃষ্টি হবেনা।

মরহুম খান সাহেব অত্যন্ত চিন্তাশীল ব্যক্তি ছিলেন। প্রায় সময় তাকে চিন্তা করতে দেখতাম। দেশ, জাতি সমাজ সম্পর্কে গভীর চিন্তা করতেন। বিশেষ করে ইসলামী আন্দোলন জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ সম্পর্কে খুব বেশী চিন্তা করতেন। আক্ষেপ করে বলতেন, সমাজে বিভিন্ন রকম শিরক ও বিদআতে ছেয়ে যাচ্ছে। কোনো কোনো পত্রিকাও কদরের রাতকে 'লাইলাতুন মুবারাকাতুন' না বলে বলছে শবে বরাতের রাতকে। এসব লোক সঠিক জিনিষ না জেনেই লিখে চলেছে। সঠিক ইসলামের প্রচারের চেয়ে শিরক বিদআতের প্রচারই বেশী হচ্ছে। মরহুম আব্বাস আলী খান ইসলামের এ সকল গুরুত্বপূর্ণ দিক নিয়ে খুব বেশী চিন্তা করতেন। আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর তিনি দেশ ও জাতির জন্য দারুণভাবে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। মাদ্রাসা শিক্ষা বন্ধের ষড়যন্ত্র যখন শুরু হলো তখন তিনি বলতেন আওয়ামী লীগ সরকারকে ক্ষমতায় থাকার আরো বেশী সুযোগ দিলে দেশের অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে যাবে। তাই এ সরকারকে হটানোর আন্দোলনকে আরো জোরদার করার ওপর গুরুত্ব দিয়ে গেছেন। মাঝে মধ্যে আমাদের লিয়াজোঁ কমিটির সাদস্যবৃন্দকেও তিনি তাঁর উদ্বেগের কথা বলতেন ও আন্দোলন জোরদার করার জন্য বলতেন।

মুহতারাম খান সাহেব নিজ হাতে আতিথিয়তা করতে ভালবাসতেন। কখনো কখনো তাঁর কক্ষে গেলে তিনি নিজ হাতে চা বানিয়ে খাওয়াতেন। তাঁর কক্ষে চা বানানোর প্রয়োজনীয় উপাদান থাকতো।

সফরে সঙ্গীদের ছাড়া তিনি কখনো খেতেননা। তাঁকে কখনো আলাদাভাবে খেতে দিলে তিনি ভীষণ অসন্তুষ্টি প্রকাশ করতেন। খাবার টেবিলে সফর সঙ্গীদের মধ্যে ড্রাইভারও অন্তর্ভুক্ত থাকতো। আজো জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় অফিসের গাড়ী ড্রাইভার নূরুল হুদা, রফিক ও সালাহ উদ্দীন খান সাহেবের কথা স্মরণ করে কেঁদে ফেলে, অশ্রু সংবরণ করতে পারেনা। এমন দরদী নেতাকে, তাদের প্রিয় নেতাকে তারা কখনো ভুলতে পারেনা। আমরাও পারছিনা তাঁকে ভুলতে।
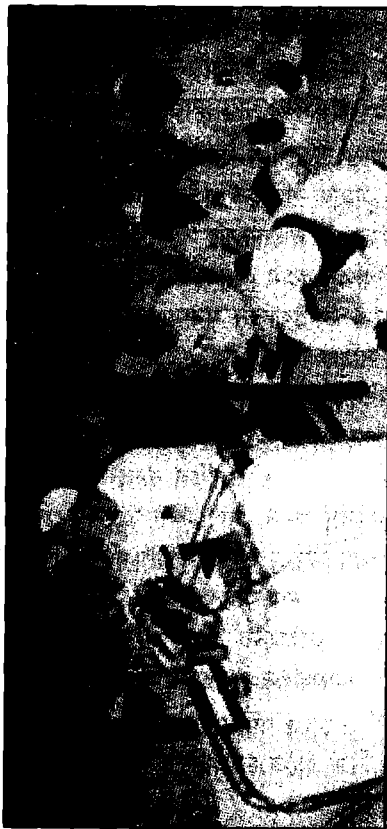
মরহুম খান সাহেবের হস্তলিপি ও বই থেকে

মরহুম আব্বাস আলী খান ছিলেন একজন বড় মাপের চিন্তাবিদ লেখক। তিনি লিখেছেন অনেকগুলো গ্রন্থ। অনুবাদও করেছেন অনেক। তাঁর লেখায় দিক নির্দেশনা দিয়েছেন তিনি জাতিকে, ইসলামী আন্দোলন ও সংগঠনকে এবং ইসলামের পথের সৈনিকদেরকে।

এখানে তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থ ও পুস্তিকা থেকে কিছু কিছু অংশ সংকলন করা হলো। এগুলো থেকে তাঁর লেখার সেরকম কিছু স্বাদ আর অনুভূতি লাভ করা সম্ভব, যেমন শীতকালে সূর্যরশ্মি কোনো ঘরের দরজা জানালা দিয়ে বিচ্ছুরিত হলে রোদের স্বাদ আর উষ্ণ অনুভূতি লাভ করা যায়।

সেই সাথে তাঁর হস্তলিপিরও কিছু কিছু অংশ এখানে তুলে ধরা হলো। তাছাড়া পরিবার পরিজনের উদ্দেশ্যে তাঁর একটি গুরুত্বপূর্ণ অসিয়তপত্র এখানে হুবহু ছেপে দেয়া হলো। - সম্পাদক

মরহুম খান সাহেব জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ-এর ইতিহাস লিখতে শুরু করেছিলেন। কিন্তু বেশি এগুতে পারেননি। এখানে সেই অসম্পূর্ণ ক্ষুদ্র পাণ্ডুলিপিটির প্রথম ক'পৃষ্ঠা পেশ করা হলো

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ-এর ইতিহাস

ইমাম হুসাইন রা.-এর শাহাদাত সম্পর্কে
খান সাহেবের লেখা একটি ইংরেজি নিবন্ধ

Martyrdom of Imam Husain

— Abbas Ali Khan.

Imam Husain bin Ali (may Allah be pleased with them) was barbarously and mercilessly slain along with his associates and members of his family by the soldiers of Yazid bin Muabia, in Karbala on the 10th of Muharram. This day, is therefore, observed throughout the Muslim world as a Day of Mourning as also a day of taking oaths to stand against all oppressions and suppressions, against all cruelties and tyrannism. Many other historical events took place on this day.

What was the fault of Imam Husain, the grandson of Prophet Muhammad (S) who loved him most? His only fault was that he denied oath of allegiance to Yazid who came to power illegally adopting methods repugnant to the fundamental principles of Islam.

All the Caliphs after the demise of Prophet Mohammad (S) were elected with ~~unanimous~~ unanimous support of the people. The four rightly guided caliphs (Khulafa-i-Rashedeen) ran the administration and did everything as caliph in consultation with a

body of wise and learned associates of the Prophet - called Majlis-e-Shoora (Council of advisors). Their every decision was taken fully in accordance with the tenets of Quran and Sunnah.

Baitul mal, the public money - was regarded as a sacred trust and every it was fully preserved and every penny was spent in right way without any reservation whatsoever. Lives and properties, or fundamental rights of people, irrespective of friend and foe, race and colour, high and low, were fully protected and justice done.

These and other fundamental principles of an Islamic State established by Prophet Mohammad (S) were abandoned or overlooked and Caliphate took the shape of full Kingship -

These, in principle, could not be accepted and tolerated by the Muslim. And Imam Husain (may Allah be pleased with him) stood against all these and refused to recognise Yazid as a true Caliph.

The Prophet Mohammad (S) said: The noblest Jehad (Struggle in the way of Allah) is to speak

the truth in front of a tyrant. ~~[illegible]~~. This Imam Husain fearlessly did and incurred the rage of Yazid.

Imam Husain with a handful of his associates and members of family left for Iraq and on the way he was surrounded by the soldiers of Yazid. He had no intention to fight and asked them either to let him return back to Madina or go to Yazid. But they turned deaf ear and started fighting and killing. Husain was ruthlessly beheaded and his head was trampled by horses. What a horrible scene!

The shahadat of Imam Husain, (may Allah be pleased with him) left an everlasting inspiration in the minds of the future generations to firmly stand against all falsehoods, tyranny and oppressions. After that in all ages, leaders of Muslim Ummah followed the footprints of Imam Husain.

Let us the Muslims, gird up ~~[illegible]~~ our loins and stand firmly against all such tyrants and build a society based on the fundamental principles of Islam, and establish safety and security, peace and tranquility, universal love and affection.

বিভিন্ন বই থেকে

বই বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস

ইতিহাস একটা জাতির মধ্যে জীবনী শক্তি সঞ্চার করে। কোনো জাতিকে ধ্বংস করতে হলে তার অতীত ইতিহাস ভুলিয়ে দিতে হবে অথবা বিকৃত করে পেশ করতে হবে। একজন তথাকথিত মুসলমান যদি ইসলাম সম্পর্কে সঠিক ধারণা লাভের সুযোগ না পায় এবং তার জাতির অতীত ইতিহাস সম্পর্কে অজ্ঞ থাকে, তাহলে তার মুখ থেকে এমন সব মুসলিম ও ইসলাম বিরোধী কথা বেরুবে যেসব কথা একজন অমুসলমান মুখ থেকে বের করতে অনেক সাতপাঁচ ভাববে। এ ধরনের হস্তীমূখ মুসলমানের সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়ছে এবং মুসলমানদের জাতশত্রুগণ তাদেরকে ফুলের মালা দিয়ে বরণ করছে।

মুসলিম জাতি সত্ত্বার অস্তিত্ব রক্ষা করতে হলে তাদের সঠিক অতীত ইতিহাসের সাথে ইসলামেরও সঠিক জ্ঞান ও ধারণা নতুন প্রজন্মের মধ্যে পরিবেশনের ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ একেবারে অপরিহার্য। বাংলার মুসলমানদের ইতিহাসে প্রসংগক্রমে ইসলামের মূলনীতি সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে। আধিপত্য ও সম্প্রসারণবাদী শক্তির পক্ষ থেকে সাংস্কৃতিক আগ্রাসন রুখতে হলে ইতিহাসের পর্যালোচনা ও ইসলামী সংস্কৃতির মর্মকথা সর্বস্তরে তুলে ধরতে হবে।

মুসলমানী জীবনটাই এক চিরন্তন সংগ্রামী জীবন। ইসলামে সংগ্রাম বিমুখতার কোনো স্থান নেই। তাই ইসলাম ও মুসলিম বিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামে অগ্রগামীর ভূমিকা পালন করতে হবে। নতুবা জাতিকে শত্রুর নির্যাতনের জাঁতাকলে নিষ্পেষিত হয়ে ধুঁকে ধুঁকে মরতে হবে।

অত্র ইতিহাসটিতে মুসলিম জাতির গৌরবময় অতীত ইতিহাসের দিকে নতুন প্রজন্মের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। মুসলিম জাতির ইতিহাস কালের কোনো এক বিশেষ সময় থেকে শুরু হয়ে কোনো এক বিশেষ সময়ে গিয়ে শেষ হয়নি। এ ইতিহাসের সূচনা দুনিয়ায় প্রথম মানুষ হযরত আদম আ.-এর আগমন থেকে। তখন থেকে আজ পর্যন্ত এ ইতিহাস অবিচ্ছিন্নভাবে চলে এসেছে সময়, কাল ও পরিবেশ পরিস্থিতির চড়াই-উৎরাই অতিক্রম করে এবং চলতে থাকবে যতোদিন দুনিয়া বিদ্যমান থাকবে। মুসলমানদেরকে অতীত ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেই সামনে অগ্রসর হতে হবে। (গ্রন্থের ভূমিকা থেকে)

বই বিদেশে পঞ্চাশ দিন

বস্তুগত দিক দিয়ে আমেরিকা অতি উন্নত, সমৃদ্ধশালী এবং দুনিয়ার উপর রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারকারী একটি দেশ। কিন্তু বিশ্ব মানবতার কল্যাণে, দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনে, মজলুম মানবতার হাহাকার দূরীকরণে, অন্যায় অবিচারের স্থলে সুবিচার

প্রতিষ্ঠায় তার ভূমিকা বলতে গেলে শূণ্যের কোঠায়। উপরন্তু তাকে অন্যায় অবিচারের প্রশ্রয়দাতা হিসাবেও অভিযুক্ত করা হয়। পক্ষপাতিত্ব, নিষ্ঠুরতা এবং দুর্বল ও অনুন্নত দেশগুলোর উপর আধিপত্য বিস্তারের অভিযোগ তার বিরুদ্ধে করা হয়ে থাকে।

হিরোসিমা নাগাসাকিতে আণবিক বোমা বর্ষণের চেয়ে অধিক নিষ্ঠুরতা আর কি হতে পারে? আমেরিকা তাও করেছে যার ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষ তাৎক্ষণিকভাবে প্রাণ হারিয়েছে, লক্ষ লক্ষ বিকলাংগ হয়েছে এবং কয়েক লক্ষ বহু দিন ধরে ধুঁকে ধুঁকে মরেছে।

তারপর ইসরাইলকে তুষ্ট করার জন্যে ফিলিস্তিন ও মধ্যপ্রাচ্যে আমেরিকা যে ভূমিকা পালন করছে- যার পরিণামে অগণিত ফিলিস্তিনীকে তাদের পৈত্রিক আবাস ভূমি থেকে বিতাড়িত করে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয়া হয়েছে এবং অধিকৃত ফিলিস্তিনে নারী-শিশু নির্বিশেষে ফিলিস্তিনী মুসলমানদের উপর যে অমানুষিক নিষ্পেষণ চালানো হচ্ছে তার দায়দায়িত্ব পুরোপুরি আমেরিকার।

ইহুদী অথবা ইসরাইলের সামান্যতম স্বার্থে কোনো আঁচ লাগে এমন কিছু করতে আমেরিকা রাজী নয়।

খৃস্ট জগতের একথা অজানা নেই যে, ইহুদীদের ধর্মীয় বিশ্বাস অনুযায়ী সকল অইহুদী পশু, বর্বর ও নিধনযোগ্য। আধুনিক যুদ্ধে নিষ্ঠুরতম আচরণের পরিকল্পনা ইহুদী মস্তিষ্ক প্রসূত।

আমেরিকা ইহুদীদের অর্থনৈতিক গোলামির শৃংখল হয়তো একদিন ছিন্ন করতে পারবে, যখন ইহুদীদের মুখোশ খুলে যাবে তখন হয়তো তাদেরকে আমেরিকা থেকে বিতাড়িত হতে হবে, যেমন তারা হয়েছিল জার্মানী থেকে।

আমেরিকা একটি ধনাঢ্য ও উন্নত দেশ হওয়া সত্ত্বেও বেকারত্ব সেখানে প্রকট এবং গৃহহীনদের সংখ্যা বেড়ে চলেছে। তবে আমেরিকাবাসীর সবচেয়ে বড়ো সংকট তাদের নৈতিক অবক্ষয়। এ ব্যাধির প্রতিকার রয়েছে একমাত্র ইসলামে। নতুবা নূহের জাতির ভয়াবহ পরিণামই ভোগ করতে হবে। জাতিকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করে তাকে নবজীবন দানের জন্যে ইসলামের আশ্রয় গ্রহণ করতে আপত্তি থাকা উচিত নয়। (বইয়ের ভূমিকা থেকে। লেখা ১৯৮৯ ইং)

বই স্মৃতি সাগরের ঢেউ

সঠিক পথের সন্ধান

আমি একজন শিক্ষক এবং ছাত্রও। স্থানীয় একটি হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক। সেই সাথে এল্‌মে তাসাউফের দুর্দান্ত ছাত্র। পীর সায়েব বলেন, উচ্চ শ্রেণীর ছাত্র। তাই সবকের উপর সবক এবং বহু সলুক অতিক্রম করে তাঁর দৃষ্টিতে উন্নতির উচ্চ শিখরে আরোহণ। কিন্তু মনকে জিজ্ঞেস করে তার জবাব পেতুম 'না।' সত্যানুসন্ধিৎসা ও সত্যকে জানার পিপাসা কমেনি। মনের মধ্যে নানান জিজ্ঞাসা। ইপ্সিত বস্তু যেনো নাগালের বাইরে।

উনিশ শ' চুয়ান্নর ডিসেম্বর মাস। বার্ষিক পরীক্ষার ঝামেলা শেষ হয়েছে। বড়ো দিনের বন্ধ সন্নিকট।

স্থানীয় একটি মাদ্রাসায় ধর্ম সভা-ইসলামী জলসা। প্রধান বক্তা ডক্টর মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ। বিশেষ বক্তা অধ্যাপক গোলাম আযম। রংপুর কারমাইকেল কলেজের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক। ডঃ শহীদুল্লাহ অসুস্থ। টেলিগ্রাম এসেছে আসতে পারবেননা। আসছেন শুধু গোলাম আযম। মাদ্রাসার সেক্রেটারী বার বার অনুরোধ জানিয়ে গেলেন উক্ত সভায় যোগদান করতে। বল্লেন, স্যার অবশ্যই যাবেন কিন্তু। সেক্রেটারী আমার এককালীন ছাত্র। অনুরোধ উপেক্ষাই বা করি কি করে?

অগত্যা বিকেলে রওয়ানা হলুম দু'চাকার সাইকেলে চড়ে। বাড়ী থেকে মাইল চারেক দূরে সভাস্থল।

বেলা ডুবতে তখনো কিছুটা বাকী। সভার বক্তা কোনো পীর বা মাওলানা নন। তাঁরা সাধারণতঃ মঞ্চে উঠেন রাতের বেলায়। তাই সন্ধ্যের আগে সভায় লোক তেমন জমে না। কিন্তু বক্তা এবার দুই জাঁদরেল শিক্ষাবিদ। তাই শ্রোতারা এসেছেন আগে ভাগেই।

দেখলুম, অধ্যাপক গোলাম আযম বক্তৃতা করছেন। রাষ্ট্র বিজ্ঞানের অধ্যাপক হলেও দাড়ি আছে। মাথায় বাবরী চুল আছে। চেহারা গৌর বর্ণের। আকর্ষণীয়। কালেমা তাইয়েবার ব্যাখ্যা করছেন বড়ো সুন্দর মনোমুগ্ধকর ভাষায়। শ্রোতারা তন্ময় হয়ে শুনছেন।

আমারও বড্ডো ভালো লাগলো। খোশ্ ইল্হানে কালামে পাকের আয়াত আবৃত্তি করছেন ঘনো ঘনো। মনে হলো কেরাত শিল্পও রপ্ত করেছেন।

সন্ধ্যের পরেও প্রায় ঘণ্টা খানেক বল্লেন। শ্রোতারা আরও শুনতে চান। ডঃ শহীদুল্লাহর অভাবটাও মিটাতে চান। কিন্তু তিনি রাতের ট্রেনেই রংপুর ফিরে যাবেন বলে শেষ করলেন।

এক সাথে খেতে বসেছি। খেতে খেতে পরস্পরের পরিচয় এবং আলাপচারিও হলো। তিনি কলেজের শিক্ষক। আমি স্কুলের। মিল ত কিছুটা আছেই। বরঞ্চ একই পেশার লোক। তাই মনের মিল সহজেই হওয়ার কথা।

বিদায়ের আগে কিছু বই-পুস্তক কিনলুম তাঁর কাছ থেকে। জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তান ও মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীর লেখা সে বইগুলো।

বল্লুম, বগুড়া জেলায় জামায়াতে ইসলামীর কোনো কাজ আছে কি?

বল্লেন, আলবৎ আছে। বগুড়া শহরে শায়খ আমীনুদ্দীন বলে একজন দায়িত্বে রয়েছেন।

মাওলানা মওদূদীর একখানা বই পড়েছিলুম কিছুকাল আগে। উর্দু বই খুৎবাত। ঈমান, ইসলাম, নামায, রোযা, যাকাত, হজ্ব, জিহাদ প্রভৃতির মর্মকথা। চমৎকার হৃদয়গ্রাহী ভাষায় লেখা।

কিন্তু তাঁর প্রতিষ্ঠিত কোনো জামায়াত আছে, আন্দোলন আছে, জান নেসার (উৎসর্গীকৃত) কর্মী বাহিনী আছে তা আমার জানা ছিলোনা। এ নামেরই এক ব্যক্তিকে গত বছর মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়েছিলো। সংবাদপত্রে দেখেছিলুম।

তাই আগ্রহ বেড়ে গেলো তাঁর জামায়াত ও আন্দোলন জানার। তাঁর মৃত্যুদণ্ড ইব্রাহীম খলীলুল্লাহ আ. ও নমরুদ এবং মুসা কালীমুল্লাহ আ. ও ফেরাউনের অতীত কাহিনী স্মরণ করিয়ে দেয়।

খাওয়া-দাওয়া সেরে বিদায় হলেন অধ্যাপক গোলাম আযম। মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ তাঁর বিদায়ের আগে একটা মোটা অংক তাঁর হাতেও গুঁজে দিলেন। যেমন ধারা দেয়া হয়ে থাকে বক্তা ও ওয়ায়েযীনকে। কেউ দাতার প্রতি পুরো একীন রেখে চোখ বুঁজেই তা পকেটে রাখেন। কেউ আবার দাবী করে কড়ায় গণ্ডায় আদায় করে নেন। ওয়াযের পারিশ্রমিক-ন্যায্য পাওনা।

কিন্তু গোলাম আযম পীর মাওলানা নন। মৌসুমী বক্তা নন, অধ্যাপক। টাকা গুণে দেখে বল্লেন, “না, না এতো কেন? আমার যা খরচ হয়েছে তাই দিন। এই ধরুন রংপুর-জয়পুরহাট আপ-ডাউন যাতায়াত এতো টাকা এতো আনা এতো পয়সা। তাই দিন। তার এক পাইও বেশী নেবোনা। নেবোই বা কি করে?”

অংক কষে তাই নিলেন। মৌলভী মাওলানা, পীর ও বক্তাদের বাঁধা-ধরা নিয়মের খেলাপ কাজ করে গেলেন।

কে কি মনে করলেন জানি না। কিন্তু আমার বড্ডো ভালো লাগলো। মনে মনে প্রশংসা করলুম অধ্যাপকের। পেশাজীবী বক্তা ও মুবাল্লিগ অধ্যাপকের তফাৎটা উপলব্ধি করলুম।

দীনের মুবাল্লিগের ত তাই করা উচিত।...

ছাপ্পান্ন সালের মাঝামাঝি জামায়াতের রুকন হলুম। অধ্যাপক গোলাম আযম চাকুরী ছেড়ে জামায়াতে ইসলামী রাজশাহী বিভাগের আমীর হয়েছেন। নওগাঁ তাঁর শ্বশুর বাড়ী। সেখানে এসে আমাকে ডেকে নিয়ে আমার রুকনীয়াতের শপথ করালেন। আল্লাহ তায়ালার বন্দেগী জীবনের সকল ক্ষেত্রে সকল সময়ের জন্যে পুরোপুরি কায়েম করা ও কায়েম রাখার নামই ত ইসলাম। আর তা বড়ো কঠিন কাজ। তার জন্যে সংগ্রাম করতে হবে নফ্সের সাথে, পরিবার, আত্মীয়স্বজন ও সমাজের সাথে এবং প্রতিষ্ঠিত বাতিল সরকারের সাথে। তাই ত কুরআন হাদীসের কথা। যারা এ কাজ করে তারাই প্রকৃত অর্থে মুমেন এবং মুমেনদের জানমাল আল্লাহ খরিদ করে নেন। আল্লাহর খরিদ করা জানমাল আল্লাহর পথে ব্যয় না করলে তা হবে চরম মুনাফেকি এবং নিমকহারামি। আল্লাহর খরিদ করা জানমাল তাঁর পথেই ব্যয় করার শপথ করে জামায়াতের রুকন হলুম। এবার সত্যিই সঠিক পথের সন্ধান পেলুম যে পথের সন্ধান ইল্‌মে তাসাওউফ আমাকে দিতে পারেনি। ভাগ্য ভালো নইলে আরও কিছুকাল ইল্‌মে তাসাওউফের ময়দানে থাকলে বাতিলের সাথে সংগ্রাম করার হিম্মৎ হারিয়ে জিহাদের ময়দান থেকে পালিয়ে হুজরায় বসে অর্থহীন তপজপে জীবন কাটিয়ে দিতুম। জীবনের যে লক্ষ্য উদ্দেশ্য ও তত্ত্বকথা ইলমে তাসাওউফের ময়দানে জানতে পারিনি- এ জিহাদের ময়দানে এসে জানতে পারলুম। যে তরীকত, হকীকত ও মারেফাতের সন্ধানে এতো দিন ছিলাম তার সব কিছুর সন্ধান পেলুম এ জিহাদের ময়দানে। (পৃষ্ঠা ঃ ১২৫-১৩৩)

বই মাওলানা মওদূদী ঃ একটি জীবন একটি ইতিহাস একটি আন্দোলন

মাওলানার পূর্বপুরুষের আবাসভূমি ছিলো দিল্লী। তিনি জন্মগ্রহণ করেন ও লালিত-পালিত হন দাক্ষিণাত্যের হায়দারাবাদে। ইসলামের মহান আদর্শ বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে জন্মভূমি চিরকালের জন্যে পরিত্যাগ করে কর্মস্থল হিসেবে বেছে নেন পূব পাঞ্জাবের পাঠানকোটকে। ভারত বিভাগের পর হিজরত করেন লাহোরে । কোনো আঞ্চলিক ভূমিখণ্ডের মায়া তাঁকে আদর্শ পথ থেকে বিচ্যুত করতে পারেনি। জীবনের শেষ তেত্রিশ বছর লাহোরে কাটিয়ে তিনি লাহোরী বা পাঞ্জাবী হয়ে যাননি। তিনি ছিলেন সারা জাহানের। তিনি ছিলেন বিশ্বমানবতার।

তিনি হর-হামেশা সত্যের প্রচার করেছেন। মিথ্যা, অবিচার, দুর্নীতি ও যুলুম নিষ্পেষণের বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলেছেন। তাঁর সত্য ভাষণ কখনো অপ্রিয় করেছে তাঁর আপনজনকে, অপ্রিয় করেছে তাঁর বন্ধুবান্ধবকে, অপ্রিয় করেছে অনেক বুযুর্গানে কওমকে।

তাঁর মাতৃভাষা ছিলো উর্দূ, যার আজীবন তিনি সেবা করেছেন। সে ভাষাকে নতুন রূপ দিয়েছেন, নতুন অলংকারে ভূষিত করেছন। কিন্তু তিনি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন সকল ভাষার প্রতি এবং মাতৃভাষার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। উর্দূ তাঁর মাতৃভাষা হওয়া সত্ত্বেও তিনি বাংলাভাষাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হওয়ার সপক্ষে বলিষ্ঠ মত ব্যক্ত করেছেন।

অখণ্ড পাকিস্তান আমলে পূর্ব-পাকিস্তানের উপরে পশ্চিম-পাকিস্তানী শাসকদের যে অবিচার ও পক্ষপাতমূলক আচরণ ছিল, তার তিনি তীব্র সমালোচনা করে সমাধান পেশ করেছেন।

তিনি পূর্ব-পাকিস্তানে বহিরাগত মুসলমানদের আচরণ সম্পর্কে, ভাষা সমস্যা, চাকরি সমস্যা ও দেশরক্ষা সমস্যা সম্পর্কে ন্যায়নীতি ভিত্তিক সুস্পষ্ট মন্তব্য করেছেন। তিনি পূর্ব-পাকিস্তানকে তাঁর দেহের একটি অংশের সাথে তুলনা করেছেন। তিনি বলেছেন, "পাকিস্তান আমার দেহ ও প্রাণের তুল্য। আমার দুই হাতের মধ্যে যেমন আমি পার্থক্য করতে পারিনা, তদ্রূপ পাকিস্তানের উভয় অংশের মধ্যে পার্থক্য করতে পারিনা। আমার দুই হাতের মধ্যে যেটিই অসুস্থ হোক, তা পুরো শরীরের একটা রোগ। এর কারণ অনুসন্ধান করা ও সঠিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করা আমার কর্তব্য। আর তা না করার অর্থ হচ্ছে নিজের সাথে শত্রুতা করা।"

তিনি মধ্যপ্রাচ্য ভ্রমণকালে সেখানকার জনসাধারণ ও সুধীবৃন্দের সামনে আরব জাতীয়তাবাদের নির্ভীক সমালোচনা করেন। অপরদিকে বিদেশে অবস্থানরত পাকিস্তান দূতাবাসের কর্মচারীদের কর্মতৎপরতারও সমালোচনা করেন।

তাঁর চরিত্রের আর একটি মধুর বৈশিষ্ট্য ছিলো এই যে, তিনি নিজেকে কখনো ভুলের

ঊর্ধে মনে করতেন না। তাই তিনি সর্বদাই জামায়াতের কর্মী সম্মেলনে, কাউন্সিল অধিবেশনে (মজলিসে শূরা) নিজেকে সমালোচনার জন্যে পেশ করতেন। যাঁরা তাঁর জন্যে সদা প্রাণ দিতে প্রস্তুত থাকতেন, তাঁদেরকে তিনি পূর্ণ সুযোগ দিতেন, যদি তাঁর কোনো ভুলত্রুটি তাঁদের চোখে ধরা পড়ে থাকে, তা দ্বিধাহীন চিত্তে যেনো বলে ফেলতে পারেন। এভাবে তিনি বহুদিনের বদ্ধমূল কুসংস্কারকে (খাতায়ে বুযুর্গান গেরেফতান খাতাস্ত-বুযুর্গদের ভুল ধরাও ভুল) ভেঙে চুরমার করেছেন।

তিনি দিবারাত্র দীনের খেদমতে এমনভাবে নিমগ্ন থাকতেন যে, ঘর সংসারের, সন্তানাদির এবং আপন স্বাস্থ্যের দিকে নজর দেবার কোনো ফুরসতই ছিলোনা তাঁর। মিল্লাত ও বিশ্বমানবতার খেদমতের জন্যে তিনি নিজেকে করে রেখেছিলেন উৎসর্গীকৃত।

অতএব এ কথা দ্বিধাহীন চিত্তে বলা যেতে পারে যে, সাইয়েদ ও মুরশিদ মওদূদীর ব্যক্তিত কোনো একটি দেশের মধ্যে সীমিত ছিল না। তিনি ছিলেন না হিন্দুস্তানী বা পাকিস্তানী, ছিলেন না আরবী অথবা আজমী। বরঞ্চ তিনি ছিলেন মুসলিম বিশ্বের, বিশ্বমানবতার।

তাই বলছিলাম, মুসলিম মিল্লাতের শ্রদ্ধেয় মনীষী সাইয়েদ মওদূদীর ব্যক্তিত্বের উপর কলম ধরতে বার বার যেনো নিজের অযোগ্যতাই অনুভব করেছি। তথাপি চারদিকের ক্রমবর্ধমান দাবি ও অনুরোধের চাপে বর্ধিত সংস্করণ প্রকাশের চেষ্টা করেছি। তবে এর জন্যে যে সময় ও শান্ত পরিবেশের প্রয়োজন ছিলো তা না থাকায় এ বিষয়ে কলম ধরার হক যে আদায় করতে পারিনি তা বিনা দ্বিধায় বলতে পারি। মাওলানার চিন্তাধারার বিভিন্ন দিকের উপরে বিরাট গ্রন্থ রচিত হতে পারে এবং আলবৎ তার প্রয়োজনও রয়েছে। আমার বিশ্বাস যুগের দাবীর প্রেক্ষিতে সুধীমহল এ কাজেও অবশ্যি হাত দেবেন এবং দিয়েছেনও অনেকেই।

বাংলাভাষী পাঠক সমাজের কাছে আবেদন, নিরপেক্ষ ও স্বচ্ছ দৃষ্টিভংগীসহ মাওলানার সত্যিকার পরিচয় জানবার চেষ্টা করুন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস তাঁর সাহিত্য এতো বেগবান, সাবলীল ও হৃদয়গ্রাহী যে, মনোযোগী পাঠকের হৃদয়-মন আলোড়িত না হয়ে পারেনা। পাঠকের কাছে আরও অনুরোধ, মাওলানার অন্যান্য সাহিত্য একবার খোলা মন নিয়ে পাঠ করে দেখুন। তাঁর সাহিত্য পাঠের মাধ্যমেই তাঁর সত্যিকার পরিচয় হৃদয়-মনের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে। (গ্রন্থের ভূমিকা থেকে)

বই একটি আদর্শবাদী দলের পতনের কারণ ঃ তার থেকে বাঁচার উপায়

আদর্শবাদী দল

প্রতিষ্ঠিত সমাজ ব্যবস্থা সমূলে উৎপাটিত করে তার স্থলে সম্পূর্ণ ভিন্ন করে এক সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে হলে একটি আদর্শ বেছে নিতে হয়। এর সাথে পৃথক চিন্তাধারাও থাকে। এ চিন্তা ও আদর্শের সাথে যারা সকল দিক দিয়ে একমত পোষণ করে তারা একটি দল গঠন করে। একে বলা হয় একটি আদর্শবাদী দল। এ দল ইসলামী হতে পারে, ইসলাম বিরোধীও হতে পারে।

সমাজ বিপ্লবের জন্য সংগ্রামের পূর্বে সে আদর্শের ছাঁচে ব্যক্তি গঠন অবশ্যই করতে হয়। এ আদর্শ বাস্তবায়নকে তারা তাদের জীবনের লক্ষ্য ও মিশন হিসেবে গ্রহণ করে এবং তার জন্য তারা অকাতরে জীবন দিতেও প্রস্তুত হয়। প্রতিপক্ষের শত নির্যাতন নিষ্পেষণ তাদেরকে কিছুতেই দমিত করতে পারেনা। দলের নেতা ও কর্মীদের হতে হয় নির্ভীক, সাহসী ও ধৈর্যশীল। বিশেষ করে নেতাকে হতে হয় গতিশীল, দূরদর্শী, সমসাময়িক সকল সমস্যা সম্পর্কে পূর্ণ সচেতন এবং চরম সংকট মুহূর্তে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী। দলের নেতৃত্ব ও নিয়ম শৃংখলার আনুগত্য হবে সকলের জন্য অনিবার্য।

যে কোনো আদর্শবাদী দলের মধ্যে উপরোক্ত গুণাবলী অবশ্যই থাকতে হবে। একটি ইসলামী দলের মধ্যে উপরোক্ত গুণাবলী ছাড়াও অতিরিক্ত আরও অনেক গুণাবলীর প্রয়োজন যা আল্লাহ্ তাদের মধ্যে দেখতে চান।

এ দলের চরম ও পরম লক্ষ্য হলো আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন। আর তা করতে হলে ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য নিরলস সংগ্রাম করে যেতে হবে। তাই এ দলের একটি ব্যক্তির প্রতিটি কথা ও কাজ এমন হতে হবে যার দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা যায়। অর্থাৎ আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের অভিলাষই হবে তাদের সকল কর্মতৎপরতার দিগ্‌দর্শী। এ দলের আরও কিছু বৈশিষ্ট্য পরে বর্ণনা করা হবে।

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ একটি আদর্শবাদী দল। এ দলের সূচনা হয়েছিল অবিভক্ত ভারতে ১৯৪১ সালে। (পৃষ্ঠা ঃ ৩)

বই মৃত্যু যবনিকার ওপারে

অতঃপর মৃত্যু যবনিকার ওপারে বা আখিরাতের আলোচনা সম্বলিত গ্রন্থখানি শেষ করার আগে একটা কথা বলে রাখি।

ঈমান হচ্ছে বীজ স্বরূপ এবং আমল তার বৃক্ষ ও ফল। আখিরাতের বিশ্বাস যতো বেশী দৃঢ় হবে, আমলের বৃক্ষ ততবেশী সুদৃঢ় এবং শাখা-প্রশাখাও ফুলে ফলে সুশোভিত হবে।

আর একদিক দিয়ে দেখতে গেলে ঈমান হচ্ছে আল্লাহর সাথে বান্দাহর একটা চুক্তি। সে চুক্তির সারমর্ম এই যে, যেহেতু আল্লাহ মানুষের স্রষ্টা, প্রভু এবং বাদশাহ এবং মানুষ তার জন্মগত গোলাম ও প্রজা, অতএব গোলাম ও প্রজা তার জীবনের সব ক্ষেত্রে একমাত্র তার প্রভু ও বাদশাহর আদেশ-নিষেধ ও আইন-কানুন মেনে চলবে। স্রষ্টা, প্রভু ও বাদশাহর আইন মানার পরিবর্তে অন্য কারো আইন মেনে চলা, যে তার স্রষ্টাও নয়, নয় প্রভু এবং বাদশাহও নয়, হবে বিশ্বাসঘাতকতা করা, নিমকহারামি এবং চরম নির্বুদ্ধিতা এবং তা হবে চুক্তি লংঘনের কাজ।

আবার খোদার আইন পালনে অথবা জীবনের সব ক্ষেত্রে তাঁর দাসত্ব আনুগত্য পালনে যে শক্তি বাধাদান করে তা হলো তাগুতি শক্তি এবং কৃত্রিম খোদায়ীর দাবীদার শক্তি। খোদার সাথে বান্দাহর সম্পাদিত চুক্তি কার্যকর করতে হলে এ

তাগুতি শক্তিকে উৎখাত করাও চুক্তির অনিবার্য দাবি। তাই জীবনের সকল ক্ষেত্রে অর্থাৎ যেসব ক্ষেত্রে ও বিষয়ের সাথে মানুষের জীবন-জীবিকা, সুখ-দুঃখ, জান-মাল ও ইজ্জত আবরুর প্রশ্ন ওতপ্রোত জড়িত- এক কথায় ব্যক্তি ও পারিবারিক জীবন, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবন, শিক্ষা ও সংস্কৃতির অংগন, যুদ্ধসন্ধি, শত্রুতা, বন্ধুতা ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক-সম্বন্ধ প্রভৃতি ক্ষেত্রে আল্লাহর আইন-শাসন ও প্রভুত্ব-কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠাই ঈমানের দাবি। এ দাবি আদায়ের সংগ্রামকে বলা হয়েছে "আল-জিহাদু ফী সাবীলিল্লাহ"- আল্লাহর পথে জিহাদ। আর এর সফল পরিণতিই হলো 'ইকামাতে দীন'- দীন ইসলামের প্রতিষ্ঠা, যার জন্যে হয়েছিল সকল নবীর আগমন। আখিরাতের সাফল্যের জন্যে এ কাজ অপরিহার্য। শেষ নবীর জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত এ কাজের জন্যেই ব্যয়িত হয়েছে এবং তাঁর এ কাজের পূর্ণ অনুসরণই প্রকৃত মুমিনের একমাত্র কাজ। এরই আলোকে একজন মুমিনের সারা জীবনের কর্মসূচী নির্ধারিত হওয়া অপরিহার্য কর্তব্য।

সর্বশেষে রাহমানুর রাহীম আল্লাহ্ তা'য়ালার দরবারে আমাদের কাতর প্রার্থনা তিনি যেনো আমাদেরকে উপরোক্ত দায়িত্ব পালনের পূর্ণ তাওফীক দান করেন। সকল প্রকার গুনাহ্ থেকে পাক-পবিত্র রেখে তাঁর সিরাতুল মুস্তাকীমে চলার শক্তি দান করেন। অবশেষে যেনো তাঁর প্রিয় বান্দাহ্ হিসাবে তাঁর সাথে মিলিত হতে পারি। আমীন। (পৃষ্ঠা ঃ ১৪২-১৪৩)

বই ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের কাংখিত মান

১৯৯২ সালে অনুষ্ঠিত জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় রুকন [সদস্য] সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণ

আমি আমার জীবনে সর্বপ্রথম যখন মাওলানা মওদূদী র.-এর পেছনে নামায পড়ি, তখন শুনেছি তিনি সূরা ফাতিহাকে থেমে থেমে সাত বারে পড়েছেন। তাঁর মিষ্টি আওয়াজে ধীরে ধীরে এমনি নামায পড়াতে শুনে যে কি আত্মতৃপ্তি লাভ করেছিলাম - সুবহানাল্লাহ! আল্লাহ্ তাঁর মর্যাদা বাড়িয়ে দিন। তাঁর দরজা বুলন্দ করে দিন।

এটা ত তখনই হতে পারে যখন আপনার আমার নফ্স আল্লাহর ফরমাবরদার ও অনুগত হবে এবং নামাযে সাহায্য করবে। মনটাকে নামায থেকে টেনে টেনে কোথাও নেবেননা। এ জন্যে নফসের মুজাহাদা সর্বপ্রথম দরকার। যে গুণগুলো আল্লাহ তায়ালা চান, তা পয়দা করার জন্যে নফসের মুজাহাদা দরকার। তা না হলে আমাদের নামায ঠিক নামাযের মতো হবে না - আর নামায যদি নামাযের মতো না হলো ত এমন আর কি ইবাদত আছে যার মাধ্যমে আমরা নাজাত পেতে পারি? কেউ বলতে পারেন - আমরা ইসলামী আন্দোলন করছি। আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম করছি। তার জন্যে জীবন দিতে প্রস্তুত আছি। নামায সেরকম নাই-বা হলো, এতেই ত আল্লাহ আমাদেরকে মাফ করে দেবেন। কিন্তু

একথা ত হাদীসেও আছে যে- আখেরাতে প্রথম পরিক্ষা আপনার আমার যেটা হবে - তা নামাযের পরিক্ষা। একথা কি ঠিক নয়? এ প্রথম পরিক্ষায় যদি পাশ করি তারপর পরবর্তী পরীক্ষা 'তুমি আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠার জন্যে কতোখানি চেষ্টা করেছ' - এ প্রশ্ন আসবে। প্রথম পরীক্ষায় পাশ করলেই ত পরবর্তী পরীক্ষা সহজ হবে। কিন্তু প্রথম পরিক্ষায় যদি আমরা ফেলই করি তাহলে কি গতিটা হবে?

অতএব এ জন্যে আমাদের চিন্তাভাবনা করতে হবে। এ জন্যে কঠোর পরিশ্রম আমাদের করতে হবে।

তারপর দেখুন, আমরা ৫ ওয়াক্ত নামায পড়ি। ফরয ও সুন্নত যদি একত্রে ধরা হয় - ফযরের চার রাকাআত, যোহরের দশ, আসরের চার, মাগরিবের পাঁচ এবং এশার বেতেরসহ (বেতেরকে কেউ কেউ-সুন্নত বলেছেন - আমাদের হানাফী মতে ওয়াজিব) - নয় রাকাআত। একুনে বত্রিশ রাকাআত। বত্রিশ রাকাআত নামায চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে। এই বত্রিশ রাকাআত নামাযের জন্যে যদি প্রয়োজন হয় একটি ঘন্টার একেবারে খুশূ ও খুযু-একাগ্রতা ও বিনয়, নম্রতাসহ, কাওমা, জলসা, তা'দিলে আরকান ঠিকমতো আদায় করে প্রতিটি শব্দেরই অর্থের দিকে খেয়াল করে যদি পুরোপুরি একটি ঘন্টা চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে আমরা ব্যয় করতে পারি, তাহলেই ত কামীয়াব হয়ে যাচ্ছি। আর তা যদি না পারি, এ একটি ঘন্টা যদি আমাদের নফ্সকে আমরা বশ করতে না পারি নফ্সকে যদি আমরা নামাযে হাযির করতে না পারি, তাহলে সবই বৃথা গেলো। তারপর সিজদায় গিয়ে যখন আমরা অনুভব করবো যে, আল্লাহর নৈকট্য লাভ হচ্ছে এবং আল্লাহর নৈকট্যের একটা স্বাদও উপভোগ করছি - তখন ত সিজদা থেকে মাথা উঠতেই চাইবেনা। এটা তখনই হতে পারে যখন আমাদের নফ্স আল্লাহর অনুগত হয়েছে। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এসব হাসিলের তাওফীক দান করুন।

চিন্তাবিদ ও সুধীজনের কলম থেকে

আদর্শ পুরুষ
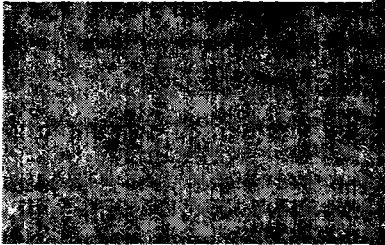
এ অধ্যায়ে মরহুম আব্বাস আলী খান সম্পর্কে কয়েকজন জাতীয় ব্যক্তিত্বের লেখা সংকলিত হলো। এ লেখাগুলো থেকে পরিষ্কার বুঝা যায়, চিন্তাবিদ ও সুধী মহলের দৃষ্টিতে মরহুম খান সাহেবের মর্যাদা কতটা উচুঁ। - সম্পাদক।

মরহুম আব্বাস আলী খান ঃ কিছু স্মৃতি কিছু কথা

মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী এম. পি.
মুফাস্সিরে কুরআন

মৃত্যু এক অনিবার্য মহাসত্য। দিনের পর যেমন রাত আসে, আলোর পর আসে যেমন অন্ধকার তেমনি জীবনের পরিণতি হচ্ছে মৃত্যু। মৃত্যু জীবনের চেয়েও স্বাভাবিক। কিন্তু এমন কিছু মৃত্যু আছে যা স্বাভাবিক ভাবতে কষ্ট হয়। অমোঘ নিয়তি বলে মেনে নিতে বেদনায় ভরে ওঠে বুক। বয়সের প্রেক্ষিতে বিচার করলে মরহুম আব্বাস আলী খানের মৃত্যু অনেকটা পরিণতই বলা চলে। কিন্তু তারপরও কথা থেকে যায়। থেকে যায় অনেক অব্যক্ত বেদনা। মরহুম খান সাহেবের মতো বহুমাত্রিক প্রতিভাধর ব্যক্তিত্ব প্রতিদিন প্রতিবছর জন্মায়না। এমন মানুষ কালেভদ্রে জাতির ভাগ্যে জোটে। ড. আল্লামা ইকবালের ভাষায় 'বড়ে মুশকিল সে হোতা হ্যায় চেমন মে ওহ্ দীদাহ্ অ পয়দা"। তেমনি বাগিচায় প্রতিদিন ফুল ফোটে আবার ঝরেও যায়: কিন্তু আব্বাস আলী খানের মতো ফুল ইসলামী আন্দোলনের বিশাল কাননে প্রতিদিন ফোটেনা।

ইতিহাস স্রষ্টা ব্যক্তিত্বরা সাধারণত জ্ঞানের দু'চারটি শাখায় আপন সৃজনশীল প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে থাকেন: কিন্তু মরহুম খান সাহেবের মতো এমন সৃষ্টিশীল প্রতিভা সত্যিই বিরল। তিনি জ্ঞানের প্রায় সবকটি শাখায় মৌলিকত্বের ছাপ রেখেছেন। ইসলামী রাজনীতির বিস্তীর্ণ অঙ্গনে, ইসলামী সাহিত্য ও ইতিহাসে, সাংগঠনিক দক্ষতায়, জাতিসত্ত্বা বিনির্মানে, শিক্ষা ও দর্শনে, বাগ্মীতায়, তাকওয়ায়, পরিশীলিত আচার-আচরণে ও মার্জিত সৌজন্যবোধে তিনি ছিলেন আপন মহিমায় ভাস্বর এক অনন্য ব্যক্তিত্ব। দূর থেকে মনে হতো তিনি অত্যন্ত ভাব-গম্ভীর রাশভারী মেজাজের লোক কিন্তু তাঁকে যারা নিকট থেকে দেখেছেন-জেনেছেন তারা জানে তিনি কতো বিনয়ী, কতো সহজ সরল, দিগন্তের মতো প্রসারিত এক বিশাল হৃদয়ের অধিকারী অনুসরণযোগ্য মানুষ।

বিগত সিকি শতাব্দী ধরে ইসলামী আন্দোলনের মহান কাফেলার সাথে আমার ওতোপ্রোত সম্পৃক্ততার সুবাদে দেশে-বিদেশে তাঁর একান্ত সান্নিধ্য লাভের সুযোগ পেয়েছি বহুবার। দিবাভাগে যাকে দেখেছি সংগ্রামী সিপাহ্ সাহলার হিসেবে, গভীর রাতে তাকে দেখেছি সংসারত্যাগী এক মহান সাধকের মতো তিলাওয়াতরত অথবা সিজদাবনত।

এ বছর আমার ইউরোপ সফরের শেষ পর্যায়ে খান সাহেবের চরম অসুস্থতার সংবাদ শুনে শংকিত হয়ে পড়ি। সফর শেষে দেশে ফিরে পুনরায় দক্ষিণ কোরিয়া ও সিঙ্গাপুর যাত্রার প্রাক্কালে মুহতারাম খান সাহেবের বাস ভবনে তাঁকে দেখতে যাই। তিনি তখন বাকশক্তিহীন। তবে আমার উপস্থিতি তিনি ঠিকই বুঝতে পারলেন। তাঁর

বড় বড় আঁখি যুগল অশ্রুসিক্ত হলো। আমি আমার পিতৃতুল্য নেতা হারানোর আশংকায় বাস্পরুদ্ধ হয়ে পরম আবেগে তাঁর পেশানীতে চুমু খেলাম। তাঁর শয্যা পার্শ্বে কিছুক্ষণ থেকে চিকিৎসার খোঁজ খবর নিয়ে যখন বিদায় নিচ্ছিলাম তখনও তিনি তার স্বভাবসিদ্ধ অতিথি পারায়নতার কথা ভুলে যাননি। তিনি তাঁর নাতীকে ইশারা করলেন আমাকে আপ্যায়ন কারানোর জন্য। এমন কঠিন রোগাক্রান্ত অবস্থায়ও তাঁর সৌজন্য প্রদর্শনে বিমুগ্ধ হয়েছিলাম।

দশদিন সিউল-সিঙ্গাপুর সফর শেষে যখন দেশে ফিরলাম তখন তিনি ইবনে সিনা ক্লিনিকে মৃত্যু শয্যায় শায়িত। ছুটে গেলাম ক্লিনিকে। কিন্তু তাঁকে পেলাম সম্পূর্ণ অচেতন অবস্থায়। পাশে দাঁড়িয়ে সকলকে নিয়ে তাঁর জন্য প্রাণ ভরে দোয়া করলাম। এটাই ছিল জীবিত খান সাহেবকে আমার শেষ দেখা।

আব্বাস আলী খান সাহেবের ইন্তেকালে শুধু একটি জীবন নয় একটি ইতিহাসেরও ছন্দপতন ঘটলো। বাংলাদেশে আজ ইসলামী আন্দোলন যে পর্যায়ে এসেছে তার অন্তরালে যাদের অবদান ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে তিনি তাঁদের অন্যতম।

একটি প্রকান্ড সুদৃশ্য ইমারত নির্মিত হবার পর তার আয়তন, কারুকার্য ও শৈল্পিক সৌন্দর্য সকলকেই বিমোহিত করে; কিন্তু বহুতল বিশিষ্ট আকাশচুম্বী ইমারতটি যেসব অমসৃন ইট-সুড়কি, রড় ইত্যাদির উপর মাথা উচুঁ করে দাঁড়িয়ে থাকে সেগুলোর দিকে কারো দৃষ্টি পড়েনা। অথচ ঐ বিশালাকয় বিল্ডিংটির ভিত্তিমূলে দৃষ্টির অন্তরালে থাকা ইট-সুড়কি আর রডগুলো যদি আত্মপ্রচার বিমুখ না হতো তাহলে সকলের দৃষ্টিনন্দন, কারুকার্য খচিত, অপূর্ব শোভামন্ডিত ইমারতটির কোন অস্তিত্বই থাকতোনা। ঠিক একইভাবে কোনো জাতিসত্ত্বারূপ ইমারতের ভিত্তিমূলে এমন কিছু লোকের শ্রম মেধা রক্ত আর সীমাহীন ত্যাগ বিদ্যমান থাকে যা না থাকলে সে জাতি তার অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারেনা। আমাদের জাতিসত্ত্বা বিনির্মাণে যেসব ত্যাগী আত্মপ্রচার-বিমুখ ব্যক্তিদের নিঃস্বার্থ কুরবানী অনস্বীকার্য মরহুম খান সাহেব তাঁদেরই একজন।

আমাদের এ দেশ ও সমাজকে জাহেলিয়াতের ঘোর অমানিশা থেকে মুক্তকরণে, সামাজে শিক্ষার আলো বিস্তারে এবং এ দেশকে একটি কল্যাণমুখী ইসলামী রাষ্টে পরিণত করার সংগ্রামে তাঁর অবদান জাতি শ্রদ্ধার সাথে স্বরণ করবে। তবে পরিতাপের বিষয় হচ্ছে মরহুম আব্বাস আলী খানের মতো ক্ষণজন্মা পুরুষদেরকে এ দেশের ইতিহাসে সঠিকভাবে মূল্যায়ন করা হয়না। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য, যেহেতু খান সাহেব লিভার সিরোসিসের রুগী ছিলেন তাই ঢাকা থেকে জয়পুরহাটের দীর্ঘ যাত্রা পথে লাশের ক্ষতি হতে পারে ভেবে লাশ দ্রুত স্থানান্তর করার জন্য যথারীতি ভাড়া পরিশোধ সাপেক্ষে প্রধানমন্ত্রীর নিকট আমরা একটি হেলিকপ্টার প্রদানের আবেদন করেছিলাম। কিন্তু সে আবেদন প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। এমনকি তাঁর জানাযায় দল মত নির্বিশেষে সর্বস্তরের জনতা অংশ গ্রহণ করলেও ক্ষমতাসীন দলের পক্ষ থেকে কেউ অংশ গ্রহণ করেননি। তাদের কেউ একটি শোক বাণীও দেননি। এতে করে ক্ষমতাসীন দলের চরম হীনমন্যতা ও স্বাভাবিক সৌজন্য বোধের দীনতারই প্রকাশ ঘটেছে। অথচ তারা অনেক অখ্যাত-অজ্ঞাত সংস্কৃতিসেবী, তথাকথিত

বুদ্ধিজীবী ও স্বঘোষিত নাস্তিক-মুরতাদদের অসুস্থতায় চরম উদ্বিগ্ন হয়ে রাজকোষ উজাড় করে বিদেশে পাঠিয়ে সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করেন এবং মৃত্যুর পর রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত প্রচার মাধ্যমগুলোতে গণবিচ্ছিন্ন এসব ব্যক্তিদের তিরোধানে মাতম করেন। সরকারের এহেন অসৌজন্যমূলক আচরণ জাতির জন্য দূর্ভাগ্যজনক।

মরহুম আব্বাস আলী খান বার্ধক্যেও ছিলেন তারুণ্যদীপ্ত। তিনি ছিলেন অসাধারণ বাগ্মী। সভা সমাবেশগুলোতে তাঁর বক্তব্য ছিলো শানিত, যুক্তি নির্ভর ও তথ্যভিত্তিক। দূর থেকে তাঁর বক্তব্য শুনে মনেই হতোনা এ কোনো অশীতিপর বৃদ্ধের কণ্ঠ। তাঁর ওজস্বী বক্তব্য শ্রোতাদের মনে রেখাপাত করতো। কারণ তিনি জনসমক্ষে সে কথাই বলতেন যা তিনি বিশ্বাস করতেন ও ব্যক্তি জীবনে আমল করতেন। আল্লামা ইকবাল বলেছেন - "দিল সে জু বাত নিকালতি হ্যায় আছর রাখতি হায়, পর নেহি মাগার তাকতে পরওয়ায মাগার রাখতি হায়"। অর্থাৎ অন্তর থেকে যে কথা বের হয় সেকথা শ্রোতার মনে প্রভাব বিস্তার করে, সে কথার পাখা নেই ঠিকই কিন্তু তা ওড়ার ক্ষমতা রাখে।

১৯৯৩ সালে টঙ্গী জামেয়া ইসলামীয়ায় অনুষ্ঠিত জামায়াতের সদস্য সম্মেলনে আমীরে জামায়াত অধ্যাপক গোলাম আযম কারান্তরালে থাকার কারণে সদস্যদের উদ্দেশ্যে সমাপণী ভাষণ দিয়েছিলেন তিনি। "শাহাদাতের যযবা" ছিল তাঁর আলোচনার বিষয়বস্তু। কুরআন-হাদীস ও ইতিহাস নির্ভর তাঁর সেই বক্তব্যে কান্নার রোল পড়ে গিয়েছিল। সেদিন তাঁর মুনাজাতে ও ইসলামী আন্দোলনের বীর সেনানীদের বুক ফাটা কান্নায় অভূতপূর্ব দৃশ্যের অবতারণা হয়েছিল।

বাংলাদেশে ইসলামী আন্দোলনের অন্যতম প্রাণপুরুষ আব্বাস আলী খান আজ আর আমাদের মাঝে নেই। তিনি চলে গেছেন মৃত্যু যবনিকার ওপারে। শত মানুষের শত প্রচেষ্টা বিফল হবে কিন্তু সৌম্যকান্তি সেই মানুষটিকে আর খুঁজে পাওয়া যাবেনা। "কুছ এ্যায়সে ভি এস বুযম্ সে উঠ জায়েঙ্গে জিনকে তুম ঢুঁন্ডকে নিকলোগে মাগার পা না সেকোগে।" কিছু এমন লোক এ মহাসমাবেশে থেকে উঠে যাবে যাদের সন্ধানে বেরুবে কিন্তু পাবেনা।

মরহুম আব্বাস আলী খান শুধু বাংলাদেশের ইসলামী আন্দোলনের নেতা ছিলেননা। তিনি ছিলেন গোটা বিশ্বের ইসলামী আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা। যে কোন মাপকাঠিতে তিনি ছিলেন শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ মুজাদ্দিদ আল্লামা সাইয়েদ আবুল আ'লা মুওদূদী র.-এর যোগ্য উত্তরসূরী। তাঁর ইন্তেকালে ইসলামী আন্দোলনের এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের পতন ঘটলো। এ ক্ষতি অপূরণীয়।

তিনি তাঁর জীবনের যাবতীয় সুখ শান্তি, আনন্দ সম্ভার বিসর্জন দিয়ে প্রতিটি মুহূর্ত দীন প্রতিষ্ঠার মিশনে উৎসর্গ করেছিলেন। এমন লোক খুব কম দৃষ্টি গোচর হয় যাদের মাঝে উচ্চ মানের মানসিক যোগ্যতা, অনন্য চিন্তাধারা, ইজতিহাদ এবং চিন্তার পরিশুদ্ধি ও পরিপক্কতার পাশাপাশি বাস্তব ক্ষেত্রে নেতৃত্বের যোগ্যতা, চরিত্রের মহত্ব ও সরলতার সমাবেশও ঘটতে পারে। মরহুম খান সাহেবের মাঝে এ সকল গুণাবলীর অপূর্ব সমাবেশ থাকা সত্ত্বেও এ সবের কোনো অনুভূতি অথবা অনুভূতির প্রকাশ তিনি কখনো করেননি। তিনি তাঁর আজন্ম লালিত স্বপ্ন বাস্তবায়নে ছুটে

বেরিয়েছেন। রোগ-শোক, দুঃখ-কষ্ট তাঁকে পরাভূত করতে পারেনি। ইসলাম বিরোধী শক্তির ষড়যন্ত্র মুহূর্তের জন্যেও করতে পারেনি তাঁকে বিচলিত।

আল্লাহ্ তায়ালার কাছে তিনি যেভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিলেন আমার দৃঢ় বিশ্বাস তিনি সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষায় আমৃত্যু সচেষ্ট ছিলেন। এ দৃষ্টিকোন থেকে তিনি নিঃসন্দেহে আল্লাহ্র মাকবুল ও মাহবুব বান্দাহ্। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন বলেন; "ঈমানদারদের কিছু লোক তো এমন রয়েছে যারা আল্লাহ্ তায়ালার সাথে (জীবন বাজী লাগানোর) যে ওয়াদা করেছিল তা সত্যে পরিণত করলো। তাদের কিছু সংখ্যক (সৌভাগ্যবান মানুষ) নিজের কুরবানী পূর্ণ করলো আর কেউ কেউ এখনো অপেক্ষায় আছে। তারা তাদের আসল লক্ষ্য কখনো পরিবর্তন করেনি" (আহযাব ঃ ২৩)।

মরহুম আব্বাস আলী খানের মতো রাজনৈতিক অভিভাবক আমরা এমন সময় হারালাম যখন বাংলাদেশ ইতিহাসের এক সংকটকাল অতিক্রম করছে। দেশে আজ রাজনীতির নামে চলছে প্রহসন, অর্থনীতির নামে চলছে শোষণ, সংস্কৃতির নামে বিজাতীয় অপসংস্কৃতির সয়লাব, সাংবাদিকতার নামে তথ্য সন্ত্রাস, চুক্তির নামে দেশ বিক্রির ষড়যন্ত্র আর ধর্মের নামে চলছে শিরক বিদয়াত আর অনাচার। দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব-অখন্ডত্ব আজ বিপন্ন। অপরদিকে দেশ থেকে মাদ্রাসা শিক্ষার মূলোৎপাটনের জন্য চলছে নানাবিধ চক্রান্ত। দেশ ও জাতির এহেন ক্রান্তিলগ্নে আজ খান সাহেবের মৃত্যুর শোককে শক্তিতে পরিণত করে ইসলামী আন্দোলনের নেতা কর্মী তথা ইসলাম প্রিয় তাওহীদি জনতাকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে আমাদের প্রিয় জন্মভূমি বাংলাদেশকে ইসলামী কল্যাণ রাষ্ট্রে পরিণত করার সংগ্রামে।

(১৯শে অক্টোবর ৯৯ জাতীয় প্রেসক্লাবে সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রিসার্চ একাডেমী আয়োজিত স্মরণ সভায় প্রদত্ত বক্তব্য অবলম্বনে। অনুলিখন ঃ মাওলানা রাফীকুল ইসলামী সাঈদী।)

A MAJOR FIGURE IN ISLAMIC MOVEMENT

Shah Abdul Hannan
Former Secretary Govt. of Bangladesh &
Former Chairman NBR Govt. of Bangladesh

Mr. Abbas Ali Khan was a major figure in Islamic movement of the South Asian Sub-continent (The Jamaat-e Islami), an important political figure of Bangladesh, thinker and writer, died on 3rd October, '99 at the age of 85..

Abbas Ali Khan was a close associate of Sayyed Abul A'la Maudoodi, the founder of Islamic movement, became a senior leader and a close lieutenant of Maulana Maudoodi. He later became the Acting Ameer (leader) of the movement in Bangladesh for several years.

Abbas Ali Khan had an Islamic and western education. He went to Madrasah for his Islamic education and later went to Karmaichel College in Rangpur and Government College in Rajshahi (North Bengla). After his graduation, he did some rather minor jobs in some government departments under the British colonial Administration, because for the educated Muslims the opening were a few. Then he left government service and joined education to which he devoted himself for the rest of his life. He also established a college in his home town.

He became Headmaster (Principal) of a secondary school at Joypurhat, now a district town in Bangladesh. While he was a Headmaster, he joined Jamaat-e-Islami, after he came in contact with Prof. Golam Azam, the distinguished Islamic leader and thinker of Bangladesh.

He has written important works on history, Islamic movement and Islamic studies. Though he had no formal education as historian, he left hehind a major work on "Muslim History in Bengal". Except for Dr. Mohor Alis "History of Muslim Bengal", this work is the best on the subject. He himself wrote in its introduction, "that in this work there is nothing but the truth, no exaggeration." This work deserves to be translated in English and other major languages inmediately. In this

work, he not only discusses the history of the Muslims of Bengal from its political rise in 1203 AD till today, also discusses the relevant history of British Raj, Hindu-Muslim issue in the Sub-continent, political developments involving Indian Mulim League (The main party of the Muslims) and Indian National Congresss (main Hindu party) and their relationships. He graphically discussed intransigence mostly by Indian National Congerss and its leadership to understand the Muslim viewpoint.

He was also the historian of Islamic movement. He has left hehind two major works on the "History of Jamaat-e-Islami" and "Life of Sayyed Abul Ala Maudoodi", he has also left hehind his autobiographical work " Waves of the sea of Memory." which he has written like a fiction. He also translated a number of major works of Sayyed Maudoodi.

Mr. Abbas Ali Khan gives an account of Jamaat's work from 1941 to 1947, the conferences of Jamaat held at different times, and how Maulana Maudoodi prepared the Jamaat to tackle the problems in the independent states of India and Pakistan. He explained the duty of Jamaat in India and Pakistan in Pathankot Conference held in May 1947. He said that in Pakistan, the duty of Jamaat would be to establish an Islamic state with the support of the people. In India, Jamaat will explain Islam to the non Muslims and protect the Islamic interests there. In the Conference, Maulana Maududi explained the 4-important steps of Islamic Movement :

i) Reform of thinking
ii) organization and training of manpower
iii) reform of society, and iv) change of leadership of the nation.

Abbas Alli khan has explained the basic difference of Jamaat-e-Islami and Muslim League (Muslim Nationalist Party) in the book. He explained that Muslim league did not have correct islamic objectives though they worked for Muslim interests.

Abbas Alli Khan then explains in his book the characterstics of Jamaat-e- Islami which are as follows :

i) Its call is not to a person but to Islam
ii) It is not a sect.

iii) Establishment of Islam is its goal.
iv) Everybody must increase his Islamic knowledge and convey Islam to others.
v) Nobody should try for any post here and people who are in responsible positions must decide matters through consultation.
vi) No sub-group and propaganda against each other is allowed.
vii) Fund is collected mainly from within the Movement. However, voluntary donation is accepted.
viii) There is a training system for mental and moral development.
ix) Jamaat never uses unfair propaganda against others.

In the "Waves of the sea of Memory", he has mainly discussed his early life, his education, the events of his service life, his joining of jamaat-e-Islami and his work in the Jamaat. He has also discussed in this 'Memoir' the Hindu-Muslim and the political issues of the sub-continent in the days of British Raj in India, which he has also discussed in more details in his work on History of Muslims of Bengal. His Memoir is not complete in the sense that this does not cover the Bangladesh period (1971-1999). The Memoir is the good readings. As regards his work in Jamaat, he was the key person in organizing the Jamaat in the north Bengal region. He had the opportunity to get a very close association of Maulana Maudoodi, when he accompanied the Maulana in his tour of northern region of the then Pakistan in 1956 and 1958. He used to translate Maulana Mauoodi's public speeches in Urdu into Bangla, (the language of the local people).

During the last days of his life, he worte a treatise on "Causes of the deviation of an ideological organization", which indicates his worries about Islamic movements in the world. In this book, among others, he warned against materialism, failure to make serious soul-searching and weaknesses in leadership. He says in the book "What I have written in this essay is to save Islamic movement from deviation and decay". He pointed out that the failure of workers to make the very aim and goal of Islamic movement, that of their own lives, the movement can not proceed to the path of process. He emphasized on comprehensive Islamic knowledge and character. He

warned against mutualsuspicion among the workers and that pessimism should not be allowed to creep in the movement.

He highly emphasized in this essay that the Islamic movement should never succumb to the anti-Islamic environment. If it does so, the workers conduct will deviate form Islam and they will start talking like corrupt politicians in their meetings and processions.

He says that "One of the main reasons of decline and deviation is the weakness of leadership. Weak leadership can not keep the movement on proper track. This weakness can be of quality, Islamic knowledge, character or of personality or of the ability to take proper decision at proper time."

He was born in 1914, the year First World War broke out. While a Principal of a school, he joined Jamaat-e Islami and became Chief of Rajshahi region. He was elected to National Assembly of Pakistan in 1962 and was the Chief of Jamaat Parliamentary Party in the National Assembly. Jamaat was in the opposition and Abbas Ali Khan acted as the spokesman of the Islamic movement there. He distinguished himself as a parliamentarian. He was an active leader against all oppressive regimes, against Ayub Khan in COP, PDM and DAC; and later in Bangladesh against General Ershad. He joined the Cabinet of Abdul Muttalib Malik in 1971 which landed him in Jail in 1972. He has denied any wrong doing in that period in his discussions. He was a man of conviction all through his life and he always acted according to his best judgement.

Abbas Ali Khan was a gentleman per excellence, as a Muslim should be. The love and esteem of the people of Bangladesh for him was revealed in his funeral prayers, which were attended by record exodus of people. From my personal knowledge I can say that he was a man of Islam. He spent every bit of his energy for the last 45 years for Islam and Islam only. He was a simple person, never showing of any pride or achievement. Allah bless him and give him Jannatul Firdaus.

মানব দরদী আব্বাস আলী খান

কবি আল মাহমুদ

বাংলাদেশের প্রবীণ রাজনৈতিক নেতা জনাব আব্বাস আলী খানের মৃত্যু সংবাদে হৃদয় শুধু ব্যথিতই নয়, মনটাও কেমন যেনো এক ধরনের শূন্যতার দ্বারা আচ্ছন্ন। তাঁর সেই কুশল জিজ্ঞাসার সাথে মধুর হাসিটির কথা আমার চিরকাল মনে থাকবে। এমন স্নেহসিক্ত প্রাচুর্যপূর্ণ ও সজীব হাসির স্মৃতি আমি কোনোদিন ভুলবোনা। এমনিতেই এ দেশের রাজনীতিকরা মাত্রাতিরিক্ত ভাব গম্ভীর। হয়তো তারা তাদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার ভাবেই মুখের অবস্থাটাকে একটি মেঘলা করে রাখেন। তাদের সাথে রাজনৈতিক হালচাল, দেশ ও দশের বাস্তব অবস্থা নিয়ে খানিকক্ষণ আলোচনা করা চলে। কিন্তু কবিতা, সাহিত্য, মানুষের স্বপ্ন নিয়ে কথা বলতে গেলেই তাদের গাম্বীর্যের মুখোশটি আরও দৃঢ়ভাবে চোখের ওপর এঁটে বসে। কিন্তু আব্বাস আলী খানের মুখে ঐ ধরনের কোনো রাজনৈতিক গাম্ভীর্য সাধারণত আমরা যারা এদেশে লেখালেখি করি, বিশেষত আধুনিক ইসলামী সাহিত্যের গোড়াপত্তনের চেষ্টা করে চলেছি তারা সচরাচর দেখেনি। তিনি ছিলেন এ দেশের মুসলিম ঐতিহ্যবাদী লেখকদের প্রতি খুবই সদয় এবং আমাদের জন্য অফুরন্ত হাসির ফোয়ারার মতো। যেহেতু তিনি নিজেই ছিলেন একজন লেখক এবং অন্তরদৃষ্টি সম্পন্ন পর্যবেক্ষক, তাছাড়া বিভাগপূর্বকাল থেকে উপমহাদেশের মুসলমানদের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সংগ্রামের সাথে ওৎপ্রোতভাবে জড়িত ব্যক্তি, সে কারণে তাঁর ইতিহাস জ্ঞান এতোটাই পরিচ্ছন্ন ছিলো যে, তিনি অবলীলায় রচনা করতে পেরেছেন, 'বাংলাদেশের মুসলমানদের ইতিহাস' নামক এক বৃহদাকার পুস্তক। তাঁর 'স্মৃতি সাগরের ঢেউ' নামক বইটি পড়তে গিয়ে আমার সহসাই মনে হয়েছিল তিনি ইচ্ছে করলেই বাংলা ভাষার একজন সুপরিচিত কথাশিল্পী হয়ে উঠতে পারতেন। কিন্তু জনাব খান সাহিত্যের পথে আসেননি সম্ভবত যৌবনের প্রারম্ভেই তিনি এমনসব রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের সংস্পর্শে এসেছিলেন যারা বাংলাদেশ তথা সমগ্র ইপমহাদেশের পর্যুদস্ত মুসলিম জাতির ভাগ্য বদলের জন্য রাজনৈতিক নেতৃত্বের পদে বরিত ছিলেন। যেমন শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হকের তিনি ছিলেন একান্ত সচিব। এ ধরনের রাজনৈতিক সাহচর্য একজন আদর্শবাদী ও উচ্চাকংখি যুবকের জন্য নিশ্চয়ই খুবই সংক্রামক হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত রাজনীতিতেই তার প্রতিভার পরিতৃপ্তি তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন। যতোদিন জীবিত ছিলেন ততোদিন পর্যন্ত এ দেশের মুসলমানদের স্বাথ ইসলামী আন্দোলনে তার একটি দৃঢ় ও অবিচল ভূমিকা আমরা মনে মনে উপলব্ধি করেছি। তিনি কেবল জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের সিনিয়র নায়েবে আমীরই

ছিলেননা, ছিলেন সমগ্র বাংলাদেশের ইসলামপ্রিয় মানুষেরই নির্ভরযোগ্য নেতা। তার চেহারায় পরহেজগারী ও আধ্যাত্মিকতার ছাপ যেমন ছিলো তেমনি ছিলো এদেশের মানুষের জন্য গভীরতর দরদের অভিব্যক্তি। তার জানাযায় মানুষের ঢল দেখেই বোঝা যায় এ দেশের মানুষ তাদের প্রিয় নেতা আব্বাস আলী খানকে কতোটা ভালোবাসতো। এই জনসমাগমের মাধ্যমেই জনগণ মরহুমের রাজনৈতিক আদর্শের প্রতি তাদের আস্থা ও সমর্থন ব্যক্ত করেছে।

১৯৫৫ সালে জনাব আব্বাস আলী খান জামায়াতে ইসলামীর সংস্পর্শে আসেন এবং মাওলানা মওদূদীর রচনাদি পড়ে দারুণভাবে উদ্বুদ্ধ হন। ঐ বছরই তিনি জামায়াতে যোগদান করেন। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে তিনি যৌবনের প্রারম্ভেই রাজনীতির আবহাওয়ায় প্রবেশের সুযোগ পেয়েছিলেন এবং বিশিষ্ট মুসলিম রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বকে কাছ থেকে দেখেছেন এবং তাদের ঘনিষ্ঠতাও পেয়েছেন। কিন্তু জামায়াতে ইসলামীতে যোগদানের পর তার রাজনৈতিক দিগদর্শন ও তার জীবন ইসলামী আন্দোলনের সাথে এমনভাবে একমুখী হয়ে পড়ে যে বহু ঝড়ঝঞ্ঝা, রাজনৈতিক উত্থান-পতন ও পীড়ন যন্ত্রণার মধ্যেও তা মৃত্যু-মুহূর্ত পর্যন্ত বজায় ছিলো। বর্তমানকালের রাজনৈতিক অঙ্গনে তার মতো বয়োবৃদ্ধ নেতা অন্যান্য দলেও আছেন। কিন্তু বাংলাদেশের মুসলমানদের উদ্ভবের ইতিহাস সম্বন্ধে পরিচ্ছন্ন জ্ঞান, তাদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিশ্চিত বিশ্বাসভরা স্বপ্নময় বহুদর্শী মানুষ খুব বেশী আছে বলে মনে হয়না। বিশেষ করে তার সাহিত্য সৃষ্টির যে প্রতিভা ও লেখক ক্ষমতার যে পরিচয় আমরা অনুভব করতাম তা বর্তমান রাজনৈতিক পরিবেশ ও সামগ্রিকভাবে রাজনৈতিক অঙ্গনেই আর কারো মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবেনা।

তিনি যে বাংলাদেশের বর্তমান সময়ের হিংস্র ও বিদ্বেষাত্মক রাজনীতির মধ্যেও সদা প্রফুল্ল ও সতেজ থাকার কৌশলটি আয়ত্ত করেছিলেন। সেটা সম্ভত তার সাহিত্যপ্রীতিও নিত্য পঠন-পাঠনে ওয়াকিবহাল থাকা, নিগূঢ় এবাদতবন্দেগী এবং মানুষের কল্যাণ চিন্তারই প্রসন্ন উপার্জন মাত্র। তাঁর মতো রাজনৈতিক নেতাদেরই এদেশের মানুষ সর্বান্তকরণে, সর্ব ব্যাপারে সমর্থন দিতে চায়। কিন্তু কোথায় তাদের পাওয়া যাবে? আব্বাস আলী খান ইসলামী আন্দোলনের একজন বহুদর্শী প্রাজ্ঞ রাজনৈতিক ব্যক্তি হিসেবে এই সমর্থন ব্যাপকভাবে পেয়েই ইন্তেকাল করেছেন। আল্লাহ তার যাবতীয় প্রয়াস ও পরিশ্রমের পুরস্কার নিশ্চয় দেবেন।

বাংলাদেশের রাজনীতির এক ঘূর্ণাবর্তে, জামায়াতে ইসলামীর সংকটকালে যিনি ভারপ্রাপ্ত আমীরের দায়িত্ব পালন করেন। দীর্ঘ এক যুগের অধিকাল এই দায়িত্ব তার ওপর থাকায় দেশব্যাপী সমর্থকদের মধ্যে নির্ভরতা ও উদ্দীপনা আগের মতোই থাকে। নেতৃত্বের যোগ্যতা তাকে সকলের কাছেই একজন মহৎপ্রাণ ব্যক্তিত্বে পরিণত করেছিল। আমাদের জনগণ একজন বড় মানুষকে হারাল।

জামায়াতে ইসলামীর আমীর অধ্যাপক গোলাম আযম বলেছেন, 'আব্বাস আলী খান ছিলেন তার জন্য প্রেরণার উৎস।' প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন দলমত-নির্বিশেষে ইসলামী আন্দোলনেরই নির্ভরযোগ্য আস্থা ও সাহসিকতারই প্রতীক। একজন লেখক-সাংবাদিক হিসেবে অকপটে বলতে পারি, তাকে দেখলেই মনে আনন্দ সৃষ্টি হতো। তিনি আমাদের মতো লেখক শিল্পীদের ইসলাম প্রীতিতে কেবল পুলকিতই ছিলেননা মনে হয় তার আকাংখিত ইসলামী কল্যাণরাষ্ট্রে যে আধুনিক মননশীল কবি-সাহিত্যিকদেরও একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকবে এতে দ্বিধান্বিত ছিলেননা। তিনি সদাশয় চিত্তে আমাদের সালাম গ্রহণ করতে জানতেন এবং মমতা ভরে কুশল জিজ্ঞাসা করতেন।

আমাদের দেশে অধ্যয়নবিমুখ মানুষই ঠেলেঠুলে রাজনৈতিক নেতৃত্বে সমাসীন হন, অথবা উত্তারাধিকার সূত্রে নেতৃত্বে এসে পড়েন। এই লক্ষণ অবশ্য সারা উপমহাদেশেই বদ্ধমূল হয়ে আছে। কেবল ইসলামী আন্দোলনেই তা অসম্ভব। যোগ্যতা, বিনয়, জনকল্যাণ ও আল্লাহর প্রতি গভীর বিশ্বাস না থাকলে কেউ মুসলমানদের নেতৃত্বে আসতে পারেনা। আব্বাস আলী খান ছিলেন তেমনি মানুষ ও জনদরদী মুসলিম নেতা। সারা উপমহাদেশের মুসলমানরাই তার নাম ও ভূমিকা সম্বন্ধে কমবেশী অবহিত ছিলো। তাকে হারানোর ব্যথা তাদেরই বেশী বাজবে যেসব উদ্দীপিত মুসলিম তরুণ ইসলামী আন্দোলনের সুবাদে তার সংস্পর্শে এসেছিলেন এবং তার সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা ও রাজনৈতিক বিশ্লেষণ শুনেছিলেন। তারা ভাববেন তারা এক মহান ভাবুক ও স্বাপ্নিক রাজনীতিকের সঙ্গ লাভ থেকে চিরকালের মতো বঞ্চিত হলেন। তবে তার জন্য রোদনের বদলে গৌরব বোধ করাই অধিক সঙ্গত বলে মনে করি। কারণ তিনি তার দীর্ঘ জীবনব্যাপী একটি কাজই একটানা আঞ্জাম দিয়ে গেছেন। আর সেই কাজটি হলো ইসলামী কল্যাণরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য উপযুক্ত মানুষ তৈরী করে যাওয়া। তার সেই প্রয়াসও আমরা সফল হতেই দেখবো। ইনশাল্লাহ।

বাংলাদেশের সার্বিক রাজনৈতিক পরিসরের মধ্যে তিনি ছিলেন প্রকৃত অর্থে শিক্ষিত, মার্জিত ও ওয়াকিফ হাল আধুনিক মানুষ। তার তিরোধানে কেবল যে ইসলামী গণতান্ত্রিক আন্দোলনেরই ক্ষতি হলো এমন নয়। যারা ভাবেন গণতন্ত্র চর্চায় সহনশীলতার একান্ত দরকার, তাদের মধ্যেও অপরিসীম শূন্যতার বেদনা অনুভূত হবে।

মাওলানা আব্বাস আলী খান ঃ কিছু স্মৃতিকথা

মুহাম্মদ আয়েন উদ্দিন
মুসলিম লীগ নেতা

বাংলাদেশের সার্বিক রাজনৈতিক পরিসরের মধ্যে তিনি ছিলেন প্রকৃত অর্থে শিক্ষিত, মার্জিত ও ওয়াকিফ হাল আধুনিক মানুষ। তার তিরোধানে কেবল যে ইসলামী গণতান্ত্রিক আন্দোলনেরই ক্ষতি হলো এমন নয়। যারা ভাবেন গণতন্ত্র চর্চায় সহনশীলতার একান্ত দরকার, তাদের মধ্যেও অপরিসীম শূন্যতার বেদনা অনুভূত হবে।

'জীব মাত্রকেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে' মহান আল্লাহর এই দ্ব্যর্থহীন ঘোষণার যথার্থতা প্রমাণ করে আর সকলের ন্যায় বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সিনিয়র নায়েবে আমীর এদেশের অন্যতম প্রবীণ জননেতা মাওলানা আব্বাস আলী খান নশ্বর এ পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছেন অবিনশ্বর পরলোকে। পরিণত বয়সে তাঁর এই তিরোধানে শোক প্রকাশের কিছু না থাকলেও তাঁর মৃত্যু সংবাদে কেন যেনো বিচলিত হয়ে উঠলাম। চোখের সামনে ভেসে উঠলো সহজ-সরল নিরহংকার এক মদে মুমিনের চেহারা। স্বল্পভাষী ও আপাতদৃষ্টিতে গম্ভীর মানুষটির কিছু স্মৃতি ফুটে উঠলো মনের পর্দায়। মাওলানা আব্বাস আলী খানের সাথে আমার পরিচয় দীর্ঘদিনের। রাজনৈতিক কারণে কালেভদ্রে তার সাথে সাক্ষাৎ হতো। জামায়াতে ইসলামীর অন্যতম নিঃশব্দ কর্ণধার হলেও দলের নীতি নির্ধারণের তাঁর কোনো অবদান নেই এটাই মনে করতাম। তাঁর অফিস কক্ষে ছোট একটি টেবিল এবং সেই টেবিলের পার্শ্বে একটি সাধারণ চেয়ারে বসে তাঁকে তাঁর সমুদয় কাজকর্ম সম্পন্ন করতে দেখেছি। সময় সময় মনে হয়েছে যে, তিনি নামমাত্র জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমীর। কিন্তু কোনো সময় একথা ভাববার অবকাশ পাইনি যে, তিনি ছিলেন সত্যিকার অর্থেই একজন বড় মাপের মানুষ। চাকচিক্য কিংবা জাঁকজমক নয়, সহজ-সরল জীবন যাপনে তিনি ছিলেন দৃঢ় বিশ্বাসী। প্রাচুর্য নয়, প্রয়োজনটুকু নিয়েই তিনি ছিলেন সন্তুষ্ট। যেটুকু না হলে চলেনা শুধু সেটুকুই সম্ভবত তিনি ব্যবহার করতে পছন্দ করতেন। তাঁকে আমি খুব নিকট থেকে দেখার সুযোগ পেলাম লিবিয়ার প্রেসিডেন্ট জনাব মোহাম্মাদ গাদ্দাফী কর্তৃক আহূত এক সম্মেলনে যোগদান করতে গিয়ে।

সুপ্রীম কোর্টের অন্যতম প্রবীণ এডভোকেট জনাব এইচ কে আব্দুল হাই সাহেবের সৌজন্যে দাওয়াত পেলাম মহানবী হযরত মোহাম্মাদ মোস্তফা স.-এর জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে লিবিয়ার প্রেসিডেন্ট গাদ্দাফী কর্তৃক আহূত বিশ্ব মুসলিম কনফারেন্সে-এ যোগদানের জন্য। দাওয়াতটি ছিলো অপ্রত্যাশিত। বিশ্ব মুসলিম কনফারেন্সের নির্ধারিত তারিখের মাত্র তিন দিন আগে দাওয়াত পেলাম। সহযাত্রীদের পরিচয় জানা ছিলনা। তবে শুনলাম জামায়াতে ইসলামীর প্রবীণ জননেতা মাওলানা আব্বাস আলী খান একজন ডেলিগেট হিসেবে এই সম্মেলনে যাচ্ছেন।

জিয়া আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে সহডেলিগেটদের সকলের সাথে দেখা হলো। দেখা হলো মাওলানা আব্বাস আলী খান সাহেবের সাথেও। তিনি সানন্দে অভিনন্দন জানালেন আমার সালামের প্রতি উত্তরে। এমিরেটস এয়ারলাইন্সে আমাদের টিকিট ছিলো এবং সব টিকিটই ছিলো এক্সিকিটিভ ক্লাস-এর। সুতরাং আমাদের নেয়া হলো ভিআইপি লাউঞ্জে। হালকা খাবার পরিবেশনের জন্য এয়ারলাইন্সের পক্ষ থেকে পুরুষ এবং মহিলারা সেবাদানের জন্য এগিয়ে এলেন। মহিলাদের সেবাকর্ম দেখে মাওলানা উষ্মাভরে মন্তব্য করলেন, যে কাজ পুরুষের দ্বারা সম্ভব সে কাজে অহেতুক নারীদের টেনে আনা অনুচিত। বিমান ছাড়তে তখনও বেশি দেরী ছিলো। সুতরাং এশার নামাজ পড়ার জন্য তিনি মসজিদের খোঁজ করলেন। সংবাদ মতে আমরা হাজির হলাম বিমান বন্দরের বহির্গমনের একটি কামরায়। কামরাটি নামাজের স্থান হিসেবে সবিশেষ চিহ্নিত। নামাজের শুরুতে তিনি অত্যন্ত বিনয়ের সাথে আমাকে ইমামতি করতে অনুরোধ করায় আমি হতবাক হয়ে গেলাম। হেসে উঠে বললাম আমাকে লজ্জা না দিয়ে ইমামতির কাজটি সেরে ফেলুন। স্মিত হাসি হেসে তিনি ইমামতি শুরু করলেন এবং অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন ও সুন্দরভাবে কসর নামায আদায় করলেন। এরপর দীর্ঘ এক সপ্তাহ তাঁর সাথে স্টীমারে, প্লেনে, গাড়ীতে, বিভিন্ন হোটেলে ও মোটেলে বাস করার সৌভাগ্য হয়েছে। এই সময়ের মধ্যে তাঁর চরিত্রের যে বিশেষ দিকগুলো আমার সামনে উদ্ভাসিত হয়ে ইঠেছে তা হলো তার নিয়মানুবর্তিতা, সততা, কর্তব্যনিষ্ঠা, সময়ের প্রতি সচেতনতা ও ইসলামের প্রতিটি অনুশাসনের প্রতি অবিচল আস্থা। বাড়ী ফেরার পথে এমিরেটস এয়ারলাইন্সের পক্ষ থেকে প্রত্যেক যাত্রীকে একটি করে গিফট বক্স দেয়া হলো কিন্তু তাঁকে যে বাক্সটি দেয়া হলো তা মহিলাদের ব্যবহারের জন্য । প্রবীণ এই জননেতাকে ভিন্ন একটি গিফট বক্স দিতে গিয়ে বিমান কর্তৃপক্ষ কুণ্ঠিত হয়ে অনেক দুঃখ প্রকাশ করলেন। আমি আমারটির সাথে বদল করার জন্য তাকে অনুরোধ করলাম। তিনি হেসে উঠে বললেন-মহান আল্লাহ্ যে জিনিসটি আমার জন্য নির্ধারিত করে দিয়েছেন তা বদল করতে যাবো কোন দুঃখে। সৃষ্টিকর্তার প্রতি সৃষ্ট জীবের এই গভীর আস্থা শুধু অনুসরণীয় নয় এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্তও বটে। লোভের বা ক্ষোভের উর্ধ্বে এবং অল্পে তুষ্ট এই মানুষটিকে মনে মনে জানালাম গভীর শ্রদ্ধা! মাওলানা আব্বাস আলী খান আর নেই, কিন্তু তিনি রেখে গেছেন তাঁর অনুপম চরিত্রের অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত। মহান আল্লাহর কাছে আমাদের মোনাজাত, তিনি যেনো তাঁকে আখেরাতে শান্তি দান করেন। আমীন/সুম্মা আমীন।

প্রিয় নেতাকে যেমন দেখেছি

মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম

জনাব নূরুল ইসলাম একজন বড় মানের ব্যাংকার। ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ-এর নির্বাহী সহ-সভাপতি। তিনি জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার সদস্য। ছাত্র জীবনে প্রথমে তিনি দুই সেশন (অর্থাৎ ১৯৬৭-৬৮ এবং ১৯৬৮-৬৯ সেশন) পূর্ব পাক ইসলামী ছাত্র সংঘের সাধারণ সম্পাদক এবং পরে দুই সেশন (অর্থাৎ ১৯৬৯-৭০ এবং ১৯৭০-৭১ সেশন) সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। এসব দায়িত্ব পালনকালে তিনি বহুবার মরহুম খান সাহেবের একান্ত সান্নিধ্য লাভ করছেন। একান্ত নিকট থেকে দেখেছেন তাঁকে। দেখেছেন তাঁর ঈমান, তাকওয়া দিলের প্রশস্ততা, শৃঙ্খলা আর তাঁর মানবত্বকে। তাঁর এই নিবন্ধে বিম্বিত হয়েছে আল্লাহর মাহবুব দাস আব্বাস আলী খানের প্রকৃত পরিচয়ের এক গুচ্ছ খন্ড চিত্র। - সম্পাদক

'নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে আল্লাহর কাছে সর্বাধিক সম্মানিত সেই, যে তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক মুত্তাকী - পরহেযগার।' মর্যাদার উচ্চ আসন লাভের ক্ষেত্রে আল-কুরআনের ঘোষিত এই চিরন্তন সনদের এক জীবন্ত প্রতীক ছিলেন অশীতিপর জননেতা আব্বাস আলী খান র.। গভীর রাতের নিভৃত প্রহরে, জনমানুষের দৃষ্টির আড়ালে 'আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনায়' যিনি থাকতেন 'রুকু ও সেজদারত', ফযর-প্রত্যুষে অনিবার্যভাবে সেই মহীয়ান নেতাকে বড় মগবাজার গ্রীনওয়ের আবাস থেকে ওয়ারলেস রেলগেট মসজিদের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে আসতে দেখা যেতো সবার আগে। ধীর-স্থির পদচারণা। মহামহীমের দরবারে হাজীরা দেবার জন্যে মন ও মানসের অব্যক্ত প্রস্তুতির পূর্ণতা নিয়ে যেনো এগিয়ে চলছেন দুনিয়ার সকল বন্ধনমুক্ত, এদিক ওদিক ভ্রুক্ষেপহীন অচেনা এক মুসাফির।

সমগ্র 'অবয়ব তাঁর সেজদার আছারে প্রোজ্জ্বল।' মসজিদে নামাযের প্রথম কাতারেই তাঁকে দেখা যেতো। আর বেরিয়ে আসতেন সবার পরে। গভীর আল্লাহর প্রেমের অচ্ছেদ্য ডোরে আনুষ্ঠানিক ইবাদতের অংগনে তিনি যেমনি চির অক্লান্ত ছিলেন, তেমনি চির সতেজ, চির প্রাণবন্ত ও চির যৌবনদৃপ্ত ছিলেন ইসলামী আন্দোলনের বন্ধুর-ঝঞ্ঝাময় ময়দানে। নিছক বক্তৃতায় নয়, বাস্তবেই তিনি ছিলেন "রুহ্বান ফিল-লাইল, ওয়া ফুরসানুন ফিন্-নাহার" রাতে ধ্যানমগ্ন বৈরাগী - দিনে যুদ্ধের ময়দানে ঘোড়সওয়ারী। বয়সের ভার কখনো তাকে নুব্জ করতে পারেনি, স্থবীর করতে পারেনি তাঁর গতিকে। উদ্দাম-উদ্যম, প্রেরণা ও প্রাণ শক্তিতে বলিয়ান এ মহান ব্যক্তিত্বের যৌবন আর বার্ধক্যের মধ্যে পার্থক্য চিহ্নিত করা দূরূহ ছিলো।

৩২ বছর আগে ১৯৬৭ সালে অবিসাংবাদিত এ নেতার সাথে আমার প্রথম পরিচয় রাজশাহীতে, ইসলামী ছাত্র সংঘের প্রাদেশিক সেক্রেটারী হিসেবে সফরে গিয়ে। তখন তিনি জামায়াতে ইসলামী রাজশাহী বিভাগীয় আমীর। তাঁর নিকটে আসার

সুযোগ হয় বগুড়ায় ১৯৭০ সালে। মহাস্থান গড়ের অনতিদূরে মোকামতলায় একটি জনসভায় মরহুম আবদুল খালেক র.-এর সাথে যোগদান উপলক্ষে। সেই জনসভায় তিনি সভাপতিত্ব করেছিলেন। বাইরের বক্তা ছিলেন মরহুম আবদুল খালেক র. ও আমি। তখন আমি দ্বিতীয়বারের জন্যে ইসলামী ছাত্র সংঘের প্রাদেশিক সভাপতি। নিজামী ভাই তদানীন্তন নিখিল পাক-সভাপতি। লাজুক প্রকৃতির নিজামী ভাই জনসভায় যোগদানকে এড়িয়ে যেতেন বলে '৭০-এর নির্বাচনপূর্ব উল্লেখযোগ্য সংখ্যক জনসভায় ছাত্র প্রতিনিধি হিসেবে আমীরে জামায়াত ও সেক্রেটারী (কাইয়েম) মরহুম আবদুল খালেক র.-এর সাথে আমাকে যেতে হয়েছিল। এ ধরনের এক বড় জনসভা হয়েছিল জয়পুরহাটের পাঁচবিবিতে। প্রধান বক্তা ছিলেন মরহুম আবদুল খালেক র.। সাথে ছিলাম আমি। সভাপতিত্ব করেছিলেন জনাব আব্বাস আলী খান। তখন বয়স তাঁর ষাটের ঘরে। আধা-কাঁচা, আধা-পাকা দাঁড়ি-চুল। কিন্তু সুঠাম দেহ। কণ্ঠস্বরে তারুণ্যের বলিষ্ঠতা। সভাপতির বক্তৃতা দিলেন। ভাষায় উত্তেজনা নেই, আছে বিশ্লেষণের তীক্ষ্ণতা। শব্দ চয়নে অসাধারণ সৌকর্য। ইতিহাস ঐতিহ্যের গভীর শিকড় সন্ধানী হিসেবে বৃটিশ-ভারত মুসলমানদের শিল্প, অর্থনীতি ও সামাজিক অবস্থা ও অবস্থানের করুণ চিত্র তুলে ধরেন। দ্বিজাতিতত্ত্বের ঐতিহাসিক প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে সেদিন তিনি বলিষ্ঠ কণ্ঠে বলেছিলেন ঃ "দ্বিজাতিতত্ত্বই এ ভূখণ্ডের সীমানা, সার্বভৌমত্ব এবং জনগণের আদর্শের রক্ষাকবচ। ভাষাভিত্তিক জাতীয়তা, সেকুল্যার গণতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্রের অসার ও মরীচিকাময় ব্যবস্থার শ্লোগান আমাদের জাতিসত্ত্বা বিনাশে এক মহাব্যাধি বৈ কিছু নয়। সকল অর্থনৈতিক শোষণ, বৈষম্য ও বঞ্চনা থেকে মুক্তির জন্যে ইসলামী জীবনব্যবস্থার বাস্তবায়ন ছাড়া আমাদের সামনে আর কোনো বিকল্প নেই।" তাঁর এ অমোঘ সত্যের উচ্চারণ আজও যেনো স্মৃতির দেয়ালে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। সভাশেষে নিয়ে আসলেন তাঁর জয়পুরহাটের বাড়ীতে। নিজের বিরাট দিঘী থেকে ধরা বড় রুই মাছ দিয়ে মন উজাড় করা তাঁর মেহমানদারীর স্মৃতি ভুলবার নয়। পরিবেশন তিনি নিজেই করেছিলেন।

তখন তাঁকে কি বলে সম্বোধন করেছি, মনে নেই। তবে 'খান সাহেব' বলে তো অবশ্যই নয়। '৮৬ থেকে তাঁকে 'নানা' হিসেবেই তাঁকে সম্বোধন করে এসেছি। তিনি এ সম্বোধনে নারাজ হতেননা বুঝতে পারতাম। বিশাল মাপের নেতা তিনি। উদার ডানা মেলে দিতেন। বড়-ছোট কেউই বোধ হয় ছায়া থেকে বঞ্চিত হতোনা। দু'একটি অকল্পনীয় ঘটনা উল্লেখ না করলে নয়। তিনি ইসলামী ব্যাংকে যেতেন নিজের কাজে। তাও মতিঝিল লোকাল অফিসে। আমি বসতাম দিলকুশায় হেড অফিসে তৃতীয় তলায়। খোলা জায়গায়। একদিন 'আস্সালামু আলাইকুম, কি খবর' পরিচিত কণ্ঠের উচ্চারণে হতচকিত হয়ে দেখি শ্রদ্ধেয় খান সাহেব। মনে করেছি তিনি ব্যাংকের প্রধান নির্বাহীর কাছে এসেছেন। প্রশ্ন করার আগেই ভুল ভাংগিয়ে দিয়ে বললেন, 'ব্যাংকে কাজে এসেছি। ভাবলাম আপনাদের দেখেই যাই । সব সময় তো আসার সুযোগ হয়না।' আমার সামনে বসলেন কিছুক্ষণ। এরপর গেলেন হাবীবুর রহমান ভাইয়ের (বোর্ড সেক্রেটারী) চেম্বারে। কিছু আলাপচারিতার পর বিদায় নিলেন। এভাবে ৯০ সাল পর্যন্ত কয়েকবারই তাঁর এ অপ্রত্যাশিত, অভাবিত

পদচারণা প্রত্যক্ষ করেছি। লজ্জার সাথে সাথে প্রেরণাও পেয়েছি; পেয়েছি এমন প্রশিক্ষণ, এমন 'মাওয়েযাতুল হাসানা'র বাস্তব উদাহরণ - দুর্বলদের জীবনে যার বাস্তবায়ন দুরূহই বটে।

মুহতারাম খান সাহেবের সাথে দেখা করার জন্যে পূর্বাহ্নে সময় নিতে হতোনা; স্লিপ দিয়ে অপেক্ষায় বসে থাকার প্রয়োজন পড়তনা। সাক্ষাৎ প্রার্থী হাজির হয়ে গেলে সে মুহূর্তে খুব ব্যস্ততা না থাকলে সময় দিতেন, কথা শুনতেন। সময় না থাকলে পরবর্তী সাক্ষাতের সময় নির্ধারণ করে দিতেন। বাসায় গেলে তো কাউকে নিরাশ করে ছেড়ে দিতেননা। ওয়ারলেস মসজিদে নামায শেষে কখনো এক সাথে বের হয়ে কেন্দ্রীয় অফিসের সামনে গেলে বলতেন, 'চলুন না, আমার অফিসে এক কাপ চা খেয়ে যান।' তাঁর হৃদয়-নিংড়ানো মহব্বতের এ আহ্বান অবাকই করতো। কিছুক্ষণ একান্ত সান্নিধ্যে বসলে মন ভরে যেতো। প্রেরণায় হৃদয় উদ্দীপ্ত হয়ে উঠতো। 'আছারে সুজুদের' দৃপ্ত অবয়ব চোখকে জুড়িয়ে দিতো। মন খুলে, নির্ভয়ে নিঃশংক চিত্তে তাঁর কাছে সব কথা বলা যেতো। সত্যি তাঁর এ আচরণ ছিলো অনন্য, বেমেছাল বর্তমান এ ব্যস্ততার যুগে।

'৯৫-এর মাঝামাঝি বগুড়া থেকে অফিসিয়াল কাজে জয়পুরহাটে গিয়েছি কাজ সারতে রাত হয়ে গেলো। সার্কিট হাউজে রাত কাটালাম। পরদিন সকালে জানতে পারলাম তিনি জয়পুরহাটে। বাসায় ফোনে যোগাযোগ করতেই জিজ্ঞেস করলেন, 'রাত কোথায় থাকা হয়েছে। 'জবাব শুনে বললেন, 'এখন থেকে Standing দাওয়াত ঃ জয়পুরহাট আসলে আমার মেহমান খানায়ই উঠবেন; খাবেন এখানে। হতবাক হয়ে গেলাম তাঁর পরবর্তী জিজ্ঞাসায়। "আজকের কি ব্যস্ততা?" দেখা হওয়া দরকার, আমি কি ওদিকে চলে আসবো?" না, এটা কোনো হেয়ালির জিজ্ঞাসা নয়। খান সাহেব র. এমনই এক আদর্শ ব্যক্তিত্ব ছিলেন, যিনি ক্ষুদ্রকেও গুরুত্ব দিয়ে প্রমাণ করে গেছেন, তিনি কতো মহত, মহীয়ান ছিলেন।

তাঁর বেগমের ইন্তেকালের খবর শুনে বগুড়া থেকে জয়পুরহাটে ছুটে গেছি জানাযায় অংশ নিতে। জানাযার পূর্বে সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে জীবনসঙ্গিনীর গুণের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে আবেগ আপ্লুত হয়ে কেঁদে ফেলে বললেন ঃ 'সেই ভরা যৌবনে কলিকতায় চাকরি করতাম বৃটিশ সাহেবদের সাথে। কর্মপরিবেশে অনেক মেম সাহেবাও ছিলো। এই মহিলার অসাধারণ গুণ এবং হৃদয়ের আকর্ষণ ঐ পরিবেশে আমাকে সকল স্খলন থেকে বাঁচিয়েছে।' বাদ মাগরিব তাঁর বাসায় দেখা করতে গেলাম। কয়েকজন আত্মীয় এবং প্রতিবেশীকে নিয়ে আলাপ করছিলেন তিনি। ইশারা করলেন। তাঁর কাছে গিয়ে বসলাম। কয়েক মিনিট যেতেই তিনি তাঁর মেয়ে এবং নাতনীদের আওয়াজ দিয়ে বললেন, 'এখন দোয়া হবে, তোমরাও হাত তোলো, মোনাজাত করবেন নুরুল ইসলাম (সাহেব)।' বিভ্রান্ত হয়ে এদিক ওদিক দেখলাম এ নামের অন্য কেউ নেইতো? না অন্য কেউ নেই। নিশ্চিত হয়ে বিস্ময়ের সাথে বললাম, 'নানা আপনার সাথেই আমরা সবাই হাত উঠাবো। বললেন, 'না' আপনি মেহমান দোয়া মেমহানকেই করতে হয়।' আড়ষ্ট স্বরে, কম্পিত মনে হাত উঠালাম।

প্রচ্ছন্ন তৃপ্তিও পেলাম এ অনুভূতি থেকে ঃ জ্যোতির্ময় ওই ব্যক্তিত্বের নির্দেশেই তো হাত উঠিয়েছে, শুভ্র শশ্রু-কেশের যে মানুষকে আল্লাহ নিজেই সম্মান করেন।

রাত কাটালাম তাঁর মেহমান খানায়। ভোরে ফযরের জামায়াত তাঁর ইমামতিতেই পড়লাম। তালিমুল ইসলাম ট্রাস্ট মসজিদে। ট্রাস্টের প্রতিষ্ঠাতা তিনি নিজে। এর পরিচালনায় রয়েছে একটি স্কুল ও কলেজ। একটি লাইব্রেরী। নামায শেষে তাঁর সাথে হাঁটতে বের হলাম। শোনালেন এ ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে তাঁর সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনার কথা। বললেন, 'আমি এই Complexকে এ অঞ্চলে ইসলামী জ্ঞান বিজ্ঞানের একটি কেন্দ্র হিসাবে গড়ে তুলতে চাই। সমাবেশ ঘটাতে চাই এখানে ইমাম ইবনে তাইমিয়া, ইমাম গাজ্জালী এবং শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেলবী থেকে নিয়ে মাওলানা মওদূদী র. পর্যন্ত মহা মনীষীদের গ্রন্থাবলীর, যাতে ইসলামের উন্নত গবেষণার জন্যে সকল মালমসলা নতুন প্রজন্মের উৎসাহীরা এখানেই পেয়ে যায়। তাঁর এ মহৎ আকাংখাকে বাস্তবায়িত করার জন্যে কোনো মহত প্রতিষ্ঠান, বিত্তশালী কোনো ব্যক্তিবর্গ কি এগিয়ে আসবেন?

ত্যাগ কুরবানীর ক্ষেত্রে খান সাহেব র. ছিলেন অনুকরণীয়। 'নিশ্চয় আমার নামায, আমার কুরবানী এবং আমার জীবন ও মরণ সবই বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহরই জন্যে।' অর্ধ শতাব্দীব্যাপী ইসলামী আন্দোলনের কাফেলায় অনড়, অবিচল থেকে নিষ্ঠা, আনুগত্য, ত্যাগ ও কুরবানীর ক্ষেত্রে আল-কুরআনের ভাষায় নেয়া শপথকে তিনি অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবায়িত করে গেছেন। ১৯৯১ সালের আগস্টে মালয়েশিয়ার কেলান্তান রাজ্যে তিনি সফর করেন। কেলান্তানের মুখ্যমন্ত্রী, সেদেশের ইসলামী আন্দোলনের (পাস) নেতা নিক আবদুল আজীজের সাধাসিধে জীবনযাপনের বর্ণনা দিয়ে তিনি লিখেছেন; "তাঁর সিকিউরিটির কোনো ব্যবস্থা নেই এবং কোনো প্রটোকল মেনে চলাও হয়না। ড্রইং রুমে কোনো কার্পেট ও সোফাসেট নেই।" এর আগে আমাদের অবক্ষয়িত সমাজের অবস্থা তুলে ধরে লিখেছেন ঃ "দেখা যায়, ভাগ্যক্রমে কোনো দরিদ্রের সন্তান সরকারী চাকরি পেলে অথবা সংসদ সদস্য কিংবা মন্ত্রী হওয়ার সুযোগ পেলে তার জীবনের মান হঠাৎ বহুগুণে বেড়ে যায়। ফলে বিভিন্ন অবৈধ পন্থা অবলম্বন করে। ইসলামী আন্দোলনের কোনো সদস্য এ ধরনের সুযোগ পেলে তার নিজেকে ইসলামের মডেল হিসেবে পেশ করা উচিত।" (একটি আদর্শবাদী দলের পতনের কারণ ঃ এর প্রতিকারের উপায়।)

২০ বছর আগে তিনি নিজে এ আদর্শ স্থাপন করেছিলেন। তাঁকে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষামন্ত্রী করা হয়েছিলো। অনেকটা জয়পুরহাট থেকে ধরে এনে। ঢাকায় তাঁর কোন বাড়ী ছিলনা। মিন্টু রোডে মন্ত্রীদের বাড়ীগুলো থেকে তাঁকে একটি বাড়ী বাছাই করতে অনুরোধ করা হয়েছিল। সবচাইতে ছোট বাড়ীটি তিনি পছন্দ করে নেন। বাড়ীতে ঢুকেই সব কামরা থেকে কার্পেট সরিয়ে ফেলার নির্দেশ দেন। তাঁকে যখন বলা হলো, এগুলো সরকারী ব্যবস্থা। স্মীত হেসে বললেন, "মন্ত্রীত্ব জনসেবার জন্যে, বিলাসী জীবন যাপন আর ভোগের জন্যে নয়।" শেষ পর্যন্ত সব কার্পেট গুটিয়ে ফেলতে হয়েছিল। তাঁর মন্ত্রীত্বের ১০/১৫ দিনের মাথায় আমি তাঁর

দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললাম, "ঢাকার বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলোতে ছাত্ররা অনেক কষ্টে রয়েছে; নিম্নমানের খাবার তাদের দেয়া হয়। আপনি একবার হলগুলো ঘুরে আসলে অবস্থার পরিবর্তন হতো।' শিক্ষকমন্ত্রী সাথে সাথেই উঠে পড়লেন। মুহসীন হল, জিন্নাহল ও ইকবাল হলসহ কয়েকটি হলের ডাইনিং ও কিচেন পর্যন্ত কয়েক ঘন্টা ঘুরে ঘুরে দেখলেন। দুপুরে খাবার পরিবেশন পর্যন্ত অবস্থান করলেন। ছাত্রদের কথা শুনলেন। কর্তৃপক্ষকে তাঁদের করণীয় সম্পর্কে নির্দেশ দিলেন। এ সময় প্রটোকল ছিল না তাঁর সাথে। ছিলোনা কোনো সিকিউরিটির ব্যবস্থা।

তাঁর মুহতারামা স্ত্রী অচল হয়ে এক যুগেরও বেশী সময় শয্যাশায়ী ছিলেন। থাকতেন জয়পুরহাটের বাড়ীতে। তাঁর কোনো ছেলে নেই। একমাত্র মেয়ে। মায়ের সেবাশুশ্রূষার দায়িত্ব তাঁর উপর ছিলো। খান সাহেব র. বার্ধক্যের এ পর্যায়ে একমাত্র গ্রীনওয়েতে একটি বাসা ভাড়া নেয়ার আগ পর্যন্ত বেশ কয়েক বছর আল-ফালাহ্ ভবনে একটি কামরায় মেসের জীবন যাপন করেছেন। তাঁর পাশের রুমে তাঁরই সমবয়সী আরেক নিবেদিত প্রাণ নায়েবে আমীর জনাব শামসুর রহমান সাহেব থাকতেন। তাঁদের সকালে নাস্তার বাজেট নাকি মাথাপিছু ৫ টাকা ছিলো। খান সাহেব র. এ অবস্থায় একটানা ৯ বছর স্বৈরাচারী সরকারের পতন এবং আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে পরিচালিত আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছেন। সব সময় তাঁর ভূমিকা ছিলো আপোষহীন। পারিবারিক জীবনের কঠিন সংকট, বার্ধক্যের চাপ—কোনো কিছুই তাঁর পথে বাধা সৃষ্টি করতে পারেনি। ছুঁটে বেড়িয়েছেন দেশের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে। মাসে একবার অন্ততঃ শয্যাশায়ী অসুস্থ স্ত্রীর কাছে হাজির হয়েছেন। দু'একদিন পর আবার ময়দানে ফিরেছেন দায়িত্বের রজ্জু টানে। 'হে প্রশান্ত আত্মা! - তোমার রবের অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টির পথে প্রত্যাবর্তন করো'- তিনি এ পথে চলেছেন পূর্ণ প্রশান্তি নিয়ে;...... 'আমারই বান্দাদের কাফেলায় শামিল হও' তিনি শামিল হয়েছেন; অবিচল দৃঢ়তা নিয়েই থেকেছেন; নেতৃত্ব দিয়েছেন। ৩রা অক্টোবরের ওই মুহূর্ত পর্যন্ত যখন শেষ ডাক এসেছে 'আমার জান্নাতে প্রবেশ করো।' হাসিমুখে তিনি চলে গেছেন; কাঁদিয়ে গেছেন লাখ লাখ অনুসারীকে।

সূরা আল-মু'মেনুন এর প্রথম ৯ টি আয়াতে সফলকাম মর্দে মু'মেনের যে জীবন রূপ আল্লাহতায়ালা পেশ করেছেন, তারই নকশায় মরহুম আব্বাস অলী খান তাঁর জীবনকে গড়ে তুলেছেন। ইসলামী আন্দোলনের প্রতিটি কর্মীর জীবনকে একইভাবে গড়ে তোলার প্রত্যাশী ছিলেন তিনি। আন্দোলনের পথ, পদ্ধতি এবং কর্মনীতির ব্যাপারে জামায়াত প্রতিষ্ঠাতা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী র.-এর প্রবর্তিত ধারার এক আপোষহীন মশালবাহী ছিলেন তিনি। তিনি ১৯৯৮ সালের নবেম্বরে মাসিক পৃথিবীতে প্রকাশিত 'একটি আদর্শবাদী দলের পতনের কারণ এবং প্রতিকারের উপায়' - নামক একটি আলোড়ন সৃষ্টিকারী প্রবন্ধে (ডিসেম্বর '৯৮ পুস্তিকা আকারে প্রকাশি) একটি আদর্শবাদী দলের গুণাবলী এবং এর জনশক্তির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী র.-এর চিন্তাদর্শকেই পুনঃরোমন্থন করেছেন এবং ২৫টি দফায় এ আন্দোলনের 'একসূরে' চিত্র তুলে ধরেছেন। তাঁর এ মূল্যায়নকে

নিছক hypothesis হিসেবে না নিয়ে যদি empirical observation এর সিদ্ধান্ত হিসেবেই গ্রহণ করে ব্যবস্থা নেয়া হয়, তাহলে অমিত সম্ভাবনাময় ইসলামী আন্দোলনই উপকৃত হবে। কারণ, অর্ধশতকের চড়াই উতরাই পার হয়ে আসা তাঁর মতো একজন প্রবীনতম, ইতিহাস সচেতন, উন্নত তাকওয়ার অধিকারী এবং ধীশক্তিসম্পন্ন নেতার জন্যে আন্দোলনের hypothical analysis পেশ করার কোনো অবকাশ নেই। পুস্তিকায় ২৫টি দফায় তিনি তাঁর গভীর পর্যবেক্ষণ এবং অন্তরাত্মার তীব্র অনুভূতিরই প্রকাশ ঘটিয়েছেন। যেনো রাব্বুল আ'লামীনের ভাষায় বলতে চেয়েছেন; "ফাজা'বিরু ইয়া উলিল আবছার।"

বর্তমানে জাতীয় জীবনের যে ক্রান্তি লগ্নে আমরা পৌছেছি, সে সম্পর্কে মরহুম খান সাহেব ১৯৯২ সালের ২৯শে ডিসেম্বর জামায়াতের কেন্দ্রীয় রুকন সম্মেলনের উদ্বোধনী ভাষণে জাতিকে সতর্ক করে দিয়েছেন ঃ "..... একাত্তরের শেষে বাংলাদেশ নামে মুসলমানদের একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের অস্তিত্বও ভারত মেনে নিতে পারেনি। কারণ, ব্রাহ্মণ্যবাদী ভারতের বহুদিনের স্বপ্ন অখণ্ড ভারতে 'রামরাজ' প্রতিষ্ঠা। এ কারণেই ভারত চেয়েছিল বাংলাদেশকে তার একটি তাঁবেদার রাষ্ট্র হিসেবে দেখতে।" তাই তিনি সেদিন জাতীয় ঐক্যের ডাক দিয়ে বলেছিলেন ঃ "আজ সময়ের সবচেয়ে বড় দাবী জাতীয় ঐক্য সৃষ্টি করা। জামায়াতে ইসলামীর গোটা জনশক্তির কাছে এবং সকল মুসলমানের কাছে আমার আকুল আবেদন—ঘরে ঘরে ইসলামের বিশ্বজনীন দাওয়াত পেশ করার মাধ্যমে জাতীয় ঐক্য গড়ে তুলুন। এক নতুন শক্তিশালী মুসলিম জাতিসত্ত্বা গড়ে তুলুন। তাহলেই সকল বিদেশী আধিপত্যবাদী শক্তির সকল ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করে একটি সুখী, সুন্দর ও স্বাধীন বাংলাদেশ গড়া সম্ভব হবে।" (লিখিত ভাষণ ঃ পৃঃ ৬.৭)

৭ বছর আগে তাঁর উচ্চারিত সতর্কবাণী জাতি শুনেনি। আমাদের জাতিসত্ত্বা, স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব, ভৌগোলিক অখণ্ডত্ব চরম হুমকির সম্মুখীন। কিন্তু তিনি চলে গেছেন। জাতীয় নেতৃবৃন্দ তাঁর কফিনের পাশে এসেছেন পল্টন ময়দানে; নামাযে জানাযায় অংশগ্রহণ করেছেন; আল-ফালাহ্ ভবনে দোয়া ও আলোচনা সভায় মিলিত হয়ে খান সাহেবের ঐতিহাসিক ভূমিকার স্মৃতিচারণ করে জাতীয় ঐক্য গড়ে তোলার পথকে কাটামুক্ত করেছেন। জাতি প্রতীক্ষার প্রহর গুণছে ত্বরিৎ বাস্তব পদক্ষেপের।

তাঁকে স্মরণ করি

আবুল আসাদ
সম্পাদক, দৈনিক সংগ্রাম

আব্বাস আলী খান সাহেবকে দেখার অনেক আগে তাঁর নাম শুনেছি। নাম শুনেছি আমার আব্বার মুখে। তাঁর আলোচনায় বহুবার শুনেছি, জামায়াতে ইসলামী আধুনিক শিক্ষিতদেরকেও আলেম বানায়, তার একটি দৃষ্টান্ত আব্বাস আলী খান। তিনি ডিগ্রীর দিক দিয়ে বিএ, কিন্তু জ্ঞানে আলেম।

মানুষের কাছে আব্বার এ সার্টিফিকেটের একটা মূল্য ছিলো, কারণ তিনি নিজে একজন বড় আলেম ছিলেন। আর সে সময় আধুনিক শিক্ষিত একজন ইসলামী শিক্ষা ও জ্ঞানে দক্ষ হওয়া একটা বড় বিষয় ছিলো। অনেক নাম শোনার পর প্রথম তাঁকে দেখলাম এক আলোচনা সভায়। তখন আমি সপ্তম অথবা অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র।

তারপর দীর্ঘ দিনের ব্যবধান। ম্যাট্রিক পাসের পর ভর্তি হলাম মহকুমা শহর নওগাঁর বিএমসি কলেজে। সেখানে দু'বছর কাটিয়ে এলাম রাজশাহী। দীর্ঘদিন পর জামায়াতের সাথে আবার সম্পর্কিত হবার সুযোগ হলো। উল্লেখ্য, মাওলানা মওদূদীর রাজশাহীতে আগমন উপলক্ষে অষ্টম শ্রেণীতে থাকাকালে জাময়াতের মুত্তাফিক হয়েছিলাম।

রাজশাহী কলেজে আসার পর জাহানে নওয়ের সাথে নতুন সম্পর্ক স্থাপিত হয়। বাড়ীতে থাকাকালে স্কুল জীবনে জাহানে নওয়ের পাঠক ছিলাম।

রাজশাহীতে আসার পর আমার সাংবাদিক জীবনেরও শুরু হলো। দৈনিক পাকিস্তান ও দৈনিক পয়গামে খবর পাঠানোসহ জাহানে নও-এ নিয়মিত লেখা শুরু করি। পরে 'জাহানে নও'তে আমার আনুষ্ঠানিক সাংবাদিকতা শুরু হয়।

এই ঘটনার কিছুদিন পর আব্বাস আলী খান সাহেব গেলেন আমাদের বাসভবনে। আমার মামা (পরে শ্বশুর) মুসলিম লীগের রাজনীতিক ও এমপি ছিলেন। সেই সূত্রে খান সাহেবের সাথে তার পরিচয় ছিলো। রাজশাহী বিভাগীয় জামায়াতের আমীর ছিলেন তখন খান সাহেব।

খান সাহেব সেদিন আমাকে বললেন, জাহানে নও-এ লেখার সাথে আনুষ্ঠানিকভাবে জাহানে নও-এর সংবাদাতার দায়িত্ব যেনো পালন করি। খান সাহেবের এই বলাটুকুই ছিলো আমার জন্যে তাঁর এক আদেশ। আমি জাহানে নও এর সংবাদাতা হয়ে গেলাম।

এভাবেই আব্বাস আলী খান সাহেব আমাকে আনুষ্ঠানিক সাংবাদিকতায় নিয়ে এলেন।

তারপর বহু বছর পার হয়ে গেছে। সংগঠনের তিনি একজন শীর্ষ নেতা হিসেবে নানা ঘটনায় নানাভাবে তাঁর সংস্পর্শে এসেছি। কিন্তু এ সম্পর্কের বাইরে আরেকটি সম্পর্ক তার সাথে ছিলো। এটা ছিলো দেনিক সংগ্রামের সম্পাদক হিসেবে।

খান সাহেব ছিলেন ব্যস্ত রাজনীতিক। এর মধ্যেও তিনি লেখা পাঠাতেন ছাপার জন্যে। ছদ্মনামে ছাপা হতো। তার লেখা ছিলো সুযোগ মতো নয়, প্রয়োজন অনুসারে। আমি দেখেছি, এমনসব ইস্যু তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করতো, যা অনেকেরই দৃষ্টিতে পরতোনা। আর এমনসব কথা তিনি লেখতেন, যা অন্য কেউ লেখতনা এভাবে। মনে পড়ছে তাঁর সর্বশেষ লেখার কথা। বিষযটা ছিল শাসক দলের এক জুলুমের ঘটনা। যে জুলুম, যে অনাচার কোনো মানুষের সহনীয় বিষয় ছিলোনা। এ বিষয়ের উপর অনেকেই লেখেছেন, নানাভাবে মন্তব্য করেছেন। কিন্তু তিনি যা বলেছেন, অন্য কারও লেখায় তা আমি পাইনি। তাঁর সে লেখার সর্বশেষ অনুচ্ছেদ ছিলো, "এ সরকার তো এই অপরাধীদের কোনো বিচার করবে না। থানায় এসবের বিরুদ্ধে কোনো মামলা করা যাবেনা। কারণ অপরাধীগণ সরকারী দলের লোক ও সরকার সমর্থক। কিন্তু খোদার আদালতে তো মামলা দায়ের হয়ে গেছে। হতভাগা-হতভাগিনীদের বুকফাটা হাহাকার, আর্তনাদ বিফলে যাবেনা।"

ছোট একটা অনুচ্ছেদ এখানে উদ্ধৃত করা হলো। কয়েকটা বাক্য পড়লেই বুঝা যায়, লেখাগুলো শুধু লেখার জন্যে লেখা নয়। একান্ত হৃদয় থেকে উৎসারিত আকুতিপূণ এক স্বগোতোক্তি। যার ঠিকানা মানুষের কোনো থানা নয়, মানুষের কোনো আদালত নয়, কিংবা প্রধানমন্ত্রীর দফতরও নয়, তার ঠিকানা আরশুল আজীমের মালিক আল্লাহ, যাঁর দরবারে মজলুমের কোনো ফরিয়াদই বৃথা যায়না।

আমার জন্যে খান সাহেবের টেলিফোন ছিলো দুর্লভ ঘটনা। টেলিফোনে তাঁর কণ্ঠ পেলেই বুঝতাম তিনি দরিদ্র ও অসুবিধায় পড়া কোনো সাংবাদিকের কথা বলবেন বা অসহায় রোগগ্রস্ত কারও প্রয়োজনের বিষয় তুলে ধরার কথা বলবেন, না হয় বলবেন তার প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোনো বিষয় অথবা লেখা উচিত এমন বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন।

সম্ভবত, মাস তিনেক আগে এ ধরনের সর্বশেষ টেলিফোন আমি তার কাছ থেকে পেয়েছিলাম। সেটা ছিলো একজন অসহায় ও মেধাবী বালিকার দুরারোগ্য ব্যাধির চিকিৎসা বিষয়ক। ব্যাপারটা গুরুত্বপূর্ণ ছিলো বিধায় ছবিসহ ভালো করে ছাপাবার কথা ছিলো। কিন্তু পর পর দু'দিন শেষ মুহূর্তে স্পেস সংকট হওয়ার কারণে আবেদনটি ছাপা যায়নি। তৃতীয় দিনে আবার টেলিফোন করলেন। আমি লজ্জা পেলাম। বললাম তাঁকে ঘটনাটা। তৃতীয় দিনেই সেটা ছাপা হয়ে যায়। আমি ঘটনাটা উল্লেখ করলাম এ কারণে যে, ব্যস্ত জীবন সত্ত্বেও তিনি মানুষের সমস্যা সংকট, দুঃখ দূর্দশার দিকে নজর রাখতেন এবং সাধ্যমত তাদের জন্যে করতেন। আর তাঁর কাজ দায়সারা গোছের ছিলোনা। তার দ্বিতীয় টেলিফোনটি প্রমাণ করে তিনি তাঁর দায়িত্বের কথা ভুলতেননা।

খান সাহেবের মূল্যায়ন কিভাবে হবে, তাঁর জীবনের কোন্ দিকের প্রতি বেশী গুরুত্ব দেয়া হবে আমি জানিনা। কিন্তু তিনি নিজে আল্লাহর সত্যিকার বান্দাহ হওয়ার সাধনাকেই সচচেয়ে বেশী গুরুত্ব দিতেন। শুধু নিজে সিরাতুল মোস্তাকিমে চলা নয়, অন্য সবাইকে সিরাতুল মোস্তাকিমে আনা ছিলো তার মিশন। সে জন্যে তিনি

ইসলামের পথে চলা ও চালানোর ক্ষেত্রে যখন যে সংগঠনকে সর্বোৎকৃষ্ট মনে করতেন, সেটাকেই আঁকড়ে ধরছেন। ইসলামের খাদেম ফুরফুরার পীর সাহেবের তিনি মুরিদ ও খলিফা হন এই লক্ষ্য সামনে রেখেই। আবার পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি তিনি যখন 'জামায়াতে ইসলামীতে যোগদান করেন, তখন মিশন ছিলো এটাই। তিনি তাঁর জীবনের শেষদিন পর্যন্ত জামায়াতে ইসলামীর নেতা হিসেবে আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব পালন করে গেছেন, যে দায়িত্ব পালন প্রতিটি মুসলমানের ফরজ।

খান সাহেব যে সাহিত্যকর্ম করেছেন, তা করেছেন তিনি তাঁর এ দীন প্রতিষ্ঠার দায়িত্বের অংশ হিসেবেই। তাঁর লেখা মাওলানা মওদূদীর জীবনী, 'বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস', 'মৃত্যু যবনিকার ওপারে' গ্রন্থ, সিরাতে সরওয়ারে আলেমের অনুবাদ এবং আরও অসংখ্য অনুবাদ ও সম্পাদনা এরই মহৎ দৃষ্টান্ত।

খান সাহেব ভালো কথা-সাহিত্যিক ছিলেন। তাঁর 'স্মৃতি সাগরে ঢেউ' এবং ভ্রমণ কাহিনী 'বিদেশে পঞ্চাশ দিন' ও 'যুক্তরাজ্যে একুশ দিন' কথা সাহিত্যে তাঁর প্রতিভার প্রমাণ বহন করবে। তিনি গল্প উপন্যাস লেখেননি বটে, কিন্তু তাঁর স্মৃতি কথা 'স্মৃতি সাগরের ঢেউ' এ উপন্যাসের সবকিছুই আছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, সাহিত্য চর্চায় তিনি সময় দিতে পারলে একজন ভালো উপন্যাসিক ও গল্পকার হিসেবে আবির্ভূত হতে পারতেন। দেখতে তিনি ছিলেন খুবই গম্ভীর, কিন্তু কথা ও আলোচনাকালে তিনি ছিলেন প্রাণবন্ত, দিল খোলা। কথায় নির্দোষ রস সৃষ্টি ছিলো তাঁর একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য। যারা তাঁর 'স্মৃতি সাগরের ঢেউ' ও ভ্রমণকাহিনীগুলো পড়েছেন তারা সকলেই এটা উপলব্ধি করেছেন।

খান সাহেব ইন্তেকাল করেছেন। মুমিনের ইন্তেকালও একটা ঘটনা। খান সাহেবের ইন্তেকালের কয়েকদিন আগে তাঁকে দেখতে গিয়েছিলাম। তাঁকে দেখেছিলাম রোগযাতনায় ক্লিষ্ট। কিন্তু কফিনাবৃত তাঁর মরদেহের মুখে দেখলাম ঔজ্জ্বল্য। যেনো তাঁর মুখটা হাসছে। পরম পরিতোষ ও প্রশান্তি সে মুখে।

কথায় আছে 'এমন জীবন তুমি করহ গঠন, মরণে হাসিবে তুমি কাদিবে ভুবন।'

খান সাহেব তাই করেছেন। সকলকে কাঁদিয়ে তিনি হাসিমুখে বিদায় নিয়েছেন।

আল্লাহ তাঁকে কবুল করুন। তাঁকে জান্নাতুল ফেরদাউস নসীব করুন।

আব্বাস আলী খানকে যেমন দেখেছি

মুহাম্মদ সিদ্দিক

নূরানী চেহারার এক বৃদ্ধ সৌম্য শান্ত এক বুজর্গ কাঠমন্ডু বিমান বন্দর থেকে বেরিয়ে আসছেন। পিছনে আরো দু'ব্যক্তি। আমি বুজর্গকে সালাম জানিয়ে বললাম, আমি মুহাম্মদ সিদ্দিক। দূতাবাস থেকে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি।

বুজর্গ চকিত কণ্ঠে বললেন, কোন্ সিদ্দিক? আমি বুঝলাম তিনি আমাকে চিনতে পেরেছেন। আমর ভয় ছিলো যে তিনি হয়তো আমাকে চিনতে পারবেননা। শেষ দেখা হয়েছিল প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর পূর্বে। তিনি তখন ছোট নেতা ছিলেন। এখন এতো বড় নেতা। তাই আমি পুরাতন কিছু বলতে যাইনি প্রথমেই। তিনি বললেন আবার, বগুড়ার সিদ্দিক? আমি বললাম, হ্যাঁ স্যার। তার চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠলো।

আমি যে বুজর্গের কথা বলছি তিনি হলেন মরহুম আব্বাস আলী খান। সেই ১৯৫৫ সালেই তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় বগুড়ার জামে মসজিদে। আমি তখন কিশোর এক ছাত্র। সবে ইন্টারমিডিয়েট পাশ করেছি। আর খান সাহেব হলেন হাই স্কুলের হেড মাস্টার। আমার প্রত্যক্ষ শিক্ষক না হলেও তাঁকে আমি শিক্ষকের মতোই মর্যাদা দিতাম ও 'স্যার' বলতাম।

আমি ছিলাম পড়ুয়া এক ছাত্র। ক্লাশের পড়া ছাড়াও দেশ বিদেশের বই পড়তাম, বই কিনতাম। তাতে সাহিত্য, ধর্ম, বিজ্ঞান, ইতিহাস, কম্যুনিজম সবই থাকতো। বইয়ের খোঁজে খোঁজে খান সাহেবের সঙ্গে যোগাযোগ, কথাবার্তা, অনুপ্রেরণা, উপদেশ সবই পরপর এসেছিল। খান সাহেব আমাকে পড়াশুনায় যে অনুপ্রেরণা জোগান তা ভুলবার নয়। সবে ইন্টারমিডিয়েট পাস করেছি। তখনই খান সাহেবের অনুপ্রেরণায় মাওলানা মওদূদীর লেখা "ইসলামিক ল এন্ড কন্সটিটিউটশন' শীর্ষক বিখ্যাত বই খানার একটি কপি কিনে ফেলি ও পড়তে থাকি। যেহেতু আমাকে তখন দিনাজপুরে যেতে হয় ট্রেনে। আর বইটিও পড়া তখনও শেষ হয় নাই, আমি বইটি সাথে রাখি। ট্রেনের এক কোণে যখন আমি মোটা ইংরেজী বইখানা পড়ছিলাম তখন এক সুবেশ পোশাকধারী ভদ্রলোক আমাকে বললেন, খোকা, তুমি এ বই বুঝ? আমি বললাম, কেন বুঝবো না। তিনি বললেন, কারণ বিষয় ও ভাষা দুটিই কঠিন।

জনাব খান সাহেবের অনুপ্রেরণা আমাকে যে সেই বালক বয়সেই পড়ুয়া বানিয়েছিল তা এখনো রয়েছে বলবৎ। আজও আমি এই যাটোর্ধ বয়সে রাত্রি দুটো পর্যন্ত পড়ি। জনাব আব্বাস আলী খান একজন প্রকৃত শিক্ষক ছিলেন। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনাকালীন ১৯৫৮ সালে তাঁর সঙ্গে সম্ভবত আমার সেই সময় শেষ দেখা। তারপরে এই কাঠমন্ডুর মাটিতে কত বছর পর।

জনাব আব্বাস আলী খান সাহেব তাঁর দুই সহকর্মী মাওলানা আব্দুস সোবহান (তৎকালীন জাতীয় সংসদ সদস্য) ও জনাব কামারুজ্জামানসহ কাঠমন্ডুতে হঠাৎ আগমন করেন ভারত সফর শেষে। দূতাবাস থেকে আমরা চেষ্টা করতাম সরকারী ও বিরোধী সব নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সহযোগিতা করতে। বিশেষ করে উঁচু মানের নেতা বা সংসদ সদস্যদের সম্মানজনকভাবে সহযোগিতা প্রদর্শন করা হতো।

আমি কাঠমন্ডুতে অবস্থানকালীন সময় তাই জনাব খান সাহেবের মতো জনাব আবদুস সামাদ আজাদ, জনাব রাশেদ খান মেনন, জনাব হায়দার আকবর খান রনো, জনাব তারেক জিয়া, মিসেস মমতা ওহাব, চীফ জাস্টিস বদরুল হায়দার চৌধুরী, ডঃ কামাল হোসেন, কবি আল মুজাহিদি , বিখ্যাত গায়ক মোস্তফা জামান আব্বাসী ও আরো অনেক সুপরিচিত ব্যক্তিকে যতোটুকু পেরেছি সহযোগিতা প্রদান করেছি। তবে যেহেতু জনাব আব্বাস আলী খান আমার শিক্ষকতুল্য ও খুবই বৃদ্ধ বুজর্গ ছিলেন তাই আমার শ্রদ্ধাভক্তি একটু বেশীই তাঁর জন্য প্রকাশ পেয়েছিল।

নেপালের মুসলমানদের সম্পর্কে যাতে তিনি ভালভাবে জানতে পারেন তাই তাঁর সফর দলকে আমি কাঠমন্ডুর বিখ্যাত "নেপালী জামে মসজিদ"-এর পার্শ্বে এক হোটেলে নিয়ে যাই যাতে সেখান থেকে তাঁর মসজিদে যাতায়াত সহজ হয়। খান সাহেব কাঠমন্ডু ও আশেপাশে ঘুরে দেখতে চাইলেন। আমি তৎক্ষণাৎ আমার গাড়ীটা তাকে দিলাম ও বললাম, আমি নিজে আপনাকে ঘুরে দেখাবো। তাই আমার গাড়ীতে করে সবাই মিলে বেরিয়ে পড়ি কাঠমন্ডুর বাইরে পূর্বদিকে পাহাড়ী এলাকাতে। উঁচু নীচু পাহাড় দিয়ে গাড়ী ছুটে চলছিল নেপালের সে চমকপ্রদ দৃশ্যে খান সাহেব খুশী হচ্ছিলেন। আমাদের তিনি আঙ্গুল দিয়ে পাহাড়ের মাথার ছোট ছোট গাঁওগুলো দেখিয়ে দিচ্ছিলেন। তাঁর চিবুক চমকাচ্ছিল। বলছিলেন দেখ দেখ ওই গ্রামগুলো, তাঁর মুখে হাসি দেখে আমার ভালো লাগছিল। তিনি যে খুশী হয়েছেন এ সফরে তাতে আমারও খুশী লাগছিল।

কাঠমন্ডুতে খান সাহেব খুব অল্প সময় ছিলেন। তাই বিস্তারিত কোনো কর্মসূচী তিনি নেন নাই। কাঠমন্ডুতে তাঁর সেবায় যে কয়টি ঘন্টা আমি কাটিয়েছিলাম তা আমার স্মৃতিতে সব সময় জাগরুক থাকবে। মনে হচ্ছিল যেনো একজন খাঁটি মুসলমানের সাহচর্যে ছিলাম তখন।

কাঠমন্ডু থেকে চলে আসার পরে একবার সামনাসামনি দেখা হয়; আর ফোনে কথা হয় কয়েকবার। যেহেতু খান সাহেব একজন সাবেক শিক্ষাবিদ ও লেখক তাই আমি তাঁর সঙ্গে আমার লেখালেখি নিয়ে কথা বলতে চাচ্ছিলাম সামনাসামনি। আমার এক ডজনের বেশী বাংলা ইংরেজী পান্ডুলিপি নিয়ে কথা বলতে চেয়েছিলাম তাঁর সঙ্গে। যেহেতু পান্ডুলিপিগুলো ইসলাম ও মুসলিম সম্পর্কীয় তাই তাঁর উপদেশ আমার জন্য খুবই কার্যকরী হতো। একবার এসেওছিলাম তাঁর অফিসে। তখনই তাঁর দলীয় একটি উচ্চ পর্যায়ের সভা থাকায় সাক্ষাৎকার আর হয়ে উঠে নাই। সাক্ষাৎকার হলো পল্টনে তাঁর লাশের সঙ্গে। বললাম, "আল্লাহ তাঁকে তুমি জান্নাতুল ফেরদৌস প্রদান করো।"

জনাব আব্বাস আলী খান সাহেব একজন খোস নসীব ব্যক্তি। ৮৫ বছর বয়স পর্যন্ত তিনি কর্মক্ষম থেকে এক নাগারে ইসলাম ও দেশের সেবা করে গেছেন। বগুড়ার স্থানীয় রাজনীতি থেকে দেশের রাজনীতির শীর্ষে তিনি পৌছেন। জনসাধারণের ভিতর থেকেই তিনি এসেছেন। তাঁর ছিলো মাটির সঙ্গে সম্পর্ক। এছাড়া শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হকের সংস্পর্শে থাকায় তিনি প্রথম জীবনে বাংলা তথা ভারতের রাজনীতি খুব কাছাকাছি থেকে প্রত্যক্ষ করেন। শেরে বাংলা ছিলেন খাঁটি বাঙ্গালী মুসলমান। তাঁর প্রভাবও খান সাহেবের উপর ছিলো। তবে ১৯৫৫ সাল থেকে তিনি মাওলানা মওদূদীর প্রভাবে আসেন। মাওলানা মওদূদীর সাহিত্য যে একবার পড়েছে তার প্রভাব থেকে একজন খাঁটি মুসলমানের বেরিয়ে আসা মুশকিল। মাওলানা মওদূদী এ শতাব্দির এক কালজয়ী প্রতিভা। আল্লামা ইকবাল পর্যন্ত যুবক মাওলানা মওদূদীর ভক্ত হয়ে পড়েছিলেন।

জনাব আব্বাস আলী খান একজন শক্তিশালী লেখক। তাঁর অনেকগুলো বইয়ের ভিতর "বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস" একটি বিখ্যাত বই। এটি লিখে তিনি বাংলার মুসলমানদের একটি বড় খেদমত করে গেছেন। একজন সাবেক শিক্ষাবিদই পারেন এমনি একটি প্রয়োজনীয় বই রচনা করতে।

জনাব আব্বাস আলী খান ছিলেন একজন খাঁটি বাঙ্গালী মুসলমান ও একজন খাঁটি বাংলাদেশী। তিনি ছিলেন একজন সত্যিকারের দেশপ্রেমিক যাঁর শেকড় এদেশের মাটিতেই। সাদাল্যাপি, জ্ঞানী এই বুজর্গ ব্যক্তিত্বের অভাব জাতি চিরদিনই অনুভব করবে।

মৃত্যুহীন প্রাণ

তুমি চেয়েছিলে কুরআনের দিন

মতিউর রহমান মল্লিক

তুমি চেয়েছিলে আল্লাহ'র দীন, কুরআনের দীন মনে-প্রাণে,
নাস্তিকতার-অমানবতার চির পরাজয় সবখানে,
লড়ে গেছো তাই তুমি অবিরাম সকল শক্তি দিয়ে তুমি,
তোমাকে রুখতে পারেনি বাধার পাহাড় অথবা মরুভূমি।

তোমার স্বপ্নে মুক্তির দিন উজ্জ্বল হয়ে দিলো দেখা,
তোমার কর্মে মহাজীবনের মানচিত্রই হলো আঁকা,
তোমার যত্নে উদ্দীপনার সকল শষ্য দিকে-দিকে,
তৎপরতার পটভূমিকায় নতুন কাহিনী গেলো লিখে।

নিয়ম মান্য করে চলা যায়-তার জ্বলন্ত উপমাতে,
উজ্জ্বল ছিলো তোমার জীবন নেই সন্দেহ কোনো তাতে,
সময় জ্ঞানের দিক থেকে তুমি প্রবাদতুল্য ছিলে প্রিয়,
নামাযে-রোযাতে-দোয়া-এবাদতে ছিলে নেতা অনুকরণীয়।

মেহমান পেলে খুশী হতে তুমি বেজার হতে না কখনো তো,
হাস্যরসের সংগে তোমার আতিথেয়তার ছোঁয়া সবাই পেতো,
তোমার স্বভাব-আচরণে ছিলো বড় মানুষের গুণপনা,
ঢাকা থেকে কাবা সবখানে সেই অন্তরঙ্গ আলোচনা।

এই ভাবে বলো কয়জনে পারে নিজেকে বিলাতে নিঃশেষে,
জীবনের পথে, জিহাদের পথে, আল্লাহ'র পথে হেসে-হেসে,
স্বার্থ-লোলুপ সমাজে তোমার উপমা কোথায়? মেলেনা যে,
সুবিধার পথে ভুলেও কখনো তাই হে মহান গেলে না যে।

ভুলেও গেলে না স্বার্থের পথে, সুযোগের পথে হে দিলীর,
জানাযার মত ফরজে কেফায়া জেহাদ—কে বলে সশরীর,
'মিইয়ারে হক' রসূলে খোদাকে মেনে নিয়ে প্রিয় তাই তুমি,
জেহাদের পথে সিপাহ্সালার পাড়ি দিয়ে গেছো মরুভূমি।

রক্তচক্ষু পরোয়া করোনি, পরোয়া করোনি স্বৈরাচার,
ফুটো পয়সার দাওনিতো দাম শাসকের শত বৈরিতার,
বজ্রকণ্ঠে ধরেছো আওয়াজ বয়সের ভার মাননি হে,
জালিমের বুকে তুলেছো কাঁপন কারো ভয় তুমি করোনি যে।

রাজনৈতিক অঙ্গনে আজ চলছে কতোই বেচাকেনা,
সকলেই জানে সে-সব খবর সে-সব খবর কে জানে না,
খোদাভীরুদের যায়নাকো কেনা সকলেই রাখে সে-খবর,
তুমি ছিলে নেতা তাদের দলেও কেউ নয় তায় বেখবর।

তোমার চলার ভঙ্গিতে ছিলো ব্যক্তিত্বের ছাপ তাজা,
তা দেখে রসিক লোকেরা বলতো, দেখো যায় ঐ মহারাজা,
গম্ভীর তবু মধুর হাসির জনগণপ্রিয় লোক তিনি,
হারিয়ে গেলেন ঢেলে দিয়ে বুকে বিরহের শত শোক তিনি।

তুমি নেই বলে কেঁদে ওঠে ঢাকা, কান্নার শোর, সারাদেশে,
তোমারে হারায়ে মহাজনতার কান্নার স্বর ভেসে আসে,
কাঁদে নদী কাঁদে, কাঁদে নিসর্গ বিশ্বাসীদের ঘরবাড়ী,
পল্টন থেকে জয়পুরহাট অশ্রুতে যায় গড়াগড়ি।

গোপনে কাঁদেন রাজনীতিবিদ ভক্তরা কাঁদে সরাসরি,
ঈমানদারেরা ঝরায় অশ্রু একেএকে করে জড়াজড়ি,
করিরাও কাঁদে কি এক ব্যাথায় কবিতার বই ফেলে রেখে,
জ্ঞানীগুণী কাঁদে হারায়ে তাপস জ্ঞানের আসন খালি দেখে।

সকল কিছুর ঊর্ধ্বে তবুও মর্দে মুমিন ছিলে তুমি,
সর্ব-ওপরি ছিলে মুজাহিদ অকুতশংকা সংগ্রামী,
সাক্ষ্য দিচ্ছি দিয়ে গেছো তুমি তোমার সকল শ্রমমেধা
আল্লাহ'র পথে কুরআনের পথে ওগো আমাদের প্রিয়নেতা।

তুমি যে, পথের মুসাফির ছিলে আমরাও যেনো সেই পথে,
শ্রমমেধা দিয়ে ছুটে যাই শুধু, পিছপা না-হই কোনো মতে,
তোমার স্বপ্ন সফল করার বোঝা বয়ে যাই সারাবেলা,
জান্নাত হতে এই দোয়া করো, এই দোয়া চাই সারাবেলা।

(সংক্ষেপিত)

(১৯ অক্টোবর '৯৯ জাতীয় প্রেসক্লাবে সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রিসার্চ একাডেমী আয়োজিত 'আব্বাস আলী খান স্মরণ সভায় পঠিত)

অনন্ত শয্যায়

গোলাম মোহাম্মদ

বরফের অনন্ত শয্যায় উদ্বেগহীন
কি গভীর ঘুমের মধ্যে ডুবে ছিলেন তিনি
আবার মনে হচ্ছিল এখনই কথা বলে উঠবেন।

বাংলাদেশের সমস্ত প্রান্তর ছুটে ছুটে এই মুজাহিদ
কত জাগরণের শব্দ সাজাতেন সংগ্রামের;
আল-কুরআনের এই নিমগ্ন অনুসারী
জিহাদের জজবায় কত উন্মুখ ছিলেন।

৫০৫-এর শীতল কক্ষে বেদনার পাথর
মনে হচ্ছিল সবার মুখ, কান্নায় ভেঙে পড়া,
মগবাজার, পল্টন, বাংলাদেশ,
আর তিনি নীর যাত্রার মগ্নযাত্রী।

এই তো ক'দিন আগে এই মঞ্চে পল্টনে
সেই কালের সাক্ষী আমাদের কালান্তরের চিত্রগ্রন্থ উল্টে উল্টে দেখালেন
কে জানতো সেই মঞ্চেই এ শীঘ্রই তার স্মৃতির আসর বসবে।
ইতিহাসের কালক্রম, নৃবিজ্ঞান, পুরাকীর্তির উত্তম পাঠক ছিলেন তিনি।

যে ফুলের স্বপ্নের জন্য তিনি জেগে থাকতেন
তার ভালোবাসা ছিল, সংগ্রাম ছিলো-
সেই শাহাদাতের প্রস্বর মুহতারাম!

জান্নাতের সেই সবুজ পাখি,
আপনার স্বপ্নের মত এই যমীন
আল্লাহর দীনের সৌঘ্রাণে ভরে উঠবে
শাহাদাতের নাজরানায়, শোভিত হবে এই মৃত্তিকা-
স্রোতস্বিনী, বসবাস জীবনযাপনের সূত্রগুলো।

আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি - আপনার ক্লান্তিহীন নিবিষ্টতায়
এখানে দীনের আলো উচ্চকিত হয়েছে
সবুজ ডানার পাখি -
আল্লাহ আপনাকে জান্নাতুল ফেরদৌস দান করুন।

একটি জীবন একটি ইতিহাস

গোলাম হাফিজ

একটি জীবন দিয়ে তিনি কিনতে চেয়েছে জান্নাত
দুঃখ যন্ত্রনা পায়ে ঠেলে হেঁটেছেন মুজাহিদ।
ভাঙ্গা কাঁচের টুকরো ছড়ানো রাস্তা দিয়ে নিত্য চলেছেন
বিচিত্র ব্যস্ততায়।
মুঠি মুঠি আলো ছড়ায়েছে দু'হাতে
কেটেছে আধারের বাঁধ মধ্যাহ্ন সূর্যের মতো।
বর্বর শীর্ণ শকুন আর বিপন্ন কাকেরা
করেছে শ্রীহীন ভ্রূকুটি।
বিষাক্ত সাপেরা দেখায়েছে জিহ্বা।
অকুতোভয় দুর্জয় সে বৈশাখী ঝঞ্ঝার মতো
উড়ায়েছে পথের আবর্জনা।
নাস্তিক খোদাদ্রোহীদের খুলেছে মুখোশ।

একটি জীবন দিয়ে তিনি ফোটাতে চেয়েছেন হাসি
তাই তো ছুটেছেন টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া,
ছাপ্পান্ন হাজার বর্গ মাইল, জনতার পাশে।
যখন যৌবনের উগ্র স্পর্ধা নিবু নিবু
যখন নরম বিছানায় ঘুমানোর কথা
যখন পরজীবী বৃক্ষের মতো অন্যের ঘাড়ে ঝোলার কথা
তখনো সে সিপাহসালার
দূরন্ত ছুটেছেন স্নিগ্ধ সবুজ বাংলার মাঠে।
এইতো সেদিন-
হার্ডিঞ্জ সেতুর নীচে হাড্ডিসার পদ্মার কংকালে দাঁড়িয়েছেন
গড়েছেন দুর্বার আন্দোলন, চেয়েছেন পানির ন্যায্য হিস্যা।
মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠায়
বঞ্চনাহীন সমাজ প্রতিষ্ঠায়
স্বৈরাচারের ব্লাকহোল থেকে তুলে এনেছেন
একটি দুঃসাহসী দুর্বিনীতি মিল্লাত।

অবশেষে একদিন—
সকল লেনদেন সাঙ্গ করে ঘুমালেন তিনি।
সময়ের কফিনে জমা হলো একটি ইতিহাস।

সুবর্ণ পুরুষ

ইসমাঈল হোসেন দিনাজী

সাহেব পাড়ার অন্তিম শয়ানে হে সুবর্ণ পুরুষ
সেদিন পল্টনে প্রত্যাশিত পুষ্পবৃষ্টি হলো,
পরম প্রভুর সান্নিধ্যে সমর্পিত হলে তুমি
অকৃত্রিম ভালোবাসায় গণ্ডদেশ সিক্ত হলো আমাদের।

মনে হলো প্রখর নিদাঘে সরে গেলো মেঘ
উত্তপ্ত হলো সোঁদামাটি সবুজ ফসলে
ভয়ংকর শূন্যতায় ভরে গেলো পোয়াতী ডাহুকের বুক
ক্ষণিকের জন্য থেমে গেলো দখিণের হাওয়া
স্তব্ধ হলো প্রণয়ী ঘুঘুর ললিত কণ্ঠ
থেমে যেতে চাইল যমুনা-ইরাবতীর স্রোত।

পল্টনের নিযুত জনতা বগুড়ার বনানীতে
নিশি জাগানিয়া মানুষের ঢল
জয়পুরহাটের সব মানুষের ভালোবাসা-শ্রদ্ধা
প্রমাণ করলো তুমি কত মহান এবং মর্যাদার!

তোমার সমাধি জান্নাতের টুকরায় রূপান্তরিত হোক
পুষ্পের ঘ্রাণ ছড়িয়ে পড়ুক হাওয়ায় হাওয়ায়।

আপ্লুত হৃদয়ের মতো

আহমদ বাসির

সীমাহীন শূন্যতার মাঝখানে মেঘেরাও সেদিন
কাতারবন্দী হয়ে আপনার জানাযায় অংশগ্রহণ করার
অপেক্ষায় ছিলো আমাদের মতো
লাখো লাখো সজল চোখের গভীরে
কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘুরতে ঘুরতে এক সময় হারিয়ে গেল।
সীমাহীন চরাচরের কতটুকু ধারণ করতে পারি আমরা।
আপনার জন্য অহংকারের যে চান্দি বিছিয়েছি মহাশূন্যে
তার একটা অংশও সম্পূর্ণ অধিনস্ত করতে পারে না
এই চোখ দু'টি-
সে আর কতটুকু ভূ-মণ্ডল দেখবে।

খেলাঘর ভেঙ্গে পড়া হাহাকার আপনাকে
কোনদিন স্পর্শ করতে পারেনি।
অসংখ্য ভয়াবহ অন্ধকারের মধ্যদিয়ে
যে পথরেখা স্থাপন করেছেন
আর যে মোহন সুরের সন্ধানে মোহবিষ্ট
গভীর রাতের সাধনার পটভূমে
বিচরণশীল আপনার ঐশ্বর্য
সর্বত্রই একটি স্বপ্নাচ্ছন্নতার শিহরণে
আমাদের ভাব ভাবনাগুলো কেঁপে কেঁপে ওঠে
আপ্লুত হৃদয়ের মতো, অভিনব পরিচ্ছন্নতায়।

বিংশ শতাব্দীর একটি গোলাপ

মুহাম্মদ সাইদুজ্জামান

বিংশ শতাব্দীর পূর্বরাগে
ফুটেছিল একটি গোলাপ
নয়কো এ মোটেই প্রলাপ
জয়পুর হাটের গুলবাগে।

নিরানব্বই-র প্রান্তে এসে
দেশবাসীর প্রাণের আশা
ভেঙ্গে গেলো আশার বাসা
রাজ প্রাসাদ পড়লো ধ্বসে।

বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী
বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ
ইসলামী রাষ্ট্রের উম্মীদ
গ্রন্থ, ইতিহাস রচনাকারী।

আদর্শ শিক্ষক সিপাহ্সালার
'প্রেরণার উৎস' ও নির্ভীক
প্রদীপ শিখা আধ্যাত্মিক
উজ্জীবিত ইসলামী নীতিমালার।

আজীবন চেয়ারম্যান মওদূদী রিসার্চ একাডেমী
নিয়োজিত সব সাধনা ধ্যান

সমাজ সেবী মানব-প্রেমী
প্রতিষ্ঠাতা তালিমুল ইসলাম একাডেমী।

'বাংলার মুসলিম ইতিহাস'
রচনা-'স্মৃতি সাগরের ঢেউ'
জীবদ্দশায় বুঝলোনা কেউ
নিয়তির এমনই পরিহাস।

আশান্বিত দিগ্বিজয়ী সিন্দাবাদ
জীবনের শেষ প্রহরে
'মৃত্যু যবনিকার ওপারে'
ইসলামী রাষ্ট্রের স্বপ্ন-সাধ।

দীনের মূর্ত প্রতীক মহৎপ্রাণ
ভারপ্রাপ্ত জামায়াত নেতা
আল্লাহ্-ভীরু স্বাধীন চেতা
মরহুম আব্বাস আলী খান।

টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া
সাতক্ষীরা থেকে উখুলিয়া
একটি আন্দোলন একটি নাম
বাগে ফিরদাউসে হোক্ মাকাম।

একটি প্রাসাদ নির্মিত হবে
আলমগীর হুসাইন

একটি প্রাসাদ নির্মিত হবে।
বিশ্বাসের ভিত এবং এই স্তম্ভগুলো
অর্থাৎ এইযে পাঁচটি খুঁটি ঠিক এরই উপর
পাঁচতলা ভবন নির্মিত হবার কথা ছিলো,
বহুতল ভবনের আঁততায়ী অন্ধকার
প্রকোষ্ঠের পরতে পরতে
পৃথিবীর বাসিন্দারা যখন দারুন স্বেচ্ছাচারী
নিদারুণ নিরাপত্তাহীন
ঘরহীন দোরহীন সুনিবিড় ছায়াহীন অবিশ্বাসী প্রাসাদের নীচে
রোদহীন বৃষ্টিহীন
অচল মুদ্রার মতো নিরস যাদের জীবন যাপন

একান্ত তাদের জন্য।
একটি প্রাসাদ নির্মাণ বড় প্রয়োজন ছিলো,
ঘামের বদলে ঘাম রক্তের বদলে রক্ত
এবং শব্দের বদলে শব্দ দিয়ে
তাইতো জীবনের এই পড়ন্ত বিকেলেও
অনেক অ...নে...ক চড়া দামে
খরিদ করেছিলেন এক একটি আকিক পাথর
রড সিমেন্ট কাকর-বাকর ইট সুরকি বালি
এবং স্বয়ং প্রকোশলীর প্রাসাদ নকশা
আর একদল বিশ্বাসী শ্রমিক,
অতঃপর একটি মাত্র বদলি নোটিশে
কোনো এক আদর্শ পিতার আনুগত্য প্রিয় বৎসের মতো
স্বদেশে ফিরে গেলেন স্বয়ং প্রকৌশলী,
অথচ অসম্পূর্ণ আয়োজন নির্মাণাধীন ভবন
সবই তো পড়ে আছে
শুধু প্রয়োজন একজন প্রকৌশলীর
আপনার মতো প্রাণবন্ত একজন নির্মাতার॥

একটি নক্ষত্রের পতন

মোহাম্মদ মোজ্জাম্মেল হক

হেরার জ্যোতি হতে উৎসারিত
একটি ঈমানী পর্বতের সুঠাম শৃংগ
পরিণতির ব্যাপ্তিতেই অকস্মাৎ ধ্বসে গেলো।

বসরাই গোলাপের চেয়েও সুখ্যাত একটি রক্তিম গোলাপ
বাংলার শ্যামল মাটিতে ঝরে পড়লো।

কিংবা নীল আকাশের লক্ষ কোটি তারা হতে যেনো
একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র দৈবাৎ অন্তর্হিত হলো।

আর সাথে সাথে আমাদের
ফুল ফোটা পাখি ডাকা মুখর নিসর্গ স্তব্ধ হলো
শোকের তুমুল ঝড়ে এবং
তমিস্রায় আচ্ছন্ন হয়ে গেলো সবদিক।
সব কিছু তছনছ অবিন্যস্ত, মানুষের মন

কিংবা লক্ষ লক্ষ মানুষের চোখের আকাশ থেকে
অনর্গল বেদনার বৃষ্টিপাত হতে থাকলো।

আজ আমরা সেই শৃংগ, সেই পতাকা
কিংবা সেই গোলাপ, সেই উজ্জ্বল নক্ষত্র হারিয়ে
শৃংগহীন, পতাকাহীন, গোলাপহীন, নক্ষত্রহীন হয়ে পড়লাম।

একজন সাহসী নিশান বরদার
একজন দুর্দিনের অকুতভয় সিপাহসালার
একজন গোলামে রাব্বানী-আশেকে রাসুল
দেশ ও জাতির ক্রান্তিকালের দিক নির্দেশক একটি বুলবুল
হারিয়ে, বড় দুঃসময়ে আমরা এতিম হলাম।

যার শূন্যতা কোন দিন পূরণ হবেনা।
যাকে আমরা আর খুঁজে পাবোনা, যার কণ্ঠ ধ্বনিতে
বাতিলের বালাখানা আর কাঁপবেনা।
তাই আমাদের অন্তিম প্রার্থনা ঃ
হে আমাদের রব! আপনি তাকে জান্নাতুল ফেরদৌসে
করে দিন তার শান্তির শেষ ঠিকানা...।

মৃত্যুহীন প্রাণ

আতিয়া ইসলাম

একটা লোকের মৃত্যুতে আর
          কত্তোখানি দুঃখ
নিজ মনের বায়নাখানাই
          সবার কাছে মুখ্য!

যিনি গেলেন তিনি জানেন আর
          সব জ্ঞানীরাই জানেন
'পরকালের হিসেব-নিকেশ
          আসল কথা' - মানেন।

মৃত্যু এলো স্মরিয়ে গেলো
          সময় বেশী নাই
তবু কি আর আমরা অধম
          ভাবার সময় পাই?!

এই কেঁদেছি, কাঁদবো আবার
ফায়দা কিছু নাই
কান্না মুছে আবার কেমন
ভুলের দিকেই যাই!!

জীবন-মোহের মায়ায় পড়ে
জীবনটুকুই নষ্ট
সাময়িকের তেষ্টাতে হায়
চিরস্থায়ী কষ্ট!

(সন্ধ্যা সাতটা/৩ অক্টোবর ১৯৯৯ইং)

আপনি চলে গেলেন মাওলার ডাকে
মোঃ আব্দুল হাকিম

হে মহান বন্ধু, জ্ঞানের তাপস,
দীনের অতন্ত্র প্রহরী, সত্যের সাধক,
আপনি চলে গেলেন মাওলার ডাকে।
আমরা শোক বিহ্বল
আমাদের মাঝে আজ আপনি নাই
আপনার চির আকাঙ্ক্ষা ইসলামী সমাজ
এই লক্ষ্য ঘিরে আপনার
কত সাধনা সংগ্রাম,
সবই জ্বল জ্বল ভাসছে
স্মৃতির পাতায়,
আপনার ক্ষুরধার লেখনী
তিমির সরায়
ইসলামী আন্দোলনে সাহস জোগায়।
জাগায় দেশাত্মবোধ
অন্যায় ঘৃণা
তাগুতের বিরুদ্দে দ্রোহের আগুন
ন্যায়ের প্রতি প্রেম-ভালবাসা।
মাওলার দরবারে নিবেদন করি
আপনি পান যেন মাগফিরাত
পরকালের ঘাঁটিগুলো
হন যেন সহজেই পার
নবীর মহব্বত, মাওলার দিদার।

উদ্বেগহীন প্রাণ

আবু বকর সিদ্দিকী

শাপলা ফুল শরৎ কামিনী কুঞ্জ বর্ষতি শীতের প্রলেপ
শরতের বর্ষণ সিক্ত শিউলী ফুলের পাপড়িরা ঝরছে;
ঝক্ঝকে সাদা কাশফুল সূর্যের দীপ্ত কিরণে দুপুর স্তব্ধ
পচাঁসিঁড়ি শরৎ পেরিয়ে মধ্যাহ্নে অপ্রত্যাশিত ঝড়;

ঝরে পড়ল একটি ফুল; 'এন্তেকালা ইলা রাহমাতিল্লাহ্'
মুহূর্তে বিশ্বময়, উচ্চারিত ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন।
দিবারাত্র যুগান্তর স্রষ্টার সৃষ্টি বিয়োগান্ত অমোঘ ঘোষণা
প্রকৃতির মুখ গোমরা হলো আকাশ মেঘলা হলো নামলো আঁধার
তাণ্ডব ঝড়ে কেড়ে নিল বসন্তের পলাশ কাল বৈশাখী ঝড়।

অনির্বাণ

মুঃ নুরুল্লাহ

সত্যের কথা লিখে আর সত্যের কথা বলে
বাতিলকে দলে আর সত্যের পথে চলে
জীবন কাটিয়েছেন যিনি
আজ বিদায় নিয়েছেন তিনি।

পথে-প্রান্তরে আর্তচিৎকারে ভারী বাতাস
দুঃখ-বেদনায় আক্রান্ত বাংলার যমিন ও আকাশ
দল মত নির্বিশেষে আজ সকলেই শোকাহত
ধনী-গরীব পেশাজীবী, বুদ্ধিজীবী মানুষ আছে যত।

কেউ বলেন তিনি মরেছেন, চলে গেছেন
মৃত্য যবনিকার ওপারে
এতিমের মত অসহায় জাতি আজ
নিপতিত ঘোর আঁধারে।

আমি বলি তিনি তো মরেননি, এখনো আছে
জ্বেলে গেছেন শিখা অনির্বাণ

বিশাল সাহিত্য ভান্ডার আলো ছড়াবে যার
তিনি তো আব্বাস আলী খান।

আব্বাস আলী খান

মুহাম্মদ কামারুজ্জামান

আব্বাস আলী খান
মুসলিম মুজাহিদের নাম,
ইসলামের বীর সেনা
দেশবাসী সবার জানা।

১৯৯৯ ৩রা অক্টোবর
হলো বিদায়ের খবর।
কোনো দিন আসবেননা,
বক্তব্য আর রাখবেননা।

সময়ের উপযোগী লিখা
বইপত্রে দেখা
মুমিনের প্রিয় পাত্র
তাগুতের জ্বলে গাত্র।

অনির্বাণ

তাহেরুল ইসলাম

জ্ঞান তাপস তিনি খোশ নসীব অতি
অনুগত ছিলেন সদা আল্লাহ্‌র প্রতি।
করেননি তিনি ক্ষমতার অপব্যবহার,
দীক্ষা দিলেন, উচুঁ নিচু সবে একাকার।
ইনসাফ প্রতিষ্ঠায় ছিলেন বজ্রের মতো,
ইসলামী হুকুমাত কায়েমই ছিলো তাঁর ব্রত,
জীবন সায়াহ্নে করেছেন, ঐক্যের আহ্বান,
তাঁর কর্ম জোগাবে প্রেরণা অনির্বাণ।
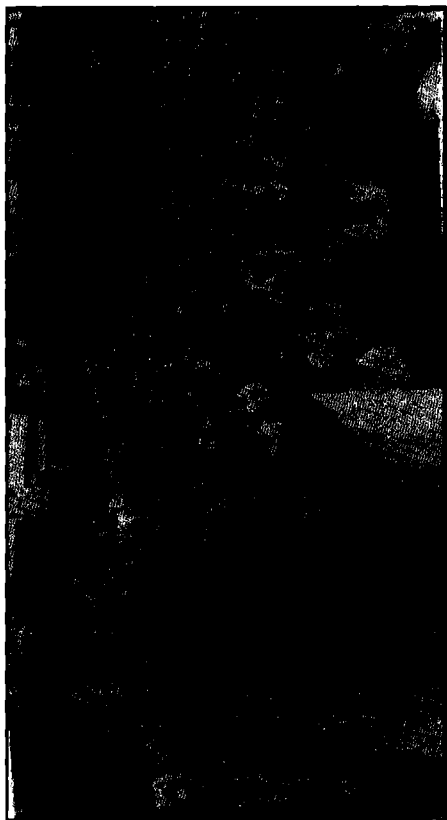
স্মৃতির বাতায়নে

সত্যের পথের সহযাত্রীদের কলম থেকে

ইসলামী আন্দোলনের পথে কেন্দ্রে ও সারাদেশে ছড়িয়ে আছেন মরহুম খান সাহেবের অসংখ্য সহযাত্রী, বিভিন্ন পর্যায়ের দায়িত্বশীল। এ অধ্যায়ে কয়েকজন বর্তমান ও প্রাক্তন দায়িত্বশীলের প্রাণাবেগ বিজড়িত স্মৃতি ও অনুভূতির কথা লিপিবদ্ধ হলো। - সম্পাদক

এক নিবেদিত প্রাণ সৈনিকের তিরোধান

হাফেজা আসমা খাতুন

হাফেজা আসমা খাতুন জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের একজন কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। ইতোপূর্বে দীর্ঘদিন তিনি জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ-এর মহিলা বিভাগের সেক্রেটারীর দায়িত্ব পালন করেন। তাছাড়া তিনি ছিলেন জামায়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে জাতীয় সংসদের সম্মানিত সদস্যা (এম.পি.)। এ লেখায় মরহুম খান সাহেব সম্পর্কে তাঁর অনুভূতি আলোকিত হয়েছে। - সম্পাদক

ইসলামী আন্দোলনের অকুতোভয় সিপাহসালার, আমাদের প্রাণপ্রিয় দীনি ভাই, মরহুম আব্বাস আলী খান আর ইহজগতে নেই। যখনই মনে হয়, প্রাণটা মোচড় দিয়ে উঠে। চোখের পানি কিছুতেই রোধ করতে পারি না, মনে হয় যেনো আন্দোলনের একটা দিক খালি হয়ে গেছে। কোথায় কি যেনো এক বিরাট শূন্যতা সৃষ্টি হয়েছে। লেখতে গিয়েও চোখের পানিতে লেখতে হচ্ছে।

আমি জানি মরহুম আব্বাস আলী খান যতোদিন আল্লাহপাক ইচ্ছা করেছেন, তাঁর দ্বারা দীনের, খেদমত নিয়েছেন এবং মহান রাব্বুল আলামীনের ইচ্ছায়ই দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন। আমাদেরকেও তার ইচ্ছায়ই দুনিয়া থেকে এক দিন বিদায় নিতে হবে। তারপর কেন এই চোখের পানি? তাঁর সাথেতো আমাদের কোন আত্মীয়তার বা রক্তের সম্পর্ক নেই। তাহলে ব্যাপারটা কি? তা হচ্ছে দীনের মহব্বত। যার মূল্য আল্লাহপাক আমাদেরকে অবশ্যই দান করবেন।

মরহুম আব্বাস আলী খান ছিলেন ইসলামী আন্দোলনের একজন একনিষ্ঠ নিবেদিত প্রাণ সৈনিক, বলিষ্ঠ নেতৃত্ব। ইসলামী আন্দোলনের ঘোর দুর্দিনের কঠিন কঠিন সময়ে দৃঢ়তার সঙ্গে তিনি ইসলামী আন্দোলনের হাল ধরেছেন। আমীরে জামায়াতের ১৬ মাস জেলে থাকাকালীন সময়ে তিনি জামায়াতে ইসলামীর ভারপ্রাপ্ত আমীরের দায়িত্ব পালন করেন অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে।

তিনি গভীর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। তিনি ছিলেন একাধারে একজন সাহিত্যিক, লেখক, গবেষক এবং বাগ্মী। সর্বোপরি তিনি ছিলেন একজন সর্বজন শ্রদ্ধেয় নেতা। অনেক মূল্যবান বই তিনি রচনা করে গেছেন। তাঁর লেখা "জামায়াতে ইসলামীর ইতিহাস" "মাওলানা মওদুদী র. একটি ইতিহাস একটি" ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের জন্য প্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে। এছাড়াও তিনি অনেক গ্রন্থ রচনা করেছেন। জীবনের শেষ মুহূর্তে কঠিন অসুস্থ অবস্থায়ও ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের দিক নির্দেশনা দিতে ভুল করেননি। তার শেষ লেখা "একটি আদর্শবাদী দলের পতনের কারণ" বইটি ইসলামী আনেদালনের কর্মীদের জন্য মাইল ফলক

হয়ে থাকবে বহুকাল ধরে। তার লেখা "মাওলানা মওদূদী র." বইটি পড়েই তাবলীগের এক বোন, যিনি পরবর্তীতে জামায়াতের একজন একনিষ্ঠ দায়ত্বশীলা ছিলেন, মিসেস গোফরান, জামায়াতে ইসলামীতে যোগদান করেছিলেন।

আমার স্পষ্ট মনে পড়ে, ১৯৭৯ সালের মে মাস। সদ্য জামায়াতে ইসলামী মহিলা বিভাগের দায়িত্ব আমার উপর অর্পিত হয়েছে। আমি ঢাকার আনাচে-কানাচে একজন ইউনিট দায়িত্বশীলার মতো নতুন নতুন ইউটি গঠন ও পরিচালনার দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছি।একদিন মিসেস গোফরান আমার বাসায় এসে হাজির। তিনি তখন তাবলীগের একজন সমর্থক। তিনি এসে বললেন, "আমি নিয়মিত তাবলীগে যাই। তাবলীগও ভালো। কিন্তু আমার মনটা যেনো ভরেনা। আপনারা জামায়াতে ইসলামীতে কি কাজ করেন? আমি আগে তাঁকে কোনোদিন দেখিনি। কিন্তু তাঁর কথাগুলো স্পষ্ট মনে পড়ে। আমি তখন সদ্য মাওলানা মওদূদী র. বইটা পড়ে শেষ করেছি। বইটা শুধু মাওলানার জীবনী নয়। বইটা একাধারে ইসলামী আন্দোলনের দিক নির্দেশনাও। আমি মিসেস গোফরানকে বললাম, আমি আপনাকে এই মুহূর্তে এতটুকু সময়ে কিভাবে বলবো, জামায়াতে ইসলামী কি? তাদের কাজ কি? আপনি বরং এই বইটা পড়ুন। তাহলেই জানতে পারবেন জামায়াতে ইসলামী কি এবং আমাদের কাজ কি? তিনি বইটা নিয়ে গেলেন এবং আদ্যোপান্ত পড়ে প্রায় ১৫/২০ দিন পর আবার বইটি নিয়ে আমার বাসায় এসে হাজির। তিনি এসেই আমাকে চার্জ করতে শুরু করলেন, "আপনারা কিসের জামায়াতে ইসলামী করেন? জামায়াতের এমন একজন নেতাকে লোকেরা এভাবে মিথ্যা গালি গালাজ করে, আর আপনারা কিছুই বলেননা। বইটা আমাকে দিন, আমি বইটা কিনে নেবো।" এই কথাগুলো মরহুমা মিসেস গোফরান (আল্লাহপাক তাকে জান্নাত নসীব করুন) সেদিন আমাকে বলেছিলেন। আমার কাছে তখন এই বই একটিই ছিলো। আমি বললাম, "আমার কাছে এই একটিমাত্র বই। এই বইটা আমি আপনাকে দিতে পারবনা। দরকার হলে আমি আপনাকে একটা কিনে দেবো। তিনি নাছোড় বান্দা। বললেন, "আমি বইটা নিয়ে গেলাম। আপনি আমাকে একটা বই কিনে দেবেন। তারপর আমি আপনার বই ফেরত দেবো।" আমাকে তাই করতে হয়েছিলো। "মাওলানা মওদূদী র." বইটা কিনে তাকে দিয়ে তারপর আমর বইটা ফেরত নিতে হয়েছিল। এই যুগান্তকারী জীবনী বইটা পড়েই মিসেস গোফরান ইসলামী আন্দোলনে এসেছিলেন। এরপর থেকে আমি ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের কাউকে নতুন বই পড়াতে হলে এই বইটা পড়াতে সাজেষ্ট করতাম।

১৯৭৯ সাল থেকে ১৯৯২ সাল পর্যন্ত জামায়াতে ইসলামী মহিলা বিভাগের দায়িত্ব পালনকালে আমার দায়িত্বশীল ছিলেন মোহতারাম আমীরে জামায়াত প্রফেসর গোলাম আযম। আমার সফর, সাংগঠনিক সব কাজের রিপোর্ট পেশ, পরামর্শ সব আমীরে জামায়াতের কাছেই হতো। কাজেই মরহুম আব্বাস আলী খান সাহেবের

সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠতর হবার সুযোগ আমার খুব একটা হয়নি। আমীরে জামায়াত জেলে থাকাকালীন যখন মরহুম আব্বাস আলী খান জামায়াতে ইসলামীর হাল ধরলেন, তখন প্রয়োজনে তার সঙ্গে মাঝে মাঝে কথাবার্তা হয়েছে। তাও খুবই কম। তিনিও যেমন কথাবার্তা কম বলতেন, লেখা, গবেষণা নিয়েই ব্যস্ত থাকতেন, আমারও প্রায় একই অভ্যাস ছিলো। কথাবার্তা কম বলা প্রয়োজন ছাড়া কথা বলতেই পারতামনা। আজও অনেকটা তাই রয়ে গেছি।

'৯২ সালের রুকন সম্মেলনে তার কঠিন অসুস্থতা থেকে উঠে এসে উদ্বোধনী ভাষণে তিনি যে সময়োপযোগী এবং সম্মেলনোপযোগী ভাষণ দিয়েছিলেন তা ছিলো অভূতপূর্ব। আমি সেদিন তাঁর বক্তব্যে অভিভূত হয়েছিলাম। একজন কঠিন অসুস্থ মানুষ হাসপাতালের বেড থেকে সম্মেলনে এসে এমন স্পষ্ট, রুকন সম্মেলনের জন্য এমন সংবেদনশীল বক্তব্য পেশ করতে পারেন, তা আমার নিকট অবিশ্বাস্য ছিলো। গভীর জ্ঞানের অধিকারী মরহুম আব্বাস আলী খান সাহেবের জন্য শুধু এটা সম্ভবপর ছিলো। সেদিন সবাই তাঁর বক্তব্যে অভিভূত হয়েছিলেন।

মাঝে মাঝে উনার নাতনী নাসিমা আফরোজ, যিনি জামায়াতের রুকন তার বাসায় যেতাম বিভিন্ন প্রোগ্রাম উপলক্ষে। ছোট্ট একটা রুমে থাকতেন নীরব মানুষ। কোনো কথা নেই। লেখাপড়া নিয়েই ব্যস্ত। রুমে থাকলে সালাম ও কুশল বিনিময় হতো।

মাঝে মাঝে আমার অসুস্থ স্বামী, হাফেজ ফয়েজ সাহেবকে দেখতে যেতেন। আনেকক্ষণ বসে নীরব মানুষটি আমার স্বামীর সঙ্গে কথাবার্তা বলতেন। উনার সঙ্গে তখনও সালাম বিনিময় হতো। কুশল বিনিময় হতো। উনিও বেশী কথা বলতেননা। আমিও বেশী কোনো কথা বলতে সংকোচবোধ করতাম।

খবর পাচ্ছিলাম তিনি অসুস্থ। যাবো যাবো করছি উনাকে দেখতে। হঠাৎ মনটা আতংকে দুরু দরু করে উঠলো। ভাবলাম দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ, কবে কি হয়ে যায়। একটু দেখতে গেলাম না আজও। তাড়াতাড়ি সেদিন তাঁকে দেখতে গেলাম। নিজ হাতে রান্না করে একটু দুধের পায়েস নিয়ে গেলাম। গিয়ে কাছে বসলাম। জ্ঞানী তাপস একব্যক্তি ধীরস্থিরভাবে শুয়ে আছেন। কোনো কষ্টে আছেন বলে মনে হলোনা। কয়েকদিন ধরে কোনো কিছু খাচ্ছেননা। পরদিন নাতনী নাছিমাকে ফোন করলে বললো যে, নানাজী আপনার রান্না পায়েসটা একটু একটু খাচ্ছেন। এ জন্য পায়েসটা রেখে উনাকে একটু করে খাওয়াচ্ছি ২ দিন। শুনে খুব তৃপ্তি লাগলো অসুস্থ ভাই আমার রান্না পায়েসটা খেয়েছেন শেষ মুহূর্তে।

তিনি অসুস্থ শুয়ে আছেন। আমার চোখে পানি এসে গেলো। নাতনী নাছিমাকে বললাম, তোমরা হারাতে বসেছো তোমাদের নানাজীকে আমরা আমাদের আন্দোলনের অসংখ্য ভাই-বোনেরা হারাচ্ছি আমাদের সকলের একজন দীনি ভাইকে, আমাদের একজন প্রাণপ্রিয় নেতাকে। খান সাহেবের একমাত্র মেয়েই শেষ কয়দিন কাছে ছিলেন। সেবা যত্ন করেছেন।

সেদিন দেখতে গেলাম, কাছে বসেছিলাম। মনে হলো এই মানুষটাই একদিন আন্দোলনের দুঃসময়ে শক্ত হাতে আন্দোলনের হাল ধরেছিলেন, আজ তিনি অসহায়ের মতো বিছানায় শুয়ে আছেন। বুকটা দুরু দুরু করে উঠলো। সত্যিই কি আমরা আদের একজন দীনি ভাই, দীনি স্বাথীকে হারাতে যাচ্ছি। অসুস্থ কথা বলতে পারছিলেননা। যিনি আন্দোলনের জন্য কতো লিখেছেন, কতো বলেছেন, আজ তিনি বাকরুদ্ধ। বুকটা কেঁপে উঠল। মনে হলো, তিনি বোধ হয় শীঘ্রই আমাদের থেকে বিদায় নিচ্ছেন। কতোক্ষণ বসে কাটালাম। শেষে বললাম, আপনি অসুস্থ। আপনি আমাদের জন্য দোয়া করুন, আমরাও আপনার জন্য দোয়া করিছ। তিনি দুহাত তুলে দোয়ার ইশারা করলেন। সালাম দিলাম। তিনি সামান্য হাত তুলে সালাম নিলেন। এই হচ্ছে আমাদের দীনি ভাই-এর সাথে আমার শেষ সাক্ষাৎ, শেষ কথা।

ফোনে খবরা খবর নিচ্ছিলাম নাতনী নাছিমা আফরোজের কাছ থেকে। সেদিন নাছিমা জানালো, গতকাল নানাজী একদম ভাল মানুষের মতো কথা বলেছেন। আজ দুপুরে খাবার নিয়ে যাবো। আমি বললাম আমাকে একটু নিয়ে যেও। সেদিন আর যাওয়া হলোনা। নাতনী ফোন করে কান্নায় ভেঙ্গে পড়লো, নানাজী ইন্তেকাল করেছেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রাজেউন।

তাঁর নামাযে জানাযায় লক্ষাধিক লোকের সমাগম প্রমাণ করেছে যে তিনি ছিলেন আল্লাহপাকের একজন প্রিয় বান্ধা। আল্লাহ পাক তাঁকে দুনিয়াতেই বিরল সম্মান দান করেছেন। আল্লাহপাক তাঁকে আখেরাতে জান্নাতুল ফেরদাউস দান করে সম্মানিত করুন, আমীন, ছুম্মা আমীন।

স্মৃতির পাতায় মহান নেতার জীবনের কয়েকটি খন্ড ছবি

মাযহারুল ইসলাম

অধ্যাপক মাযহারুল ইসলাম দীর্ঘদিন থেকে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের অফিস সেক্রেটারির দায়িত্ব পালন করছেন। ফলে মরহুম আব্বাস আলী খানকে তিনি একান্ত নিকট থেকে দেখার ও সেবা করার সুযোগ পেয়েছেন। তাঁর স্মৃতির পাতার খন্ড চিত্রগুলো চমৎকার। - সম্পাদক

সুদীর্ঘ ২৪/২৫টি বছর পরম শ্রদ্ধেয় নেতা জনাব খানকে কাছে থেকে দেখেছি, তাঁর সাথে সফর করেছি, তাঁর নির্চাচনী এলাকায় গিয়ে নির্বাচন পরিচালনা করেছি। শত শত কথা, শত শত স্মৃতি আজ মনে পড়ছে। ছোট প্রবন্ধে তা বলা সম্ভব নয়। শুধুমাত্র খন্ড চিত্রই দেয়া যেতে পারে।

জনাব আব্বাস আলী খান ছিলেন একজন উঁচু মানের রাজনীতিবিদ, একজন শিক্ষিবিদ, একজন সু-সাহিত্যিক, একজন সমাজসেবী, একজন ইসলামী চিন্তাবিদ এবং সর্বোপরি একজন সুপন্ডিত। একজন ব্যক্তির মধ্যে এতোসব গুণের সমাহার আমি আর দেখিনি।

তাঁর জীবন দেখেছি পরিপূর্ণভাবে সুশৃংখল, সুনিয়ন্ত্রিত এবং একটি সুনিয়মের ছকে বাঁধা। ঘুম থেকে উঠা, নামায পড়া, নাস্তা করা, ভাত খাওয়া, বিকেলে নাস্তা করা, রাতে ভাত খাওয়ার পর ১০টায় শুয়ে পড়া সবই ছিলো সুশৃংখল এবং সুনিয়ন্ত্রিত। অথচ প্রতিদিন যথানিয়মে তিনি সকাল ৯টায় একটি ব্রীফকেইসসহ জামায়াতের কেন্দ্রীয় অফিসে আসতেন, জোহর নামায পড়ে তাঁর ব্রীফকেইস নিয়ে বাসায় চলে যেতেন। আবার আছর নামায অফিসে এসেই অফিস সংলগ্ন মসজিদে পড়তেন। এশার নামায পড়ে বাসায় চলে যেতেন এমনিভাবে তিনি অফিস করতেন নিয়মিত।

তাঁর চেম্বারে কোনো লোক আছে কিনা বাহির থেকে তা বুঝা যেতোনা। এমন চুপচাপ এবং নীরব থাকতো তাঁর কক্ষ। কিন্তু আমি অনেক সময় পর্দার ফাঁকে উকি দিয়ে দেখেছি তিনি গবেষণায়, লিখায় মগ্ন রয়েছেন। তাঁকে কখনো গল্প গুজবে সময় কাটাতে দেখিনি।

তিনি তাঁর সব কাজে একটি স্টাইল মেইনটেইন করতেন। চালচলন, খাওয়া-দাওয়া এবং কথা বলায় তাঁর নিজস্ব ধরন ছিলো - যা সকলকে আকর্ষণ করতো। কোনো গর্ব, কোনো অহংকারের লেশমাত্র নেই অথচ তাঁর বিশাল ব্যক্তিত্ব ফুটে উঠতো প্রতিটি কাজে।

অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাজ থেকে শুরু করে বড় বড় ক্ষেত্রে আমি তাঁকে দেখেছি - কোথাও ভারসাম্যের অভাব দেখিনি।

তিনি নিজের কাজ নিজে করতে ভালো বাসতেন। তাঁর থাকার রুমে অফিসের কোনো স্টাফ গেলে কিছু খাইয়ে দিতেন। তিনি শিশু কিশোরদের নিয়ে ইসলামী গান শুনতেন। তাঁর অন্তরও ছিলো শিশুদের মতো খোলামেলা। তাঁর মনে কোনো বাঁকা চিন্তা আছে, তাঁর মনটার দুয়ার বন্ধ একথা তাঁর শত্রু এবং নিন্দুকেরাও বলতে পারবেনা। তাঁর অন্তর ছিলো সাদামাটা, খোলামেলা। দর্শণের ভাষায় 'His mind was like a white tabularasa'. সত্যি তাঁর অন্তর ছিলো খোলা ধবধবে সাদা শ্লেটের ন্যায়। সেই সাদা ধবধবে অন্তরে একমাত্র আল্লাহ্‌র দীন কায়েমের স্বপ্নই ছিলো খচিত, মুদ্রিত। তাইতো আজীবন কর্মে, সাধনায় আল্লাহর দীন ইসলাম কায়েমের জন্যই তিনি ছিলেন নিবেদিত।

রাজনীতিতে, লেখায়, সমাজ সেবায়, গবেষণায়, শৃংখলাবোধে, নিয়মনীতিতে, সাহিত্যে এক কথায় প্রতিটি কর্মে এবং প্রতিটি পদক্ষেপে তিনি ইসলামী আন্দোলন তথা ইসলাম কায়েমের রূপায়ণ ঘটিয়েছেন।

তিনি নিজ হাতে শাক ভাজি, ডিম ভাজি, হরলিক্‌স ইত্যাদি বানিয়ে খেতেন। গেস্ট আসলে তাদের নিজ হাতে বানিয়ে কিছু খাওয়াতেন। তিনি তাঁর অফিস রুমেই চা, হরলিক্‌স ও দুধ রাখতেন। নিজ হাতে টেলিফোন করতেন, ড্রাফ্‌ট করতেন, এমনকি টাইপ পর্যন্ত করতেন।

সফরে গেলে তাঁকে দেখেছি তাঁর সাথে যারা যেতেন তাদের খাওয়া থেকে শুরু করে শোয়া পর্যন্ত খোঁজ নিতেন। মশারি বালিশ দেয়া হয়েছে কিনা সে খোঁজ নিতেও ভুল করতেননা।

একবার তাঁর সাথে টাঙ্গাইল এবং মোমেনশাহী সফরে গেলাম। অধ্যাপক ইউসুফ আলী সাহেব তাঁর সাথে যাওয়ার কথা ছিলো। তিনি যেতে পারেননি বলে শেষ পর্যন্ত আমাকে সাথী হতে হয়েছিলো।

পথে আমরা টাঙ্গাইলে এবং মধুপুরে জনসভা করেছি। এই লম্বা রোডে তিনি বিভিন্ন গল্প করেছেন - 'স্মৃতি সাগরের ঢেউ' বইয়ে তার কিছু কিছু উল্লেখ আছে। তাঁর যে হাসি, তাঁর বলার ভঙ্গি, তাঁর শুদ্ধ বাংলা-আজো আমার মানসপটে জ্বল জ্বল করছে। গল্পের সময় মনেই হতোনা বয়সের বিস্তর ব্যবধানের কথা।

আমি জানতাম তিনি সময়মতো কিছু খেয়ে এক কাপ চা খান। আমি ঢাকা থেকে কেক, আপেল কিনে নিয়েছিলাম এবং একটা হরলিক্‌সও সাথে নিয়েছিলাম। সাথে নিয়েছিলাম অফিস থেকে একজন খাদেম। ঠিক সময় মতো এক পিছ কেক খাওয়ানোর পর তিনি যে কি খুশী হয়েছেন - তা আর কি বলবো!

আমি '৯১ সালে মুহতারাম খান সাহেবের নির্বাচনী এলাকায় নির্বাচন পরিচালনা করতে গিয়েছিলাম। সে সময়ে জয়পুরহাটে কিছুদিন ছিলাম। সেখানে দেখেছি তাঁর

প্রতি আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার অকৃত্রিম শ্রদ্ধা। তাঁকে নিয়ে হাটে বাজারে নির্বাচনী প্রচারণায় গিয়েছি, মানুষকে দেখেছি দোকানপাট, বেচাকেনা ছেড়ে উঠে দাঁড়াতে, তাঁকে সালাম দিতে, তাঁর সাথে দু'হাত মিলাতে। তখনই আমি বলেছিলাম যে, মন্ত্রীও এ রকম মর্যাদা, এরকম সম্মান পায়না। এমপি নির্বাচিত হওয়া আর মানুষের কাছে সম্মান পাওয়া হয়তো এক জিনিস নয়। দলমত নির্বিশেষে সকলেই তাঁকে শ্রদ্ধা করতেন। বহু হিন্দু ব্যক্তিকে আমি দেখেছি তাঁকে সমাদর করতে, শ্রদ্ধা জানাতে। দাঁড়ি চুল পাকা ৬০/৭০ বছরের বৃদ্ধ ব্যক্তিদেরকে দেখেছি মুহতারাম খান সাহেবকে 'স্যার' বলে সম্বোধন করতে, শ্রদ্ধাভারে সম্মান জানাতে।

নির্বাচনী কাজে হঠাৎ গাড়ী থেকে নামতে গিয়ে তাঁর হাত ভেঙ্গে গিয়েছিলো। ব্যান্ডেজ করা ভাঙ্গা হাত গলার সাথে ঝুলিয়ে নিয়ে তিনি গাড়ীতে বসে নির্বাচনী কাজে যেতেন। রাস্তায় বেরুলেই সকলে তাঁকে সালাম দিতেন। কোনো কোনো সময় তিনি দেখতে পেতেননা। এ ছাড়া বারবার হাত তুলতেও তাঁর কষ্ট হতো - এক হাততো গলায় বাঁধা ছিলো। ডাক্তার উমর ফারুক এবং আমি তাঁর পাশে বসা ছিলাম। কোনো সময় আমিও হাত তুলতাম। তাঁকে বললাম - আপনি বার বার হাত তুলে সালামের জবাব দিন। কারণ আপনি যে সালাম নিয়েছেন জনগণ তা না বুঝলে এর ভিন্ন প্রতিক্রিয়া হবে। তিনি বললেন, 'আমি তো হাত তুলেই আছি'। আমরা হেসে উঠলাম।

১৯৯১ সালে নির্বাচনের প্রাক্কালে জাতির উদ্দেশ্যে টেলিভিশনে তিনি যে ভাষণ দিয়েছিলেন তা ছিলো একটি রাষ্ট্র নায়কোচিত ভাষণ। সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবী, শিক্ষাবিদ, পেশাজীবী, রাজনীতিবিদ, সাধারণ নাগরিক অর্থাৎ সর্বস্তরের মানুষের কাছে তা ছিলো অতি প্রশংসনীয়।

তাঁর বয়স ৮৫ বছর হলেও গলার স্বর ছিলো টনটনে। গলার স্বর শুনে কেউই ভাবতে পারতোনা যে তাঁর ৮৫ বছর বয়স হয়েছে। ২৫ বছর আগে যে কণ্ঠ আমি দেখেছি, অসুস্থ হওয়ার আগেও তাঁর কণ্ঠ ছিলো একই রকম। মহিলা শিক্ষা শিবিরে তাঁর বক্তৃতা শুনে শিক্ষার্থীরা বুঝতেই পারতোনা তাঁর বয়স হয়েছিলো ৮৫ বছর। আমার স্ত্রীর মাধ্যমে এ খবর আমি জেনেছি। তাঁর বক্তৃতার ভঙ্গি, উপস্থাপনা ছিলো চমৎকার। দায়িত্ববোধ ছিলো অত্যন্ত তীক্ষ্ণ। সময়ানুবর্তিতা ছিলো তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। ইংরেজী শিক্ষিত হয়েও তিনি উর্দু লিখতেন এবং উর্দু বই অনুবাদ করতেন, যা ছিলো অসাধারণ। উর্দু ভাষায় তাঁর কতটা ব্যুৎপত্তি ছিলো এটা তাঁরই প্রমাণ।

তাঁর গল্পে, কথাবার্তায়, বক্তৃতায় অসংলগ্ন অশালীন শব্দ বা বাক্য কখনো শুনিনি। সত্যিকার অর্থেই তিনি ছিলেন পরিচ্ছন্ন এবং পরিপাটি। ইউনিট বৈঠক, কর্মপরিষদ বৈঠক, মজলিসে শূরার অধিবেশন এমনকি বিয়ের দাওয়াতে, অন্যান্য অনুষ্ঠানে কখনো তাঁকে আমি বিলম্বে আসতে দেখিনি। তিনি সব সময় থাকতেন চুপচাপ। তাঁর যখন বলার সময় হতো, তিনি সুন্দর বাংলায় সুন্দর ভঙ্গিতে তা বলতেন।

মরহুম খান সাহেবের হাতের লেখা ছিলো অত্যন্ত সুন্দর এবং একটি বিশেষ স্টাইলের। বাংলা এবং ইরেজী উভয় ভাষায় তাঁর লেখা ছিলো উন্নত মানের। উর্দু লেখাও ছিলো চমৎকার।

ব্যক্তিগত ইবাদাতে পরহেজগারীতে তিনি ছিলেন অত্যন্ত নিষ্ঠাবান। তাঁর তাকওয়ার তুলনা হয়না। আমি তাঁকে দেখেছি একা একা নিরবে কুরআনের তাফসীর পড়ছেন আর তাঁর চোখ দিয়ে পানি ঝড়ছে।

খুসু খুজুর সাথে তিনি নামায পড়তেন, অন্যকে নামায পড়ার জন্য তাকীদ দিতেন। তাঁর তেলাওয়াত ছিলো খুবই সুমধুর। আমরা যারা তাঁর পিছনে নামায পড়েছি - তারা কি যে মজা পেয়েছি-তা অনুভবে বুঝা যায়, ভাষায় বলা কঠিন।

মসজিদ কাছে থাকা সত্ত্বেও যারা মসজিদে দেরীতে যায় এবং আগেই চলে আসে তাদেরকে তিনি ভর্ৎসনা করতেন। তিনি প্রায়ই আফসোস করে বলতেন কি ব্যাপার আমাদের লোকেরা নামাযে যায় দেরীতে, আবার চলে আসে আগেই। বিশেষ করে জুমার নামাজের দিন যারা প্রথমে মসজিদে যায় তাদের কতো নেকী হয় এবং যারা দেরীতে মসজিদে যায় তাদের ভাগ্যে কত কম নেকী জুটে তা উল্লেখ করে তিনি সকলকেই জুমার দিন আগে মসজিদে যাওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করতেন।

মরহুম জনাব আব্বাস আলী খান বহুবার হজ্ব করেছেন। এর পরেও তার একমাত্র কন্যাকে নিয়ে ১৯৯৭ সালে আবার হজ্বে গেলেন। হজ্ব শেষ করে আসার পর পরবর্তী বছর অর্থাৎ ১৯৯৮ সালে তিনি আমাকে বললেন গত বার হজ্ব করার পর তৃপ্তিতে প্রাণ ভরে উঠেনি। 'আবার মেয়েকে নিয়ে উমরা করতে যেতে চাই। আপনি একটু ব্যবস্থা করুন।'

তিনি আবার উমরা করতে গেলেন। উমরা শেষ করে এসে আমাকে বললেন জেদ্দা বিমান বন্দরে তার হাতে একটি বড় ব্যাগ ছিলো। ক্লান্ত দেহে তিনি সেটা খুব কষ্ট করে বহন করছিলেন। কোনো সাহায্যকারী কোথাও পাওয়ার উপায় ছিলোনা। হঠাৎ করেই একজন বিমান বন্দরের কর্মকর্তা তার কাছে ছুটে এসে জোর করে তার হাত থেকে ব্যাগটি কেড়ে নিলেন এবং বিমানে গিয়ে তুলে দিয়ে আসলেন। তিনি তাকে চিনেননা -জানেননা। অথচ এভাবে তাকে সাহায্য করলেন এবং সাহায্যকারী ব্যক্তিটি তাকে বললেন আপনি 'আব্বাস আলী খান না? আজই আমি আপনার অনুবাদকৃত আসান ফেকাহ পড়ছিলাম। আমি আপনাকে দেখে মুগ্ধ হলাম।' আমি উত্তরে জনাব খান সাহেবকে বললাম আল্লাহ তার নেক বান্দাদের এমনিভাবে সাহায্য করেন।

উচ্চ শিক্ষিত হওয়া সত্ত্বেও পিতার একমাত্র সন্তান হওয়া সত্ত্বেও, সরকারী চাকুরীজীবী হওয়া সত্ত্বেও দুনিয়া ভোগ করার পর্যাপ্ত সুযোগ থাকা সত্ত্বেও তিনি দুনিয়ার পেছনে ছুটেননি। দুনিয়ার লোভ তাঁকে স্পর্শ করেনি। দুনিয়ায় অট্টালিকা নির্মাণ করেননি। পরকালের অট্টালিকা নির্মাণের চেষ্টা করেছেন প্রতিনিয়ত।

তাইতো সর্বস্তরের সর্বশ্রেণীর মানুষের মুখে এক কথা তার মতো মানুষ আর হয়না। ঢাকায়, বগুড়ায় এবং জয়পুরহাটে হাজার হাজার লাখো জনতো, আজ এ কথারই প্রতিধ্বনি করছে।

শুধু ব্যক্তিগত ইবাদাতে নয়, ব্যবহারিক জিন্দিগীতেও তিনি ছিলেন পরিচ্ছন্ন। লেন-দেনে তিনি ছিলেন খুবই সতর্ক। জামায়াত কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ গাড়ী এবং টেলিফোন সাংগঠনিক কাজে ব্যবহার করে থাকেন। ব্যক্তিগত কাজে কেউ ব্যবহার করলে নিয়ম অনুযায়ী তাকে সে খরচ কেন্দ্রীয় বায়তুলমালে পরিশোধ করতে হয়। এ ব্যাপারে জনাব খান ছিলেন একজন 'অনুসরণীয় মডেল'। তিনি ব্যক্তিগত কাজে গাড়ী ব্যবহার করতেননা বলা চলে। এর পরেও কদাচিৎ গাড়ী ব্যবহার করলে হিসাব নিকাশ করে সে বিল দিয়ে দিতেন। ব্যক্তিগত টেলিফোন ব্যবহারের ক্ষেত্রেও তিনি পাওনা পরিশোধ করে দিতেন।

কেন্দ্রীয় অফিসের দায়িত্বে থাকার কারণে এ সকল চিত্র আমার কাছে বড়ই পরিস্কার।

ইসলামী আন্দোলনের সবটুকু অভিজ্ঞতা, সবটুকু পুঁজি যেনো তিনি কর্মীদেরকে উজাড় করে দিয়ে গেছেন। জামায়াত প্রতিষ্ঠার পটভূমি, এর উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য ও আমাদের করণীয়, মরহুম মাওলানা মওদূদীর চিন্তা ধারা সবকিছু তিনি অন্তর থেকে নিংড়িয়ে ঢেলে দেবার চেষ্টা করেছেন।

আল্লাহর দ্বীন কায়েমের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি অর্জন এবং পরকালীন মুক্তিই হলো মু'মীন জীবনের একমাত্র লক্ষ্য।' মরহুম আব্বাস আলী খানের ভাষণের নির্যাস থাকতো এটাই।

কেউ কেউ বলেন তার কাছে ইলহাম হতো।

আমাদের প্রিয় খান সাহেব

মুহাম্মদ নূরুয্‌যামান

দুনিয়ার সব কিছুই ক্ষণস্থায়ী। মানুষও মরণশীল। একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু চিরন্তন ও চিরঞ্জীব। আল্লাহর নির্ধারিত নিয়ম অনুযায়ী আমাদের প্রিয় নেতা আব্বাস আলী খান এ দুনিয়া ত্যাগ করে তাঁর প্রভুর সান্নিধ্যে চলে গেছেন।

জীবন ও মৃত্যু আল্লাহর আদেশ বিশেষ। তাই আমরা তার ইনতিকালে শোকাতুর নই। বরং তিনি খোশ নসিব বান্দাহ হাদীসের আলোকে। যেমন তার জীবন সুদীর্ঘ তেমন বিশাল ও বিপুল তার কর্মজীবন। তাঁর গোটা জীবনই আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ব্যয়িত হয়েছে। কিন্তু আমরা তাঁর বিয়োগ ব্যথায় ব্যথিত এবং সে ব্যথার কারণ অন্য কিছু। তাঁর ইনতিকালে আমরা আল্লাহর রসূলের তরিকার ভিত্তিতে পরিচালিত ইসলামী আন্দোলনের এক অমূল্য মডেল থেকে বঞ্চিত হয়েছি। আমার সীমিত জ্ঞানের দ্বারা যখন বিষয়টি পর্যালোচনা করি তখন আমার মনে হয় তাঁর শূন্যতা পূরণ করার মতো নয়। কিন্তু একমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামীনই জানেন তাঁর 'নিয়ামুল বদল' আমাদেরকে কিভাবে দিবেন।

তিনি একজন খাটি দায়ী ইলাল্লাহ। তাঁর সাথে আমার পরিচয় দীর্ঘ দিনের। ১৯৫৬ সনে আমি জামায়াতে যোগদান করি একজন সমর্থক (মুত্তাফিক) হিসেবে। আমি তখন মাওলানা ভাসানীর পরিচালিত দৈনিক ইত্তেহাদে সাব-এডিটর হিসেবে কাজ করতাম। আর অবসর সময় পূর্ব পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামীর ২০৫ নং নবাবপুর রোডে অবস্থিত কার্যালয়ে কাটতো। অধিকাংশ সময়ই পূর্ব পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামীর আমীর মাওলানা আব্দুর রহীম রহ.এর কক্ষে বসে তার সাথে কথা বলতাম। অবাক বিস্ময়ে লক্ষ্য করতাম তিনি অনুবাদ করছেন, প্রুফ দেখছেন এবং আমাদের সাথে আলাপও করছেন। দেশী বিদেশী মেহমান আসছেন। তাদের আদর আপ্যায়নও করছেন। আমি বা আমার মতো আরো দু'একজন যারা মরহুম মাওলানার টেবিল ঘিরে থাকতাম তাদের অবস্থা ছিলো মেহমান এবং মেজবানের। জামায়াতের নেতৃবর্গ এবং দর্শনার্থীদের সাথে মরহুম মাওলানা আব্দুর রহীমের আলাপ-আলোচনা থেকে জামায়াতের কর্মধারা, আদব কায়দা এবং জামায়াতী মেযায সম্পর্কে তা'লিম নিতাম। আর বাড়তি ফায়দা ছিলো মেহমানদের সাথে চা বিস্কুট খাওয়া। সম্ভবতঃ মাওলনা আব্দুর রহীম সাহেবের কক্ষে বা জামায়াতের পুস্তক বিক্রয় কেন্দ্র বা অন্য কোনো কক্ষে আব্বাস আলী খান সাহেবের সাথে পরিচয় হয়ে থাকবে। সাংবাদিক হিসেবে অতি অল্প সময়ের মধ্যে তাঁর সাথে আমার অন্তরঙ্গতা গড়ে উঠে। সে সময় তাঁরই সমবয়সী আরও দুই ব্যক্তি আমার মনে বিশেষ রেখাপাত করেন। তাদের একজন হলেন ঢাকার রহমতুল্লাহ হাইস্কুলের হেড মাস্টার হাফিজুর

রহমান (তিনি ভারতের কোনো অঞ্চলের একজন জমিদার ছিলেন এবং হিজরত করে পূর্ব পাকিস্তান এসেছিলেন) এবং ফরিদপুরের মাওলানা আব্দুল আলী। তাদের চেহারার মধ্যে খোদা সুফীতার ছাপ ছিলো। এ তিনজনই সাদামাটা লেবাস পরিধান করতেন। কিন্তু তা সব সময়ই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকতো। তাঁদেরকে দেখলে যে কেউ সহজে অনুমান করতে পারতো তাঁরা দুনিয়ামুখী নন বরং আখেরাতমুখী। খান সাহেবের ভাষায় ঃ "সহজ সরল ও সাদাসিধে জীবন যাপনের পরিবর্তে বিলাসী জীবন যাপন সংগ্রামী জীবনের সাথে সাংঘর্ষিক--" (একটি আদর্শবাদী দলের পতনের কারণ)। খান সাহেব তাঁর 'কর্মীদের কাংখিত মান' পুস্তকে এ অবস্থাকে 'ফানা ফিল ইসলাম' আখ্যায়িত করেছেন। তিনি বলেন, প্রকৃত দাওয়াত ও তাবলীগ হচ্ছে এই যে, আপনি আপনার দাওয়াতের মূর্ত প্রকাশ ও নমুনা বিশেষ। এ নমুনা যেখানেই মানুষের চোখে পড়বে, তারা আপনার কাজের ধরণ থেকেই বুঝে নিবে যে, এ একজন খোদার পথের পথিক। আপনি নিজেকে এমন ভাবে ফানা ফিল ইসলাম করুন যাতে আপনি যার সামনেই আসুন ইসলামী আন্দোলনের পূর্ণ চিত্র যেনো পরিস্ফুট হয়ে পড়ে। নবী করিম সঃ এটাকে এভাবে বলেছেনঃ "এদের সাথে দেখা হলেই আল্লাহর ইয়াদ আসবে, আল্লাহর কথাই মনে পড়বে।"

১৯৫৮ সনে যখন জেনারেল আইউব খান সামরিক শাসন জারি করলেন পাকিস্তানকে বলিষ্ঠ ও সুদৃঢ় করার চমকদার শ্লোগান দিয়ে, তখন অন্যান্য রাজনৈতিক দলের সাথে জামায়াতে ইসলামীকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হলো এবং দলের প্রধান কার্যালয়ে তালা ঝুলিয়ে দেয়া হলো। জামায়াতের নেতা ও কর্মীগণ পুরান ঢাকার ১৩ নং কারকুন বাড়ী লেনে মেলামেশা করতে লাগলেন। ১৩ নং কারকুন বাড়ী লেনের সামান্য ইতিহাস রয়েছে। ১৯৫৭ সনের শেষ দিকে মাওলানা ভাসানীর দৈনিক ইত্তেহাদ বন্ধ হয়ে গেলে আমি উক্ত পত্রিকার মালিকানা খরিদ করার জন্যে জামায়াতে ইসলামীর তদানিন্তন আমীর মরহুম মাওলানা আব্দুর রহীমকে উদ্বুদ্ধ করি এবং তিনি দায়িত্বশীল ব্যবসায়ী ব্যক্তি- বর্গের মাধ্যমে উক্ত পত্রিকার ডিক্লারেশন, প্রেস এবং বাড়ীর দখলি সত্ব খরিদ করেন। অধ্যাপক গোলাম আযমের সম্পাদনায় ইত্তেহাদের নবযাত্রা শুরু হয়। বার্তা বিভাগের দায়িত্ব আমার উপর অর্পিত হয়। দৈনিক ইনকিলাবের মহা সম্পাদক মহিউদ্দিন যিনি সম্প্রতি ইন্তেকাল তিনি-চীফ রিপোর্টারের দায়িত্ব পালন করতেন। ব্যারিস্টার কোরবান আলী বার্তা বিভাগে সাব-এডিটর হিসেবে কাজ করতেন। জামায়াতী পুঁজির সাথে খান সাহেবের ব্যক্তিগত পুঁজিও ইত্তেহাদের প্রিন্টিং প্রেস ওরিয়েন্টাল প্রেসে নিয়োগ করা হয়েছিল। সামরিক শাসনের ঝড়ো হাওয়ায় ইত্তেহাদের প্রদীপ অল্প দিনের মধ্যেই নিভে যায়। প্রেস ব্যবসায়ী ভিত্তিতে চলতে থাকে এবং সম্ভবতঃ তা আজ পর্যন্ত চালু আছে। কিন্তু খান সাহেব তাঁর পুঁজিও পেলেননা এবং অংশীদারিত্বও পেলেননা। সংশ্লিষ্ট মহলের বাইরে তিনি এ সম্পর্কে কোন অভিযোগ করেননি বা মুখ খুলে তিনি একথা কোন লোককে বলেননি। খুব অল্প লোকই তা জানতো। আমি তাকে বললাম, খান সাহেব, বেইনসাফী মেনে নেয়া যায়না। মামলা করুন। তিনি ধীর শান্ত কণ্ঠে যে জবাব দিলেন, তার সারমর্ম হলো, আখিরাতের আদালতে তিনি মামলা দায়ের করে দিয়েছেন। তাই দুনিয়ার আদালতে মামলা দায়ের

করার কোনো প্রয়োজন নেই। তাঁর জবাব শুনে সম্ভবতঃ চোখ তুলে আমি তাঁর প্রশান্ত চেহারার দিকে চেয়ে থাকলাম। আমার শ্রদ্ধা তাঁর জন্যে আরও বেড়ে গেলো।

মিলিটারী শাসনের নিষিদ্ধ দিনগুলোতে প্রকাশ্য কাজের জন্য তামিরে মিল্লাত নামে একটা সংস্থা প্রতিষ্ঠা করা হলো। আমাকে সেক্রেটারী নিয়োগ করা হয়েছিল। সারাদেশের জামায়াতের রুকন ও অগ্রসর কর্মীদের একত্রিত করার এবং তাদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান করার জন্য মজলিসে তা'মীরে মিল্লাত এক সপ্তাহব্যাপী এক সেমিনারের আয়োজন করলো ঢাকার সিদ্বেশ্বরী হাইস্কুল প্রাঙ্গণে। সেই সপ্তাহব্যাপী সেমিনারে খান সাহেবও ছিলেন। তাঁর সাথে আরও ঘনিষ্টভাবে মেলামেশা করার সুযোগ পেলাম। এ ধরনের আয়োজনে বিভিন্ন ধরনের ক্রুটি থাকে এবং ক্রুটি থাকাই স্বাভাবিক। কিন্তু কোনো ক্রুটি সম্পর্কে খান সাহেব কোনো অভিযোগ করেছেন বলে আমার মনে নেই। সেমিনার ও ট্রেনিং প্রোগ্রামের মান খুবই উন্নত ছিলো। আমাদের মনে এক অভূতপূর্ব জযবা সৃষ্টি হয়েছিল। নেতাদের নিকট থেকে আমরা প্রচুর চিন্তার খোরাক পেয়েছিলাম। আমরা অনুভব করতে পেরেছিলাম যে, আল্লাহর সাথে আমাদের সম্পর্ক বৃদ্ধি পেয়েছে। তাঁর ভালবাসায় আমাদের মন আপ্লুত। সেমিনার শেষে খান সাহেবের সাথে আমি একই রিকশায় যাচ্ছিলাম। তখন জামায়াত নেতা ও কর্মীরা রিকশা ও বেবী টেক্সিতে চলাফেরা করতেন। অধ্যাপক গোলাম আযম সাহেব বাইসাইকেল ব্যবহার করতেন। তিনি ১৩ নং কারকুন বাড়ী লেনে যাবেন আর আমি ঢাকা বোর্ডিং পর্যন্ত যাবো। খান সাহেবের সাথে যখন চলছিলাম তখন আমার মনে হচ্ছিল আমাদের দু'জনের চোখ অশ্রুসিক্ত। আরও মনে হচ্ছিল আজ যদি আল্লাহর আহ্বান আসতো তাহলে তার করুণা ও মাগফেরাত লাভ করে জীবন সার্থক করতে পারতাম।

আইউবী সামরিক শাসন আমলে রাজনৈতিক দলের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করার ২৪ ঘন্টার মধ্যেই পাকিস্তানের উভয় অংশে জামায়াতে ইসলামী বহাল হলো। খান সাহেবের উপর তার সাবেক দায়িত্ব অর্পিত হলো রাজশাহী বিভাগের। প্রাদেশিক মজলিসে শূরায় ঢাকা জামায়াতে ইসলীরি অন্যতম প্রতিনিধি হিসেবে শুরার অধিবেশনে তার সাথে আমার কাজ করার সুযোগ হয়েছিল। তিনি অল্প কথায় খুব সুস্পষ্টভাবে তার মতামত ব্যক্ত করতেন। অনেকের মতো একই বক্তব্যকে বারবার পেশ করতে দেখিনি। তিনি প্রকৃত অর্থে গণতন্ত্রমনা ছিলেন। তাঁর মত গৃহীত না হলেও তার চেহারায় কোনো বিরূপ প্রতিক্রিয়া প্রতিফলিত হতোনা বা তিনি কখনও ভুলেও বিরূপ মন্তব্য করতেননা।

নেতৃত্বের কোন খাহেশ তার ছিলোনা। নেতৃত্ব লাভের কোনো পরিকল্পনার ধারে কাছেও তিনি ছিলেননা। কিন্তু নেতৃত্ব তার কাছে এসেই যেতো। যখন কোনো দায়িত্ব তাকে অর্পণ করা হতো তখন তিনি সে দায়িত্ব 'কামা হাক্কুহু' পালন করতেন। দেশ ও জাতির সংকট মুহূর্তে তিনি ভারপ্রাপ্ত আমীরের দায়িত্ব অত্যন্ত যোগ্যতার সাথে পালন করেন। প্রায় দীর্ঘ ১৪ বছর তিনি ভারপ্রাপ্ত আমীরের দায়িত্ব পালন করেন। এ দায়িত্ব পালন করার জন্য অন্যান্য যোগ্যতার সাথে কথা বলার যোগ্যতার বিশেষ প্রয়োজন হয় এবং খান সাহেব বৃদ্ধ বয়সে ভারপ্রাপ্ত আমীর হিসেবে সভাসমিতিতে যে ভাষণ দিতেন তা খুব বেশী হৃদয়গ্রাহী হতো এবং তার বলিষ্ঠ কণ্ঠ শ্রোতাদেরকে

সহজে আকর্ষণ করতো। মনে হতো একজন বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন নেতা প্রাঞ্জল ভাষায় বলিষ্ঠ ভাষণ দিচ্ছেন। তিনি সভা-সমিতি বা সাধারণের সাথে যখন কথা বলতেন তখন তিনি কোনো বক্রতা বা অস্পষ্টতা বা তথা ডিপ্লোমেসীর আশ্রয় নিতেননা।

১৯৯২ সনের ৩রা জুন অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় শুরার অধিবেশনে প্রদত্ত সভাপতির ভাষণে জনাব আব্বাস আলী খান ইসলামী আন্দোলনের সফলতার জন্য আন্দোলনকারীদের সর্বাঙ্গীন সুন্দর এবাদত, আখলাক ও আমলের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। এ প্রসঙ্গে তিনি তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার বিবরণ প্রদান করেন। তিনি বলেন, যে সৌন্দর্য দেখে জামায়াতে এসেছি তার যদি হানি হয় তাহলে দুঃখ পাবো। চরম দুঃখ ও বেদনা নিয়ে কথা বলছি। পাকিস্তান আমলে জামায়াতে ইসলামীর যৌবনের যে সৌন্দর্য দেখেছি তার হানি হচ্ছে, কালিমা লেগেছে কোনো কোনো স্থানে। যদি ইসলামের নামে কোনো অপরিপক্ক দলকে ক্ষমতা প্রদান করা হয় তাহলে সে দল বিশ্বাসঘাতক হয় এবং লোভের শিকার হয়।

১৯৯২ সনের রুকন সম্মেলনে সভাপতির ভাষণে বলেন ঃ "কাজ যেহেতু আমরা আল্লাহর করছি এবং আমাদের চরম লক্ষ্য যেহেতু আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ, সে জন্য তাঁর সাথে আমাদের সম্পর্ক হতে হবে অত্যন্ত গভীর, নিবিড় ও মযবুত। রাতের নিভৃত প্রহরে অশ্রুকাতর কণ্ঠে তার দরবারে ধরনা দিতে যেনো আমরা ভুল না করি। আমাদেরকে নিষ্কলুষ, পরিশুদ্ধ ও পাপমুক্ত করার কাজে সাহস ও শক্তি দান করার আকুল আবেদন জানাতে হবে তাঁর কাছে।"

তিনি নামায সঠিকভাবে আদায় করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি বলেন, 'নামাযই যদি আমাদের ঠিক না হলো তাহলে আর এমন কি নেক আছে যা নিয়ে আমরা আখেরাতে নাজাত পেতে পারি? আন্দোলনের কর্মীদের কাংখিত গুণাবলী ও মান, জান ও মালের কুরবানীর প্রেরণা, আল্লাহর হক আদায়ের সাথে বান্দাহরও হক আদায় করা, আমানতদারী ও ইনসাফ কায়েম করা, প্রতি মূহূর্তে খোদার ভয় ও আখিরাতের জবাবদিহির অনুভূতি-- এ সমুদয় গুণাবলীতো নামাযই সৃষ্টি করে।'

'আমাদের আমল আখলাকে যদি আল্লাহ খুশী হয়ে যান এবং তিনি যদি মনে করেন যে, হ্যাঁ এমন একটি দল তৈরি হয়েছে যাদের হাতে রাজনৈতিক ক্ষমতা দেয়া যেতে পারে এবং সামান্যতম ক্ষমতার অপব্যবহারও তারা করবেনা, আমানতদারী ও দিয়ানতদারী তারা করবে তাহলে ইসলামী বিপ্লব কেউ রুখতে পারবেনা।'

আমার দৃষ্টিতে ইসলামী আন্দোলনের জন্য খান সাহেবের সবচেয়ে বড় অবদান হলো তার প্রণীত পুস্তক। "একটি আদর্শবাদী দলের পতন ঃ তার থেকে বাঁচার উপায়।" আন্দোলন এবং তার নেতা ও কর্মীদেরকে সঠিক মানে আনার জন্য উক্ত পুস্তকে তিনি যে ২৫টি বিষয় আলোচনা করেছেন তার প্রত্যেকটি বিষয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ। নিজেদেরকে সঠিক মানে রাখার জন্য নেতা ও কর্মীদের বারবার পাঠ করার মতো পুস্তক এটি। আমাদের প্রিয় খান সাহেব মাওলানা সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদীর চিন্তার অনুপম ফসল--ইসলামী আন্দোলনের এক উৎকৃষ্ট মডেল।

(লেখক পাকিস্তান আমলে পূর্ব পাকিস্তানে জামায়াতে ইসলামীর প্রচার সম্পাদক ছিলেন।)

প্রিয় নেতা আব্বাস আলী খান

মীম ওবায়দুল্লাহ্ সাবেক এমপি

মাওলানা মীম ওবায়দুল্লাহ জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য। উত্তরবংগে মরহুম খান সাহেব ষাটের দশকে যাদের নিয়ে আন্দোলনের কাজ সম্প্রসারণ করেন মাওলানা মীম ওবায়দুল্লাহ তাদেরই একজন। খান সাহেবের হাতেই তিনি রুকনিয়াতের শপথ নেন। ❑ সম্পাদক

ছাত্র জীবনে মাওলানা মওদূদীর বই পড়ে জামায়াতে শরীক হই। বাঘা বাঘা আলেমেরা তখন জামায়াতের বিরোধীতা করছে। আর্ট পেপারে ছাপা উর্দূ বইয়ে মাওলানাকে অকথ্য ভাষায় গালাগালি করছে কাজেই দু'পক্ষের বই পড়ে অগ্রসর হচ্ছি। আমার ওস্তাদ মাওলানা আব্দুল হাকিম বিজ্ঞ আলেম। রাজনীতিতে পোড় খাওয়া মানুষ। যুবকদের এহেন প্রবণতা দেখে তাফহিমাত, তানকিহাত পড়ছেন। তিনি মাওলানার বিরুদ্ধে অপপ্রচারের মূল্যায়নের চেষ্টা করছেন। আলহামদুলিল্লাহ একদা তিনি নিরব হয়ে গেলেন। আমরা দ্রুত গতিতে অগ্রসর হচ্ছি।

১৯৬৪ খৃষ্টাব্দে রাজশাহীতে প্রথম মরহুম আব্বাস আলী খানের সাথে সাক্ষাত ঘটে। তখন তিনি রাজশাহী বিভাগের আমীর। প্রথমতঃ তিনি দু'জন রুকনের রুকনিয়াত বাতিল করলেন। রাজশাহীতে কাজের সূচনা তারা করেছিলেন। তাদের ভুল ছিল যৌথ ব্যবসা করতে গিয়ে লেখাপড়া অর্থাৎ শর্ত কারায়েত ও চুক্তি না করায় সাংগঠনিক এ সিদ্ধান্ত নিতে হয়। আল্লাহ তাদের ক্ষমা করেন এবং জান্নাত নসীব করেন। অতঃপর আমি এবং বন্ধুবর আরশাদ হোসেনের রুকনিয়াতের শপথ নিলেন এবং জনাব আরশাদ হোসেনকে বৃহত্তর রাজশাহী জেলার দায়িত্ব দিয়ে গেলেন।

তখন মহকুমা থানাতে সাংগঠনিক কাঠামো গড়ে উঠেনি। যে যেখানে অবস্থান করত কাজ করত। আমিও নাচোলে থেকে যতটা পারতাম কাজ করতাম। তখন সংগঠনের নিজস্ব কোনো যানবাহন ছিলোনা। ট্রেনে একমাত্র ভরসা বাস সার্ভিস কেবল গড়ে উঠছে। যা হোক মরহুম খান সাহেব নাচোল আসবেন। আমিও তাঁকে এগিয়ে নেয়ার জন্য রওয়ানা দিয়েছি। কিন্তু আমি ষ্টেশনে পৌছার পূর্বে ট্রেন পৌছে যায়। তিনি ষ্টেশনে নেমে লাইনের পশ্চিম পাশে অবস্থিত কওমী মাদ্রাসায় গেছেন। মোদারেসগণের সাথে আলাপ আলোচনা করেছেন। আমার খোঁজ খবর নিয়েছেন। তাদের আচরণ খুব ভাল মনে না হওয়ায় ফেরত ট্রেনে রাজশাহী চলে গেছেন। ইতিমধ্যে আমি ষ্টেশনে পৌছে গেছি। পৌছতেই লোকেরা খবর দিল। কাজেই ব্যর্থতার গ্লানি নিয়ে ফেরৎ এলাম। পরবর্তীতে যখন সাক্ষাৎ হলো তৎকালীন হেড মাওলানার অসদাচারণের কথা বললেন। দেখলাম তখনও মনের ক্ষত রয়ে গেছে। অবশ্য এই মাওলানা পরবর্তী এমন ভূমিকা রেখেছিলেন যে তার রক্তাক্ত পাগড়ী, জামা নিয়ে ১৯৭০ খৃঃ নবাবগঞ্জে জনগণ মিছিল করে।

দ্বিতীয় দফা মরহুম খান সাহেব এসেছিলেন নাচোল থানার সর্বোত্তরে সোনাইচন্ডী হাটে এক টি এস-এ। সোনাইচন্ডী হাট একটি বিখ্যাত গুরুর হাট। সবে এখানে একটা হাই স্কুল গড়ে উঠেছে। এই স্কুলে টিএস অনুষ্ঠিত হয়। নাচোল স্টেশন হতে পাঁচ মাইল গরুর গাড়ীতে চড়ে পৌছলেন। তাঁর ঐকান্তিকতার অভাব নেই। তবে বৃটিশ আমলের মুখ্যমন্ত্রীর পিএস, বিখ্যাত ফুরফুরার পীর সাহেবের খলিফা তাঁর এ ধকল সইবে কেন। এসেই মাথার যন্ত্রণায় শয্যাশায়ী হলেন। সাথে ছিলেন রাজশাহীর মরহুম এডভোকেট আশরাফুজ্জামান চৌধুরী। তাকে নির্দেশ করলেন আপনি উদ্বোধন করুন। আমায় দিয়ে কিছু হবে না। অবশ্য পরবর্তী সবই প্রোগ্রাম করলেন।

মরহুম খান সাহেব বাহ্যিকভাবে ছিলেন রাসভারী মানুষ। অনেকে তার ধারে কাছে যেতে ভয় করত। অথচ তার অন্তঃকরণ ছিলো খুবই নরম। নিত্য যারা উঠাবসা করতেন তারা তাঁকে বুঝতেন। যা হোক ১৯৬৬ খৃষ্টাব্দের ঘটনা। নওগাঁর মহাদেবপুর থানা সদরে ডাকবাংলার সামনে জনসভা। খান সাহেব সেখানে প্রধান অতিথি। ছাত্র নেতা স্নেহ প্রবর ছোট ভাই আব্দুল্লাহর কারণে আমিও সেখানে গেছি। জনসভা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হলো। খাওয়া দাওয়ার পালা শেষ। এখন শোবার পালা। কিন্তু বিপদ হলো ডাকবাংলায় মাত্র দুটি বেড। প্রশ্ন দেখা দিল কে কোথায় শুবে? খান সাহেবের সাথে আরও দু'জন ছাত্র রয়েছে। তিনি প্রস্তাব করলেন আপনি আমার সাথে শোবেন। ভয়ে ভয়ে শুয়ে পড়লাম। ঘুমের ঘোরে রাত্রী কেটে গেছে। ভোর হতে দেখি তিনি জেগে উঠেছেন। আমিও নামাযের প্রস্তুতি নিতে লাগলাম। ইতিমধ্যে মন্তব্য করলেন আপনি ঘুমন্ত অবস্থায় কয়েকবার কেঁপে উঠেছেন। এতে আমার ঘুমের ব্যাঘাত হয়েছে। হয়তো কারণ আপনিও জানেননা। যাহোক যারা সাথে চলেছেন এমনি হাজারো স্নেহ বৎসল ঘটনা বলতে পারবেন।

মরহুম খান সাহেব আল্লামা ইকবালের পরিভাষায় মোমেনের প্রজ্ঞার গুণগান করে চলেছেন জিন্দেগী ধরে। কাজেই দু'জন ভাইয়ের বিপদে অদ্ভুতভাবে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করলেন। একদা কেন্দ্রীয় অফিসে যে যার কাজে ব্যস্ত আছি। হঠাৎ খান সাহেবের ডাক পড়ল। আমরা একত্র হলাম। তিনি উৎফুল্ল স্বরে বললেন আসেন আপনাদের মজার গল্প শুনাই। দেখুন আমাদের এ দুভাই ঠগের পাল্লায় পড়েছিলেন। ফলে আট হাজার টাকা খুঁয়েছেন। জানা গেল তাদের দু'জনকে প্রতারকেরা বলে দেখুন মগবাজারে এখন দারুন গন্ডগোল চলছে। টাকা পয়সা থাকলে বের করুন। শীল মেরে দেই এবং একটা স্লীপ লিখে দেই প্রভৃতি।

কিছু স্মৃতি

আনসার আলী

জনাব আনসার আলী জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের অডিটর। তিনি একজন সাবেক হেড মাস্টার। লেখালেখিও করেন। সেই সাথে হোমিও চর্চাও করেন। জামায়াত নেতৃবৃন্দের অনেকেই তাঁর চিকিৎসা গ্রহণ করেন। মরহুম খান সাহেব দীর্ঘদিন তাঁর চিকিৎসা গ্রহণ করেন। এ নিবন্ধে তিনি তাঁর অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন। -সম্পাদক

জ্ঞান তাপস, প্রবীণ রাজনীতিবিদ, সুসাহিত্যিক আব্বাস আলী খান আর আমাদের মধ্যে নাই। বাংলার এই প্রতিভাধর কৃতি সন্তান দীর্ঘদিন যাবৎ আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজে নিয়োজিত সংগঠন জামায়াতে ইসলামীর নেতৃস্থানীয় পদে অধিষ্ঠিত থেকে পরম নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করে গেছেন। তিনি রেখে গেছেন সাহিত্যের এক অমূল্য ভাণ্ডার যা জ্ঞান পিপাসুদের জন্য যেমনি চিন্তার খোরাক যোগাবে তেমনি সত্যের সন্ধানীদের আল্লাহর পথ প্রদর্শনে আলোক বর্তিকা হিসাবে কাজ করবে।

আল্লাহ রব্বুল আলামীন তাঁকে তাঁর এই মহান খেদমতের জন্য উপযুক্ত মর্যাদা ও পুরস্কারে ভূষিত করবে এটা আমার যেমনি আশা, তেমনি কামনা।

১৯৮১ সাল থেকে আমি খান সাহেবকে নিকট থেকে দেখে আসছি। এর আগে কুষ্টিয়ায় মাঝে মধ্যে দেখা হয়েছে। এক বার কুষ্টিয়ার এক জনসভায় তিনি ছিলেন প্রধান অতিথি। উত্তরবঙ্গ থেকে ট্রেনযোগে পোড়াদহ এসে পৌঁছাবেন তিনি। সেখান থেকে কুষ্টিয়া পর্যন্ত নিয়ে আসার দায়িত্ব পড়লো আমার উপর। আমি আর একজন সঙ্গীসহ পোড়াদহ স্টেশনে গিয়ে ট্রেন আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করলাম। ট্রেন আসলে আমরা আমাদের সম্মানিত মেহমানকে অভ্যর্থনা জানিয়ে স্টেশন থেকে নীচে নিয়ে আসলাম। দুর্ভাগ্য আমাদের আমরা মেহমানের জন্য জীপ বা কার এ ধরনের কোন যানবাহন যোগাড় করতে পারি নাই। একটা বেবী ট্যাক্সিতে করেই কুষ্টিয়ার দিকে রওয়ানা দিলাম। তখন রাস্তাটি বড় সুবিধের ছিলনা। তদুপরি জায়গায় জায়গায় মেরামতের কাজ চলছিল। আট মাইল দীর্ঘ পথটি পাড়ি দিতে ঝাঁকুনিতে আমাদের মেহমানের যথেষ্ট কষ্ট হচ্ছিল, কিন্তু কষ্টের জন্য তিনি কোনরূপ বিরক্তি প্রকাশ করছিলেন না। মনেহলো এ ধরনের কষ্টসহ্য করতে তিনি মানসিকভাবে প্রস্তুত হয়েই আছেন। এর মধ্যেও তিনি সৌহার্দপূর্ণ আলাপচারিতায় আমাদেরকে আপন করে তুললেন। ঐ প্রথম দেখেছিলাম মুখে মিষ্টি হাসির রেখা টেনে খান সাহেবকে কথা বলতে। তারপর ১৯৮১ সালে আমি ঢাকায় আসার পর থেকে একই রকম হাসির রেখা তাঁর কথা শুরুর আগে লক্ষ্য করে আসছি। রাশভারী চালচলনের মানুষ হওয়া সত্ত্বেও তাঁর এই হাসিমাখা মুখে কথা বলার নিজস্ব বৈশিষ্টটি অনেক মানুষকে প্রাণ খুলে আলাপ করার সুযোগ করে দিতো। তিনি অন্যের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনতেন

কিন্তু বলতেন কম। আমি কিছু কিছু হোমিওপ্যাথী চর্চা করি তা খান সাহেব জানতেন। তাঁর টুকিটাকি চিকিৎসা করার সুযোগে তাঁর সাথে আমার সম্পর্ক অনেকটা নিবিড় হয়ে ওঠে। একবার তিনি আমেরিকা থেকে ঘুরে এসে আমাকে বললেন "আনসার সাহেব, আমার চোয়ালের এই কালো দাগটা নাকি অসুখ? আমেরিকায় চেকআপ করাতে গেলে সেখানকার ডাক্তাররা বললেন, এ রোগটা চিকিৎসা করাননা কেন? "যাহোক ঐ ডাক্তারদের সাথে একমত হয়ে আমিও বললাম "এটি তো একটি রোগই।" তখন তিনি বললেন, "তাহলে চিকিৎসা করুন।" আমি বললাম "মাস ছ'য়েক লাগবে। আপনি ধৈর্য ধারণ করলে চিকিৎসা করতে পারি।" তিনি রাজী হলেন এবং দাগের চিহ্নটি নিঃশেষ হওয়া পর্যন্ত দীর্ঘদিন ধরে চিকিৎসা নিয়েছিলেন। এ সময় তাঁর ধৈর্য ও নিয়ম-কানুন মেনে চলার প্রতি দৃঢ়তা আমাকে মুগ্ধ করেছিল। এ ছাড়াও তাঁর হৃদশূল (এনজাইনা পেক্টোরিস) রোগ নির্মূল করতে তিনি ওষুধ সেবন ও অন্যান্য বিষয়ে কঠোরভাবে শৃঙ্খলা মেনে চলেছিলেন।

অনেক গুলি জনসভায় আমি খান সাহেবের বক্তৃতা শুনেছি। জনসভায় সাধারণতঃ বিরোধী পক্ষকে তুলোধূনা করা হয়ে থাকে। কিন্তু খান সাহেব তাঁর বলিষ্ঠ কণ্ঠের গুরুগম্ভীর ভাষণে বিরোধী পক্ষের গঠনমূলক সমালোচনা করতেন এবং কখনই কোন অশালীন শব্দ কারো বিরুদ্ধে প্রয়োগ করতেননা। ইংরাজীতে যাকে বলে Noble Foe তিনি ছিলেন তাই।

দুঃখ বেদনায় তাঁকে কখনো কাতর হতে দেখিনি। সকল সময়ই তিনি থাকতেন প্রসন্নচিত্তে। এক যুগেরও বেশী সময় ধরে তাঁর স্ত্রী রোগে শর্য্যাশায়ী ছিলেন, কিন্তু এ ব্যাপারে তাঁকে উদ্বিগ্ন হতে দেখা যায়নি। বরং এ সময়ও তিনি দেশের আনাচে-কানাচে সাংগঠনিক সফর করে বেড়িয়েছেন, এমনকি বিদেশ সফরও করেছেন অনেকবার দ্বিধাহীন চিত্তে। এসব দেখে মনে হয়েছে তিনি যেনো সর্বান্তকরণে মেনেই নিয়েছেন যে মহান আল্লাহ তাঁকে যখন যেখানে যেভাবে যে অবস্থায়ই রাখুন না কেন তিনি খুশী থাকবেন।

খান সাহেবের লেখা পড়তে আমি খুব আকর্ষণ বোধ করি। মাসিক পৃথিবীর প্রায় সংখ্যায়ই তাঁর লেখা প্রকাশিত হতো, আর সেগুলো পড়তে পড়তে মাসিক পৃথিবীটাই আমার প্রিয় ম্যাগাজিনে পরিণত হয়েছে। খান সাহেবের 'স্মৃতি সাগরের ঢেউ' পুস্তকটি পড়ে তাঁর মন মানসিকতার ছাপ আমার অন্তরে গেথে যায়। আমার মনে হয় এমনি একটি সুন্দর মনবিশিষ্ট মানুষকে কারো ভালো না লেগে পারেনা। "বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস "নামে যে পুস্তক তিনি রচনা করেছেন তাতে শুধু বাংলার মুসলমানই নয় গোটা ভারত বর্ষের মুসলমানদের দুঃখ বেদনার ইতিহাস যেমনি ফুটে উঠেছে তেমনি অত্যাচারী গোষ্ঠির হিংস্র থাবার চিত্রও ভেসে উঠেছে। পুস্তকটি যে কতো মূল্যবান তথ্য ধারণ করেছে তা কেবল নিরপেক্ষ মন নিয়ে অধ্যয়নকারীই অনুধাবন করতে পেরেছেন।

আমার কল্পনায় এখনও ভেসে বেড়ায় সেই মানুষটি যাকে আমি দেখতাম হাত দু'টি ঝুলিয়ে পেছনে বেঁধে চলতে। এ যেনো আমার কিশোর বয়সে দেখা যাত্রা ও নাটকের মঞ্চে পাঁয়চারী করা রাজার মতো।

কিছুদিন আগে মাসিক পৃথিবীতে "একটি আদর্শবাদী দলের পতনের কারণ ও প্রতিকার" শীর্ষক খান সাহেবের একটি লেখা প্রকাশিত হয়। লেখাটি পড়ে আমি অভিভূত হয়ে পড়ি এবং তাঁকে অনুরোধ করি তিনি যেনো এ লেখাটিকে একটি পুস্তিকা আকারে প্রকাশ করেন। পরে এটি পুস্তিকা আকারে প্রকাশ করে খান সাহেব আমাকে ডেকে তাঁর অফিসে নিয়ে গিয়ে এর একটি সৌজন্য কপি আমাকে প্রদান করেন। আমি পুলকিত হয়েছিলাম তাঁর এই কাজে।

খান সাহেব পৃথিবী ছেড়ে চলে গেলেন আমার মনে রয়ে গেলো এক অপূরণীয় শূন্যতা। আমার মায়ের সংকটাপন্ন অবস্থার খবর পেয়ে আমি ২ তারিখের গভীর রাতে রওয়ানা দিয়ে ৩ তারিখ ভোরে কুষ্টিয়া পৌঁছি। অক্টোবরের ঐ ৩ তারিখে ছিলো হরতাল। পরের দিন কুষ্টিয়া থেকে রওয়ানা দিয়ে ঢাকা এসে আমি খান সাহেবের পল্টন ময়দানস্থ জানাযার নামাযে যোগ দিতে পারিনি। এ ব্যাথা আমার থেকেই যাবে। পরের দিন পত্রিকায় জানাযার নামাযের ছবি দেখে আমার চোখ জুড়িয়ে গেলো। মনে হলো জানাযায় অংশগ্রহণকারীদের ভিড়ে পল্টন মাঠ কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে গেছে। শুনেছি, পরের দিন জয়পুরহাটের সিমেন্ট ময়দানের জানাযাতে ঢাকার চেয়ে বেশী মানুষের সমাগম হয়েছিল।

এই অসংখ্য মানুষের দোয়া আল্লাহপাক কবুল করুন, এ আমার আন্তরিক কামনা। দুনিয়ার জীবনে হারিয়েও আমরা তাঁর সাহিত্য ভাণ্ডারের মধ্যে খুঁজে পাবো একজন চির সাথী অভিভাবক, উপদেষ্টা হিসেবে। তিনি বেচে থাকবেন আমাদের অন্তরে হৃদয়ে। হয়ে থাকবেন আমাদের পথ চলার একজন অন্তরঙ্গ সাথী। মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীন তাঁর পথের দৃঢ়চেতা সংগ্রামী একজন নিষ্ঠাবান অনুগত বান্দাকে সর্বোচ্চ পুরস্কার জান্নাতুল ফেরদৌস দান করুন। আমীন।

জানাযার স্মৃতি
মুহাম্মদ আব্দুল ওয়াহেদ

আব্বাস আলী খান যিনি সরাটিজীবন গেয়ে গেলেন-জীবনের জয়গান, সেদিন ৩রা অক্টোবর তাঁর এ নশ্বর জীবনের হলো চির অবসান। রব্বুল আলামীনের অমোঘ বিধান-"কুল্লু নাফসীন যায়েকাতুল মাউত।"-সকল প্রাণীকেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে। আল্লাহ পাকের এ চিরস্থায়ী নিয়মের নেই কোনো ব্যতিক্রম, ছিলোও না কোনো দিন। আল্লাহর রাসুল মুহাম্মদ স. কেও এ নিয়মের অধীন চিরবিদায় নিতে হয়েছে। তাঁরই এক শ্রেষ্ঠ উম্মত আব্বাস আলী খানের রুহকে আল্লাহপাকের এক বিশেষ ফিরেশতা এসে নিয়ে গেলেন তাঁর প্রিয় 'অলী' রব্বুল আলামীনের দরবারে। দুনিয়ারূপ এ গ্রহের বিভিন্ন স্থানে তিনি গেছেন - গেছেন বহু দেশে। যে দেশেই গিয়েছেন, কিছুদিন থেকে সে সফর শেষে মুসাফির আব্বাস আলী খান আবার ফিরে এসেছেন তাঁর প্রিয় জন্মভূমি বাংলাদেশে। এমনি করে যাওয়া আসার পালা চলে। কিন্তু সেদিন তিনি এমন এক জগতে চলে গেলেন, যেখানে তিনি কোনোদিন যাননি, আর সেখানে যারা যায় তারা কেউ আর এ গ্রহে ফিরে আসেনা। ঐ জগতই মানব জীবনের শেষ এবং চিরস্থায়ী নিবাস, বলেছেন মানুষের রব আল্লাহপাক। "ইন্নাদ্দারাল আখিরাতা লাহিয়াল হাইওয়ান" জীবনের ঘরতো পরকাল। ওটাই মানুষের আসল নিবাস।

আব্বাস আলী খান আল্লাহর এ জমিনে হেঁটে হেঁটে আল্লাহর ঘর মসজিদে কতো নামায পড়েছেন। আজ তাঁরই জীবনের শেষ নামাযে জানাযায় তিনি আর হেঁটে যেতে পারলেন না। তিনি তো কতো হাঁটতেন -হাঁটতেন ধীর পদক্ষেপে গুরুগম্ভীর বাহাদুরী চালে। অথচ তাতে ছিল না কোনো অহংকার, কোনো দাপট। কার ভয়ে যেনো পা মেপে মেপে পথ চলতেন। যেনো জমিনের উপর চলতে গিয়ে তাঁর মালিক নারাজ না হয়ে যান। দেখেছি তাঁকে মাঝে মাঝে হাত দুটি পিছনের দিকে নিয়ে ঝুকে চলতে। দৃষ্টি তার নিবদ্ধ থাকতো মাটির প্রতি যেনো তার সে মস্তক উদ্ধত না হয়। আর আল্লাহর দরবারে তিনি অহংকারী হিসেবে পরিগণিত না হন। আব্বাস আলী খান অতীব ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার ৮৫ বছরের এ স্বল্প জীবনে অনেক পথ হেঁটেছেন, অনেক পথ দেখেছেন-এসব পথের মাঝেই তিনি একদিন খুঁজে পেয়েছেন আললাহর পথ, সত্যের পথ তথা একামাতে দীন তথা ইসলামী আন্দোলনের পথ। এ পথ ধরেই তিনি পৌছে গেলেন তাঁর মহান মালিকের দরবারে।

আমীরে জামায়াতের গাড়ীটি আল্লাহর ঐ বান্দাহর লাশের কফিনবাহী গাড়ীটি ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দের গাড়ী বহরের নেতৃত্ব দিয়ে নিয়ে চলল জামায়াতে ইসলামী

মহানগরী অফিস থেকে পল্টন ময়দানের দিকে। সেখানে আগে থেকেই জানাযা নামাযের অনুষ্ঠান পরিচালনার সার্বিক ব্যবস্থা করে রাখা হয়েছিল। এ্যামবুলেন্স থেকে খান সাহেবের লাশ নামানো হলো মাটির উপর। অনুষ্ঠান ঘোষণা দিচ্ছিলেন জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের প্রচার সেক্রেটারী আব্দুল কাদের মোল্লা। আব্দুল কাদের মোল্লা চিরবিদায়ী অতিথির বিদায়ী অনুষ্ঠান পরিচালনার ঘোষক। ঘোষিত হলো সেক্রেটারী জেনারেল মতিউর রহমান নিজামীর নাম-যিনি ভারপ্রাপ্ত আমীর থাকাকালীন অথবা আমীরে জামায়াতের অনুপস্থিতিতে বৈঠক পরিচালনায় তাঁরই পাশে বসে সহযোগিতা করতেন। সামনের কেন্দ্রীয় মজলিশে শুরার অধিবেশনে তাঁকে আর দেখতে পাবো না। তার পাশে মতিউর রহমান নিজামীও আর বসবেন না। .... মতিউর রহমান নিজামী জলদ গম্ভীর স্বরে মহান রাব্বুল আলামীনের বড়ত্বের ঘোষণা দিলেন-ঘোষণা দিলেন এক ও একক এবং অদ্বিতীয় লাশরীক আল্লাহর যিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। সকল ইলাহর উলুহিয়াতকে অস্বীকার করে ও একমাত্র আল্লাহরই ইলাহ এবং মুহাম্মাদুর রাসুল্লাহ স. তারই বান্দাহ ও রাসুল এ স্বীকৃতি দিয়ে ঘোষিত হলো-আশাহাদু আল্লাইলাহা ইল্লাল্লাহু....

এরপর ঘোষিত হলো আমীরে জামায়াত অধ্যাপক গোলাম আযমের নাম বিশ্ব ইসলামী আন্দোলনের প্রবীণ নেতা অধ্যাপক গোলাম আযম-বাতিলের যম। ...কথা বলতে গিয়ে তিনিও শিশুর ন্যায় ডুকরে কেঁদে উঠলেন তাঁরই সাথীটির জন্য। তাহলে কি সেদিন বন্ধুর বিদায় লগ্নে তাঁর মানস সরোবরে বান ডেকে ছিলো। বন্ধুর হারানো স্মৃতি কি ঐ অশিতিপর বৃদ্ধের স্মৃতি সাগরে স্মৃতির ঢেউ তুলেছিল, যা অশ্রুমালা হয়ে ঝরে পড়ল।

জানাযার নামাযের ইমামতি করলেন অধ্যাপক গোলাম আযম। আব্বাস আলী খানের নির্জীব লাশ তাকে কাঁদিয়ে তুলল। অন্যদেরকেও কাঁদালেন কিন্তু তিনি কাদলেন না। কতো বড় শক্ত বুড়ো। অথচ এর আগে তিনিও তো কেঁধেছেন। আজ তিনি কেন কাঁদবেন-আজ যে তাঁর আনন্দের দিন। তিনি তো তাঁর আসল বাড়ীতে চলে যাচ্ছেন। আসল বাড়ীতে যেতে কেউ কি কাঁদে। সে বাড়ীতেই তো তার প্রিয়জন, রাব্বুল আলামীনের সাথে সাক্ষাৎ হবে। সে সাক্ষাতের নেশায় তিনি তো আত্মহারা।....

আর তাঁর রব উত্তম মেহমানদারীর ঘোষণা দিয়েই রেখেছেন-"কানাত লাহুম জান্নাতুল ফেরদাউসি নুজুলা।"

কফিনে শায়িত আব্বাস আলী খানের স্পন্দনহীন দেহটি নিরব-নিথর হয়ে আছে। দেখলাম আরেকবার নুরানী সেই চেহারাটি কিন্তু তা আজ নিস্তব্ধ জীবনের স্পন্দনহীন কায়া। তাকিয়ে দেখলাম কয়েকবার তার লাশ। শেষবার তাকালাম, স্মৃতির জানালা দিয়ে-দেখলাম তাঁর এক বৈপ্লবিক জীবন। সে বিপ্লব ইসলামী বিপ্লব তথা ইসলামী আন্দোলন। সে জীবন এক সংগ্রাম মুখর সংগ্রামী জীবন। যে জীবন সংগ্রাম ছিলো

হকের পক্ষে বাতিল ব্যবস্থার বিরুদ্ধে। আজ সে হক বাতিলের চিরন্তন দ্বন্দ্বের হলো অবসান। থেকে গেলো জীবন সংগ্রাম, সমাপ্ত হলো বৈপ্লবিক জীবনের। আজ যে তিনি ফসল পাবার অপেক্ষায় অপেক্ষমান।....

হক বাতিলের দ্বন্দ্ব চিরন্তন কিন্তু মানুষের এ দুনিয়ার জীবন নয়তো চিরন্তন। কফিনে এলায়িত স্পন্দনহীন লাশটি যেন জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের সকল নেতা-কর্মীদেরকে ডেকে বলছে, "ওগো আমার সাথীরা! আমি তো চলেই যাচ্ছি, আমার মহান রবের ডাকে-তোমরা যারা আছো যেনো গাফেল হয়ে না যাও। বৈপ্লবিক চেতনার যেনো মৃত্যু না হয় তোমাদের। আমি তো মরেই গেছি, মৃত্যুর আগেই তোমাদের যেনো থেমে না যায় প্রাণের স্পন্দন। সামনের দিকে হও আগুয়ান। গাফেল হয়ে থেকো না আর। আল্লাহ যে গাফেলদের ভালোবাসেন না কখনো। নাফসের তোমরা দাস হয়ো না। দুনিয়াকে দীনের আন্দোলনের উপর প্রাধান্য দিয়ো না। ইকামাতে দীনকে জীবনের উদ্দেশ্য বানাও। মনে রেখ, তোমরাই তো এ যামানায় দীনের দায়ী। তোমাদের সাথে দেখা হবে আমার জান্নাতের মিলন মেলায়।"

আব্বাস আলী খান সারা জীবন লিখেছেন ইসলাম, ইসলামী আন্দোলন ও মুসলমানদের ইতিহাস। আর আজ আমরা লিখছি তাঁর ইতহিাস। এই তো নশ্বর দুনিয়ার খেলা। ..... তিনি চলে গেলেন দুনিয়া ও আখিরাতের মাঝখানের যবনিকা উন্মোচন করে ওপারের জগতে..... পল্টন ময়দানে অনুষ্ঠিত নামাযে যানাযার মাধ্যমে আমরা তাকে জানালাম শেষ বিদায় সম্বর্ধনা। এরপর আর বিদায়-সম্বর্ধনা নাই। স্মৃতি তাঁর হয়ে থাক চির অম্লান দীনদার-ঈমানদারদের মনের আকাশে।

যে স্মৃতি যায়না ভোলা

এ. জি. এম. বদরুদ্দোজা

আমি আব্বাস আলী খান সাহেবকে সাংগঠনিক জীবনে যেভাবে পেয়েছি তার কিছু স্মৃতি তুলে ধরছি।

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠাতার ঘোষণা ঃ স্বাধীন বাংলাদেশে ইসলামী রাজনীতির উপর নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়ার পর ১৯৭৯ সালে সর্ব প্রথম মরহুম খাঁন সাহেব জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের ঘোষণা দেন।

আনুগত্যের মূর্ত প্রতীক ঃ ইসলামী শরীয়ত আনুগত্যের যে নীতিমালা নির্ধারণ করে দিয়েছে মরহুম খান সাহেবের জীবনে তার বাস্তব প্রয়োগ লক্ষ্য করেছি। ভারপ্রাপ্ত আমীর হিসেবে খান সাহেব ময়দানে প্রধান দায়িত্বশীলের ভূমিকা পালন করেছেন এক যুগেরও বেশী সময় ধরে। কিন্তু মজলিসে শূরার অধিবেশনসহ সংগঠন পরিচালনায় দেখা গেছে তিনি আমীরে জামায়াতের সম্মতি বা নির্দেশ ছাড়া কোন দিন একটা কথাও বলেননি। তাছাড়া বয়সে আমীর জামায়াতের ৮ বৎসরের বড় হওয়া সত্ত্বেও কোন দিন ১% পরিমাণও আনুগত্যের নীতি পরিহার করেননি।

সকল পর্যায়ের মানুষের অভিবাবক ঃ ছোট বড়, রুকন, কর্মী জেলা আমীর, কর্মপরিষদ সদস্য সকলের জন্য তিনি ছিলেন গ্রহণযোগ্য মুরুব্বী বা অভিভাবক। অল্প কথায় তিনি অনেক মূল্যবান পরামর্শ দিতেন। সাধারণ লোকজনও তাঁকে একান্ত আপনজন ও অভিভাবক মনে করতেন।

আপোষহীন ও অটল মনোভাব ঃ তাঁর জীবনে লক্ষ্য করেছি, যে কোন ধরনের সিদ্ধান্ত ও পরিকল্পনা বাস্তবায়নে তিনি ছিলেন আপোষহীন, অটল ও নির্ভীক ব্যক্তি। ১৯৯১ সালের জাতীয় নির্বাচনে ফেনী সফর উপলক্ষ্যে আমরা লক্ষ্য করেছি ফেনী ও সোনাগাজীর জনসভার সময়সূচী পূর্ব নির্ধারিত সূচীর পরিবর্তন দেখে তিনি বিব্রতবোধ করেন। মুহতারাম মকবুল আহমদ সাহেব তাঁর মনোভাব দেখে আমাকে বললেন, জেলা আমীর হিসেবে তুমি এর সঠিক ব্যাখ্যাসহ খান সাহেবকে কনভিনস করতে হবে। আমরা তাঁকে স্থানীয় সমস্যাসহ সূচী পরিবর্তনের যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা দেয়ার পর তিনি সহজে মেনে নেন।

সুসাহিত্যিক ও পণ্ডিত ব্যক্তিত্ব ঃ জামায়াতে ইসলামীর সর্ব স্তরের জনশক্তি ও দায়িত্বশীলদের মধ্যে ইতিহাস বিশ্লেষণ ও সাহিত্য রচনায় খাঁন সাহেব ছিলেন দক্ষ ও নির্ভরযোগ্য। উপমহাদেশে ইংরেজ শাসন, মুসলমানদের প্রকৃত ইতিহাস, জামায়াতে ইসলামীর ইতিহাস ও ঐতিহ্য ইত্যাদি বিষয়ে তিনি ছিলেন কালের সাক্ষী। এমন কিছু প্রবন্ধ তিনি রচনা করেছেন যেগুলো তাঁর অবর্তমানে সত্যের

সাক্ষ্য হিসেবে ইসলামী চেতনার সংগ্রামে নিয়োজিত ব্যক্তিদের জন্য অমূল্য সম্পদ বলে স্বীকৃতি লাভ করবে।

ঐতিহ্য নিয়ন্ত্রক ঃ দীর্ঘ ৯ বৎসর যাবত কেন্দ্রীয় মসলিসে শূরার সদস্য থাকা অবস্থায় প্রায়ই লক্ষ্য করেছি মরহুম খান সাহেব ছিলেন জামায়াতে ইসলামীর ইতিহাসে ও ঐতিহ্য রক্ষার ব্যাপারে নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা পালনকারী। জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা চলতে থাকলে বিভিন্ন মতের প্রতিফন ঘটে। (বিশেষভাবে রাজনৈতিক বিষয়।) এমতাবস্থায় ইতিহাসের সাক্ষী মরহুম খাঁন সাহেব আমীরে জামায়াতের অনুমতিক্রমে জামায়াতে ইসলামীর ইতিহাস ও ঐতিহ্যের উপর অত্যন্ত মর্মস্পর্শী বক্তব্য তুলে ধরেন। তাঁর সে মূল্যবান বক্তব্য শূরার সদস্যদের চিন্তার ঐক্য সাধনে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে।

অনাড়ম্বর জীবন ঃ বিস্তর যোগ্যতা এবং ব্যক্তিত্ব অর্জন করার পরও তিনি ব্যক্তিগত পারিবারিক ও সাংগঠনিক জীবনে ছিলেন অত্যন্ত সাদাসিদে ও মাটির মতো। অন্য দিকে তিনি ছিলেন একাধারে ভদ্র, অমায়িক ও বিশেষ ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন। আলাপে মিষ্টভাষী ও হাস্যরস সৃষ্টিতেও পারদর্শী। পবিত্র মক্কা শহরে ওমরা পালনের উদ্দেশ্যে সফরে হাজার হাজার ভক্ত ও অনুসারী তাঁকে দেখতে আসেন। তখনও তিনি সাধারণ বেশে লুঙ্গি ও পাঞ্জাবী পরিহিত অবস্থায় হাস্যোজ্জ্বল মুখে প্রবাসীদের সাথে কুশল বিনিময় করেন। এমনিভাবে তার পুরো জীবনই ছিল অনাড়ম্বর ও স্বাভাবিক।

বলিষ্ঠ ও মর্মস্পর্শী বক্তা ঃ মরহুম খান সাহেবকে বার্ধক্য ও অসুস্থ অবস্থায়ও দেখেছি সুন্দর ও মধুর ভাষায় অথচ বলিষ্ঠ বক্তব্য রাখতে। বিগত দু'যুগের সকল গণতান্ত্রিক আন্দোলনে তিনি ছিলেন দেশের প্রথম শ্রেণীর একজন বক্তা। তাঁর বলিষ্ঠ বক্তব্যে আকৃষ্ট হয়ে হাজার হাজার কর্মী বাহিনী আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল।

রবের মুহ্সীন বান্দা ঃ ব্যক্তিগত জীবনে মরহুম খান সাহেব ছিলেন আল্লাহর একজন প্রিয় বান্দা। ইসলামের বিধান মোতাবেক যে সকল ইবাদত সম্পাদন করে একজন মুমিন তাকওয়ার গুণ অর্জন করে আল্লাহ্র রঙ্গে নিজকে রঙ্গিন করে তোলে তিনি ছিলেন তার অন্যতম। আল্লাহ্ তাকে মুহ্সীন বান্দা হিসেবে কবুল করেছেন এটাই আমাদের বিশ্বাস।

পরিশেষে বলতে হয় মরহুম খান সাহেব ছিলেন সাহাবায়ে কেরামের অনুসারী একজন ইক্বামাতে দ্বীনের সিপাহ্ সালার। আমরা তাঁর দীর্ঘ সংগ্রামী জীবনের স্মৃতি কোনো অবস্থাতেই ভুলতে পারি না। আল্লাহ্ তাঁর প্রতি রাজী, তিনিও আল্লাহ্র প্রতি সন্তুষ্ট চিত্তে তাঁর দরাবরে পৌঁছে গেছেন। আল্লাহ্ তাঁকে জান্নাতে উচ্চ মর্যাদা দান করুন। আমীন।

স্মৃতির বাতায়নে আব্বাস আলী খান

অধ্যাপক ফরহাদ হুসাইন

সে অনেকদিন আগের কথা। সম্ভবতঃ ১৯৭৮ সাল, কুষ্টিয়া বাবর আলী গেটের একটু ভেতরে জামায়াত অফিস। তারই চত্বরে এক ফাঁলি জায়গা। বিকেলের হেলে পড়া আলতো আলো রঙ মাখিয়ে দিয়ে গেছে প্রকৃতির পরতে পরতে। ফোল্ডিং চেয়ারে বসা অনেক লোকের সমাগম। প্রশ্নোত্তরের আসর চলছিল। সেখানে বিরাজ করছিল এক স্নিগ্ধ গুরু গম্ভীর পরিবেশ। কয়েকজন নেতার মাঝখানে মধ্যমনি হিসেবে বসা আছেন জনাব খান সাহেব -শুভ্র শ্মশ্রুধারী এক জ্যোতির্ময় মহাপুরুষ।

লোকেরা প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে চলেছেন, শান্ত অথচ ধীরোদাত্তভাবে উত্তর দিয়ে চলেছেন অবিরাম-কিন্তু চেহারায় কোনোরূপ বিরক্তির চিহ্ন নেই।

সেদিন দেখেছিলাম মাথায় হালকা রঙের কিস্তি টুপি, একটি সাধারণ পাঞ্জাবী, পরনে লুঙ্গি আর চশমার মধ্যে জ্ঞানোজ্জ্বল প্রতিভাদীপ্ত টানা টানা বড় বড় দু'টি চোখ। অদ্ভূত সুন্দর সিংহ শার্দুলের সরল রাজকীয় চেহারা। নিরহঙ্কার ঋজু বক্তব্য। প্রশ্নোত্তরের সে চমৎকার বক্তব্যের ফাঁকে ফাঁকে দু'চারটি কুরআনের আয়াত আর তার ব্যখ্যা শ্রোতাদেরকে যেনো চুম্বক আকর্ষণে আকৃষ্ট করে রেখেছিল।

এর আরো কয়েক বছর পর, আমার এই প্রাণপ্রিয় মুরুব্বীর সাথে বহুবার দেখা ও একান্তে কথা বলার সুযোগ হয়েছে।

তিনি যখন চেয়ার জুড়ে আমীরে জামায়াত অধ্যাপক গোলাম আযমের পাশে বসে থাকতেন -তখন ব্যাক্তিত্বের ব্যঞ্জনায় তাঁকে দারুণ ভয়ঙ্কর লাগতো। কথা বলার সাহস করেও কাছে গিয়ে নিজের মনে নিজেই হোঁচট খেয়ে ফিরে আসতাম। ইতোমধ্যে তাঁর বেশ কয়েকটা বই এবং বিভিন্ন লেখালেখিও পড়েছি, তাতে বোধ হয়েছে চেহারায় যেমন গম্ভীর, ভাষাতেও তেমনি পান্ডিত্য এবং ভাবে অতলান্ত গভীরতা- আর বিস্তৃতিতে প্রশান্ত মহাসাগর।

এরই মধ্যে একদিন তাঁর "স্মৃতি সাগরের ঢেউ" গ্রন্থখানি পড়লাম। মনে হলো এ এক অপূর্ব -অদ্ভূত মানুষ-যেনো প্রশান্তের শান্ত কুলুনাদ আটলান্টিকে গিয়ে আছাড় খেয়ে পড়েছে। সে স্মৃতির উর্মিগুলো এতোই প্রাণবন্ত এবং বিস্তৃত-যেনো একটি শতাব্দী একটি মহাদেশ। রসগ্রাহী সে রচনায় পেলাম চলমান জীবনের নিরলস গতিময়তার স্বাদ। তাতে পেলাম স্মরণের সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠার এক অবিরাম গতিধারা। ভাব করতে খুবই ইচ্ছে হলো। সুযোগ খুঁজতে খুঁজতে একসময় মওকা পেয়ে গেলাম।

'৯০ এর দশক, কেন্দ্রীয় প্রোগ্রাম। সকাল ১১ টায় চায়ের বিরতি, খান সাহেব মঞ্চে একা। হাল্কা নাস্তা চলছিলো, আস্তে ধীরে তার কাছে গেলাম। অল্প একটু ভাব বিনিময়ের পরেই সাহিত্য রসিক প্রিয় নেতার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললাম, "স্যার আপনার স্মৃতি সাগরের ঢেউ পড়লাম, আপনি যা জমিয়েছেন তাতে কেউ ভাববেনা যে এই মুরুব্বীর এই লেখা হতে পারে। তিনি বললেন, "যেমন!" বললাম, "ঐ যে তাজ মহলের কাছে গিয়ে আপনি লিখেছেন, মমতাজ-শাহজাহান, অষ্টম এডওয়ার্ড- মিসেস সিম্পসনের প্রেমের কথা এবং কল্পকাহিনী শিরি ফরহাদ আর লাইলী মজনুর কথা।"

তিনি খুবই মুধুর মুচকী হেসে বললেন, "তাতে কি বুঝলেন।" বললাম, "জি স্যার!" অপূর্ব-অদ্ভূত শিল্প সৃষ্টি হয়েছে ঐখানে -এমনকি সমস্ত রচনাটাই"। দেখলাম তার স্মৃতি শক্তির বহর। বুঝলাম ঝুনা নারিকেল, রসের রসিক ছাড়া কেউ তা বুঝবেনা। খোসা ছাড়িয়ে নিতে পারলেই শুকনো কাঠের অন্তরালে দুখানা রুটি আর শরবতের সমন্বয় একই সাথে সমন্বিত।

১৯৮৯ সাল, উপজেলা নির্বাচন। কুমারখালীর হেলিপ্যাডে জনসভা, প্রধান অতিথি ভারপ্রাপ্ত আমীরে জামায়াত আব্বাস আলী খান, বিশেষ অতিথি আরেক জিন্দাদিল মর্দে মুজাহিদ অধ্যাপক মাওলানা মাহমুদ হুসাইন আল মামুন। দুপুরের খানা একই টেবিলে খেলাম, খাবার টেবিলে শান্ত, বিনয় ও নম্রতার সাথে প্রায় নিশ্চুপ ভোজনরত খান সাহেব। মাঝে মাঝে মার্জিত ভাষায় বলছেন, আর নয়, আর লাগবেনা।

খানা পিনা শেষে আমরা স্থানীয় মঞ্চে চলে গেলাম। আসারের পর জলপাই রঙের শোরোয়ানী, আব্বাস ক্যাপ পরিহিত প্রধান অতিথি খান সাহেব মঞ্চে আরোহন করলেন। তাঁর বক্তব্যের জন্য নাম ঘোষণার সাথে সাথে গগন বিদারী শ্লোগানে মুখরিত হলো কুমার খালীর আকাশ-বাতাস।

শুরু হলো বক্তৃতা, আদর্শিক ও অধ্যাত্মিক নেতার বাচনভঙ্গি, শব্দ চয়ন, ভাব ব্যঞ্জনা, অর্থদ্যোতনা সব মিলিয়ে জাতি গড়ার এবং মানব মুক্তির এক দিক নির্দেশনা প্রকাশ পেলো সে বক্তৃতা মালায়।

জনসভা শেষে মাঠ থেকেই খান সাহেবের গাড়ীতে উঠে বসলাম ডাক্তার আনিসুর রহমান সাহেব, মামুন ভাই ও আমি। তাঁর পাশে বসে কিছু কথা বলার সুযোগ হলো। আমি কুমার খালীর ইতিহাস-ঐতিহ্য তুলে ধরলাম। বল্লাম এই আমার কুমারখালী, স্বাধীনতা আন্দোলনের অগ্নিপুরুষ কাজী মিয়াজানের জন্মভূমি, বাংলা মুসলিম গদ্যের পিতামহ মীর মশাররফের জন্মভূমি। ১৮৫৮ সালে জন পিটার সন যখন বাংলার গভর্ণর, তখন কুমারখালী মহকুমা ছিলো। এর প্রথম মুন্সেফ ছিলেন ভারতের প্রখ্যাত ঐতিহাসিক এ.সি গুপ্তের পিতা জে. সি. গুপ্ত। – খান সাহেব আমার সব কথাগুলো মন দিয়ে শুনছিলেন এবং আস্তে করে বললেন, 'আমার লেখা "বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস" পত্রিকায় বেরুচ্ছে, পড়েন তো?' – বললাম 'জি স্যার, পড়ি।'

খান সাহেব পান-রসিক ছিলেন, আমারও অভ্যাস ছিলো। পলিথিনের ব্যাগে করে একটা পানের ডিব্বা সাথে করে নিয়ে এসেছিলেন। সেবারে কুষ্টিয়ার রেষ্ট হাউজে তাঁর অবস্থান ছিলো। কিছু পান তিনি চাকু দিয়ে নিজ হাতে কেটে নিলেন- আমার অনুরোধে এবং বললেন, "এতো পানেরতো দরকার নেই, শুধু ফরহাদ সাহেবের অনুরোধে নিলাম," নিজেকে খুবই ধন্য মনে করলাম, সামান্য একটু পানের জন্য তিনি এমন সুন্দর করে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন।

১৯৯৯ সাল, মার্চের ১, ২ ও ৩ তারিখ কেন্দ্রীয় মজলিসে শুরার বৈঠক ছিলো। চিকিৎসার জন্য ৪ ও ৫ তারিখ ঢাকায় অবস্থান করছিলাম। খান সাহেবের অফিস কক্ষের সামনে এসে পর্দার পাশে দাঁড়িয়ে ভাবলাম ঢুকবো কিনা? কিন্তু মনে বড়ই বাসনা জাগলো দেখা করার। মনে হলো এমনও তো হতে পারে যে দীনের পথের আমার একান্ত বন্ধু, এ অশিতিপর বৃদ্ধ অভিভাবক, আল্লাহ প্রেমে পাগল পারা এ মুরুব্বীর সাথে আর দেখা নাও হতে পারে।

মনের দ্বিধার বাঁধ ভেঙ্গে আমি তাঁর অফিস কক্ষে ঢুকলাম। দেখলাম আমার এ শ্রদ্ধেয় জ্ঞান তাপস কাগজ-কলম মনে একাকার হয়ে আছেন। সালাম দিতেই উত্তরের সাথে সাথেই বসতে বললেন। সামনের চেয়ারে বসে পড়লাম। বললাম, "স্যার লেখার ভেতর আর ডিষ্টার্ব করবোনা।"

জামায়াতের জেলা সেক্রেটারী সম্মেলন। মাগরিবের বিরতি চলছে। আলফালাহর চতুর্থ তলায়; নামাজ শুরুর অল্প-বাকি। উনাকে দেখে উনারই লেখার একটা গল্প করছিলাম- পেছনে একহাত-আরেক হাতে বেঁধে কাছে এসে বললেন, "কি করছেন"-বললাম, "গল্প" আবারও বললেন, "কিসের গল্প?" বললাম 'স্যার, আপনার "স্মৃতি সাগরের ঢেউ'তে হাওড়া ষ্টেশনের ট্রেনের সিঁড়িতে ডাল ফেলে যাত্রীদেরকে মল ভাবিয়ে কামরা ফাঁকা রাখার কৌশলের সেই কথা চিত্রের গল্প বলছিলাম। এ গল্প বাসায় ছেলেমেয়েদের পড়ে শুনিয়েছি ওরা সব হেসে লুটোপুটি।'

আমার শ্রদ্ধেয় মুরুব্বী এবং সুপ্রিয় সাহিত্যিক, বাণী চিত্রকর সেদিন হাহা করে মুখ উচু করে হাসলেন। ও দিনকার অমন হাসি হাসতে তাঁকে আমি আর কোনোদিন দেখিনি।

মনে পড়ে এই তার সাথে আমার জীবনের শেষ কথাও সংক্ষিপ্ত আলাপ-চারিতা। আজ স্মৃতির বাতায়নে তাঁর কত যে জীবন চিত্র ফুটে উঠছে তা ভুলার নয়।

আব্বাস আলী খানের দাফন সম্পন্ন

জয়পুরহাট সংবাদদাতা ॥ গতকাল (মঙ্গলবার) সকালে বর্ষীয়ান জামায়াতে ইসলামী নেতা মরহুম আব্বাস আলী খানের দ্বিতীয় নামাজে জানাজা জয়পুরহাট শহর হইতে প্রায় দুই কিলোমিটার পশ্চিমে জয়পুরহাট চুনাপাথর খনি ও সিমেন্ট প্রকল্পের মাঠে অনুষ্ঠিত হয়। জয়পুরহাটে স্মরণকালের বৃহত্তম জানাজায় প্রায় এক লক্ষ লোক শরিক হন। পরে মরহুম খানের বাসভবনের সম্মুখস্থ পারিবারিক কবরস্থানে তাঁহার স্ত্রীর কবরের পাশে তাঁহার দাফন সম্পন্ন হয়। মরহুমের নামাজে জানাজায় অন্যান্যের সঙ্গে অংশগ্রহণ করেন জামায়াতের সেক্রেটারী জেনারেল মওলানা মতিউর রহমান নিজামী, সিনিয়র নায়েবে আমীর মওলানা শামসুর রহমান, সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল মওলানা আব্দুল্লাহ আল মুজাহিদ, জয়পুরহাটের বিএনপি দলীয় দুই এমপি আব্দুল আলিম ও আবু ইউসুফ মোঃ খলিলুর রহমান এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের স্থানীয় নেতৃবৃন্দ। ইহাছাড়া শত শত বাস, মাইক্রোবাস, কার, ট্রেন ও মোটর সাইকেলে আগত উত্তরাঞ্চলের জামায়াতে ইসলামী ও ইসলামী ছাত্রশিবিরের হাজার হাজার নেতা-কর্মী ও গুণগাহী মরহুমের নামাজে জানাজায় শরিক হন। গত সোমবার রাত সোয়া তিনটার দিকে ঢাকা হইতে একটি এম্বুলেন্সে মরহুম খানের লাশ এখানে আনিয়া তাঁহার প্রতিষ্ঠিত তালেমুল ইসলাম একাডেমী প্রাঙ্গণের মসজিদ চত্বরে রাখা হয়। মরহুম খানের জানাজায় অংশগ্রহণের জন্য আগত হাজার হাজার মানুষ ও শত শত যানবাহনের ভীড়ে গতকাল সকাল ৭টা হইতে দুপুর ২টা পর্যন্ত জয়পুরহাট শহরে দুর্বিষহ যানজট সৃষ্টি হয়।

দৈঃ ইত্তেফাক ৬/১০/৯৯

আত্মীয় স্বজনের কলম থেকে

মরহুম আব্বাস আলী খানের কোনো ছেলে নেই। একমাত্র মেয়ে তাঁর। মেয়ে বিয়ে দেবার পর জামাইকে নিজের কাছে, নিজের বাড়িতে নিয়ে আসেন। অবশ্য জামাইর বাবার কাছ থেকেই জামাইকে চেয়ে আনেন। অতপর নিজের ঘরবাড়ি-জমাজমি সবকিছুই জামাইর হাতে সঁপে দিয়ে নিজেকে পুরোপুরি উৎসর্গ করে দেন আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠার কাজে। অবশ্য খান সাহেবের জামাই খান সাহেবের পূর্বেই ইহকাল ত্যাগ করেছেন।

মরহুম খান সাহেবের মেয়ে বেঁচে আছেন। মেয়ের ঘরে খান সাহেবের ১ নাতি আর তিন নাতনী রয়েছে। নাতি ও নাতনীদের ছেলে-মেয়েরা রয়েছে। তাদের কেউ কেউ লিখেছেন খান সাহেব সম্পর্কে। খান সাহেব সম্পর্কে তাদের হৃদয়ের অনুভূতির অভিব্যক্তি ঘটেছে তাদের লেখায়।—সম্পাদক।

আমার আব্বা

খান জেবুন্নেছা চৌধুরী

জেবুন্নেছা চৌধুরী মরহুম আব্বাস আলী খানের একমাত্র সন্তান, একমাত্র কন্যা। খান সাহেব তাকে 'জেবু আম্মা' বলে ডাকতেন। 'জেবু আম্মা' খান সাহেবের কলিজার টুকরা। খান সাহেব আল্লাহর ডাকে সাড়া দিয়ে ইহকাল ত্যাগ করলেও তাঁর কলিজার টুকরা 'জেবু আম্মা' বেঁচে আছেন। 'জেবু আম্মা' এ লেখায় তাঁর আব্বার পারিবারিক জীবনের একটি জীবন্ত ছবি এঁকেছেন। - সম্পাদক

সেই ছোট বেলায় বেশীরভাগ আব্বার সঙ্গেই কেটেছে। খাওয়া, শোয়া, গোসল সবই আব্বা করাতেন। বেশীরভাগ সময় তো আব্বা বাইরে কাটাতেন। আব্বা না থাকলে আমার খুব কষ্ট হতো। আমি লুকিয়ে লুকিয়ে আব্বার জন্য কাঁদতাম, ভাত খেতামনা, আম্মা দেখতে পেলে সবাইকে বলে দিবে সেই লজ্জায়।

আমার আম্মা বড় পরহেযগার ছিলেন। ফুরাফুরা শরীফের পীর আব্দুল হাই সিদ্দিকী সাহেবের খাস খলিফা শাহ সুফী আলহাজ্ব সায়েম উদ্দিন আহমেদ সাহেবের একমাত্র কন্যা আমার আম্মা। অনেক রাত জেগে নামায কালাম কুরআন তেলাওয়াত ও হাদীস পড়তেন। তাই আম্মার সাথে আমার শোয়া হতোনা। আব্বা আমাকে নিজ হাতে খাইয়ে ঘুমিয়ে দিতেন। কতো গল্প, আবৃত্তি, ইসলামী গান গাইতেন। এভাবেই আমি ঘুমিয়ে পড়তাম। আব্বা খুব সুন্দর রান্না করতে পারতেন। সখের বসে মাঝে মাঝেই আমাকে নিয়ে রান্না করতেন, নাস্তা তৈরি করতেন।

খুব ছোট বেলার কথা। দাদার বাড়ীতে কি যেনো এক ফাংশন, আব্বা-আম্মা ব্যস্ত। এই ফাঁকে কিছু পরিচিত মহিলা আমাকে নিয়ে বেড়াতে যাবে। আমি কিছুতেই যাবনা। আম্মাকে বলতেও দিবেনা। ওরা আমাকে জোর করে নিয়ে গেল। ওরা বলেছে এখনি আসব। ভেবেছি পাশের বাড়ী বা কাছেই। তাই চলে গেলাম ওদের সাথে। ওরা যাচ্ছে ওদের আত্মীয় বাড়ী। কিছুদূর যেতেই আমি ভীষণ কাঁদতে শুরু করি। এদিকে আমাকে না পেয়ে সবাই অস্থির খোঁজা খুঁজি। পুকুর ডোবা সব জায়গায় জাল ও ডুবুরী দিয়ে তন্ন তন্ন করে খুঁজে পেলোনা। চারদিকে লোকজন পাঠানো হলো। আমাকে হারিয়ে আম্মা আব্বা পাগল প্রায় বিছানায় জায় নামাযে গড়াগড়ি খাচ্ছেন। এদিকে আমার কান্না কাটিতে ওরাও আমাকে নিয়ে ফিরে রওয়ানা করলো। গ্রামে ঢুকতেই বহু লোকের মুখে আমরা শুনতে পেলাম ঘটনা কি ঘটছে । আমার ভয়ে দুঃখে কান্নার মাত্রা বেড়ে গেলো। দুরু দুরু বুকে বাড়ী ফিরতেই আব্বা জড়িয়ে নিয়ে সে কি কান্না! আজও সে স্মৃতি আমার কাছে অম্লান।

আব্বার খুব পাখি শিকারের ঝোঁক ছিলো। খুব ভালো শিকারী ছিলেন। মাছ মারতে

পারতেন খুব। বড়শি ও জাল দিয়ে খুব মাছ ধরতেন। একবার আব্বা শিকারে গেলেন বন্ধুদের নিয়ে বালুরঘাটের (ভারত) মাতাইশের কোনো এক বিলে। আব্বা শিকার নিয়ে ব্যস্ত। এ সময় আব্বার এক বন্ধু হাওর বিলে পাইক বরকন্দাজ পাঠিয়েছে আব্বাকে নিতে। অগত্যা শিকার রেখে গেলেন বন্দুর বাড়ী। গিয়ে দেখেন খাসি জবাই করে দৈ মিষ্টি ইত্যাদির বিরাট আয়োজন। আব্বার বন্ধু বললেন, আমার এলাকায় শিকার করে এমনি চলে যাবেন এটা হয়না। সেই বন্ধুর ছেলের কাছে আব্বা আমাকে বিয়ে দেন মহা ধুমধাম করে।

আমার শ্বশুরের অন্তরটা ছিলো খুব বড়। তাই তো আমাকে শ্বশুরবাড়ী বেশী থাকতে দিতেননা। আম্মা একাকী খুব কষ্ট পেতেন আমাকে ছাড়া। এটা আমার শ্বশুর খুব অনুভব করতেন। শ্বশুর শ্বাশুড়ী মারা যাবার পর আব্বা আম্মার কাছে থাকা শুরু হলো। আব্বা প্রায় সময় বাইরে যেতেন। বাইরে থেকে আমাকে চিঠি দিতেন। সব চিঠিই 'জেবু আম্মা' বলে শুরু করতেন। কোথায় ঘুরলেন কি খেলেন সব কিছুই তিনি একটা একটা করে আমাকে লিখতেন।

এম.এন.এ. থাকাকালে জেনারেল আইয়ুব খানের "ফ্যামিলি ল অর্ডিন্যান্স" বাতিলের বিরুদ্ধে পবিত্র কুরআনের পক্ষে বিল উথাপন করলেন। এতে ইসলাম বিরোধী চক্র আব্বাকে হত্যার ষড়যন্ত্র করলো। রাওয়ালপিণ্ডির এক রাস্তার পাশ দিয়ে আব্বা হাঁটছিলেন। সেখানেই তাঁকে গাড়ী চাপা দেয়া হলো। মৃত্যুর ফয়সালা তো মহান রাব্বুল আলামিনের হাতে, তাই তিনি প্রাণে বেঁচে গেলেন। কিন্তু হাত ভেঙ্গে গেলো এবং এক সাইড থেতলে গেল। তখন যোগাযোগ ব্যবস্থা ভালো ছিলোনা । পেপার পেতে ২/৩ দিন লাগতো। টেলিগ্রাম এলো "জেবু আম্মা ভালো আছি।" আমরা একটু অবাক হলাম কেন এই টেলিগ্রাম। পরে সব জানতে পারলাম। আব্বা রাওয়ালপিণ্ডি হতে জয়পুরহাট এলেন তখনও হাতে ব্যাণ্ডেজ আছে। উনাকে জয়পুরহাট রেল স্টেশনে বিরাট সম্বর্ধনা দেয়া হলো। আব্বা দরজার দিকে এগুতেই জড়িয়ে ধরে ভীষণ কেঁদেছিলাম, আজও সে স্মৃতি ভুলিনি।

একদিন আমি বড় মেয়ের ড্রয়িং রুমে বসে আছি। আমার তিন মেয়ে আমি এবং আব্বা। হঠাৎ আমি বললাম, আমি হজ্বে যেতে চাই। আব্বা বললেন, 'আমাকেই তো নিয়ে যেতে হয়।' আব্বার সঙ্গে হজ্বে গেলাম। কতো জায়গায় ঘুরেছি এক সাথে, নামায পড়েছি, খেতে বসে আব্বা বারবার আমাকে এটা সেটা উঠিয়ে দিতেন আর বলতেন তুই এতো কম খাস।

আব্বা ছিলেন খুব নিয়মতান্ত্রিক। তাঁর জীবন ছিলো সুশৃঙ্খল সুনিয়ন্ত্রিত। সব সময় অল্প খাবার খেতেন। প্রায় দিন বিকেলে চা নিজের হাতে তৈরি করতেন। আমার জন্য রেখে দিতেন। রাত ৩টায় উঠে তাহাজ্জোদ নামায পড়তেন দীর্ঘক্ষণ ধরে। মধুর স্বরে তিনি কুরআন তেলাওয়াত করতেন। কুরআনের তাফসীর পড়তেন কখনও উর্দু, কখনও ইংরেজী, কখনও বাংলায়। একাকী নীরবে কান্নাকাটি করতেন। আব্বার মোনাজাত শুনে চোখে পানি আসতো।

আমার আম্মা দীর্ঘ ১০ বছর অসুস্থ ছিলেন। আব্বাকে পাহাড় সমান সবর করতে দেখেছি। ঢাকা থেকে এসেই আব্বা আম্মার পাশে গিয়ে সালাম দিতেন। আম্মা মুচকি হাসি দিয়ে লজ্জায় মনে মনে সালামের জবাব দিতেন। আম্মা অসুস্থ অবস্থায়ও আব্বার বাড়ী আসা এবং খাওয়ার দাওয়ার খোঁজ খবর নিতেন। আব্বা কি পছন্দ করেন মনে করিয়ে দিতেন ।

আব্বা সংগঠনকে এতো ভালবাসতেন যে সাংগঠনিক শৃঙ্খলা খুবই মেনে চলতেন এবং মতের পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও ঐক্যমতে কাজ করতেন। শত অনুরোধেও সাংগঠনিক কাজ ফেলে বাড়ীতে একদিনও থাকেননি। বেশ কিছুদিন হতে আমি পুরাপুরি আব্বার উপর ডিপেন্ডেন্ট ছিলাম, স্বামী তো অনেক আগেই মারা গেছেন। সাগর সমান শূন্যতা নিয়ে আম্মার উপর নির্ভর করেছিলাম। সেই আম্মাও আমাকে ছেড়ে চলে গেছেন। দীর্ঘ ১০ বছরের বেশী সময় খেদমত করার সুযোগ পেয়েছি। আব্বা সব দেখতেন, 'আমার উপর ছেড়ে দিয়ে আল্লাহ প্রেমিক আব্বা চরম ধৈর্যের সাথে ইসলামী আন্দোলন করে গেছেন।

জুলাই '৯৯ আব্বা আমাকে শেষ চিঠি লিখেছেন।* আর 'জেবু আম্মা' বলে কেউ ডাকবেনা, কেউ লিখবেনা। শেষ চিঠিতেও আমাকে উপদেশ দিয়েছেন। সময় ফুরিয়ে এসেছে লিখেছেন। ইসলামী জীবন যাপন করতে বলেছেন। আল্লাহর পথে চলতে পারলে জান্নাতে একত্রে বাস করতে পারবো।

আমি ছেলে-মেয়ে কারো উপর ডিপেন্ডেন্ট থাকি এটা আব্বা পছন্দ করতেননা। অথচ আব্বার অসুস্থতার সময় দীর্ঘদিন ঢাকায় থেকেছি, একদিনও বাড়ী যেতে বলেননি। কেন যেনো চেয়েছেন আমি সব সময় ওনার পাশে থাকি। তাইতো শেষ সময় পর্যন্ত ওনার পাশে ছিলাম।

আমার স্বামী ও আম্মা মারা যাবার পর উনি আমাদের বারবার ধৈর্য ধরার তাগিদ দিয়েছেন। আল্লাহর ফয়সালাকে মনে প্রাণে মেনে নিতে বলতেন। তাইতো আব্বা অসুস্থ হওয়ার পর আল্লাহর দরবারে আরজু ছিলো আল্লাহ আমাকে ধৈর্যশীলদের মধ্যে একজন বানিও।।

* পত্রটি 'প্রতিবিম্বিত প্রতিলিপি' অধ্যায়ে ছাপা হয়েছে।-সম্পাদক।

আমার প্রিয় নানাজীকে যেমন দেখেছি

নাসিমা আফরোজ

মরহুম খান সাহেবের বড় নাতনী

ইসলামী আন্দোলনের এক নির্ভীক সৈনিক, অন্যতম সিপাহসালার, বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ ও সুসাহিত্যিক মরহুম আব্বাস আলী খান আমার শ্রদ্ধেয় নানাজী। গত ৩রা অক্টোবর মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীনের ডাকে সাড়া দিয়ে তিনি আমাদের সবাইকে ছেড়ে চলে গেছেন।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদের অভিভাবক। বিপদে-আপদে সর্বসময় আল্লাহকে ডাকতাম, আর সুযোগ পেলেই নানাজীকে বলতাম। উনি সব সময় আমাদের জন্যে দোয়া করেছেন। আর আমরাও নানাজীকে মনের সব কথা খুলে বলে যেনো শান্তি পেতাম আর বড় সাহস হতো। বিয়ের পরে যখন ঢাকায় এলাম তখন থেকে নানাজীকে নিয়ে নাখালপাড়া ও মুহাম্মদপুরে থাকতাম। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমার জন্য নানাজীর সাথে থাকার অফুরন্ত সুযোগ করে দিয়েছিলেন। আমরা আমেরিকায় চলে যাওয়ায় নানাজী সংগ্রাম বিল্ডিং-এ থাকতেন। দেশে ফিরে এসে ৯ মাস মধুবাগ (মগবাজার) ছিলাম, বলতে গেলে প্রতিদিন নানাজী আমাদের দেখতে যেতেন। মাঝে মধ্যে খেতেন আমার বাসায়। আমি প্রায়ই নানাজীর জন্য হাতে তৈরি কেক, বিস্কিট, বুটের হালুয়া ও মাছ তরকারী রান্না করে দিতাম। এরপর নানাজী নিজে (৩/৩ গ্রীনওয়ে বড় মগবাজারে) তিনতলায় বাসা নেন। সঙ্গে থাকতেন আমার ভাই ও ভাবী। আমরাও সুযোগ বুঝে একই বিল্ডিং-এ একই তলায় চলে এলাম সবাই একসঙ্গে থাকার এক অনাবিল আনন্দে। নানাজী সকাল-সন্ধ্যের মধ্যে অনেক বার আমার বাসায় আসতেন। উনার বাসা থেকে বাইরে যাবার সময় প্রতিবারই আমার বাসা হয়ে যেতেন। সব সময় ভালো কিছু রান্না, সুপ, বিকেলের একটু নাস্তা দিতে পেরে আমারও খুব শান্তি লাগতো। কখনো নানাজী মুখ ফুটে কোনো খাবার দাবারের কথা বলতেননা, সামনে নিয়ে দিলে কিছুটা মুখে দিতেন, ভালো লাগলে ক'দিন পর বলতেন, ঐ খাবারটা আছে কিনা? বরাবরই উনি কম খেতেন। কম কথা বলতেন, প্রয়োজন ছাড়া কোনো কথা বলতেননা। কিন্তু আমর সব ব্যপারে খুব খেয়াল রাখতেন ও আল্লাহর অপছন্দনীয় কোন কাজ হতে দেখলে বা করলে সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সতর্ক করে দিতেন। আমরাও সত্যি সত্যিই নানাজীর এই কথাগুলোর জন্য মোটেও বিরক্ত হতামনা বরং লজ্জায় নিজেদের ভুলগুলো শুধরানোর চেষ্টা করতাম। নানাজীর প্রতিটা কাজ বা কথাই ছিলো আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য। দুনিয়ার কোনো স্বার্থই উনার কাছে অগ্রাধিকার পেতোনা। আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সাথে উনার ছিলো গভীর সম্পর্ক। দুনিয়ার আরাম আয়েশ, ভোগ বিলাস, লোভ, লালসা তাঁকে

স্পর্শ করতে পারতোনা। নিজের ছোট ঘরে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে থাকতেন। নিজের টুকটাক কাজগুলো নিজেই করতেন। তবে সবকিছুর মাঝেই ছিলো এক অনাবিল প্রশান্তি। কোনো ব্যাপারে দুশ্চিন্তাগ্রস্থ হলে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দরবারে সেজদায় মাথা নুইযে দিতেন।

সংগঠনে জড়িত থকার কারণে আমি নানাজীর নাতনী হিসেবে পুরোটা সংগঠনে পরিচিত এবং এই পরিচয়ে পরিচিত থাকতেই যেনো বড় ভাললাগতো। আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সন্তুষ্ট অর্জন করার জন্য ইকামাতে দীনের কর্মী হিসেবে কাজ করতে সব সময়ই ভাল লাগতো, আর ভাল লাগতো এই ভেবে যে নানাজীও এর জন্য খুশী হবেন। মাঝে মধ্যেই আমাদের বাসায় নানাজী দরসে কুরআন পেশ করতেন। দরস বা পারিবারিক বৈঠকের শেষে সব সময়ই নানাজীর একটাই আশা ও ইচ্ছা ছিলো যে আমরা যেনো আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারি। নানাজীর একটাই কথা ছিলো, "যে মেয়ে বিয়ে হলে শ্বশুরবাড়ী চলে যায়। বিয়ের পরেও মেয়ে, নাতী, নাতনী ও তাদের বাচ্চাদের সাথে দুনিয়ায় যেমন আমাকে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন থাকার সুযোগ করে দিয়েছেন পরকালেও আল্লাহ যেনো আমাদের সবাইকে নিয়ে বেহেস্তে এক সাথে থাকবার সুযোগ করে দেন।" উনি সর্বদাই বলতেন যে "তোমরা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করে বেহেস্তের একটা স্তরে আসতে চেষ্ট করো" নানাজির শেষ আশাই একটাই ছিলো যে মেয়ে, নাতী-নাতনীসহ সবাইকে নিয়ে অনন্তকালের বেহেস্তে একই সাথে বসবাস করা। আল্লাহই ভাল জানেন যে আমরা উনার শেষ ইচ্ছাটা পূরণ করতে পারবো কিনা?

নানাজীর জীবনের শেষ পারিবারিক বৈঠকে সূরা 'রাদ থেকে দরসে কুরআন পেশ করেছেন। সূরা রাদের সেই অংশে একজন মুমিনের জন্য ৯টি গুণ অর্জন করার জন্য বলা হয়েছে। নানাজী আমাদেরকে এই ৯টি গুণ অর্জন করার কথা উৎসাহিত করেছেন। আজও আমার ডাইরীতে পয়েন্টগুলো লেখা রয়েছে। কিন্তু শ্রদ্ধেয় নানাজী আর এই দুনিয়ায় নেই, কেউ আর নানাজীর মতো করে কলিং বেল দেননা, খোঁজ-খবর নেননা।

নানাজীর আল্লাহ্‌র কাছে চলে যাওয়াটা আল্লাহর সন্তুষ্টি মোতাবেক ইনশায়াল্লাহ হয়েছে। কাউকে বুঝতে না দিয়ে ইবনেসিনার হাসপাতালের বেডে নিরবে প্রতিপালকের কাছে চলে গেলেন। নানাজীর জীবন একটা সাফল্যের জীবন। আমার জীবনে এটাই প্রথম লেখা তাই কোনোটাই গুছানো সুন্দর হবেনা কিন্তু মনের মধ্যে গুমড়ে উঠা কথাগুলো সাজিয়ে লেখার চেষ্টা করেছি। মনের মধ্যে অনেক কথা, অনেক স্মৃতি, অনেক ব্যাথা নানাজী চলে যাবার পর নতুন করে ইসলামী আন্দোলনে কাজ করার উৎসাহ পেয়েছি ও আল্লাহ রাব্বুল আলামীনকে সন্তুষ্ট করবার জন্য নানাজীর শেষ ইচ্ছা আমাকে আরও অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে। আমাদের জীবনও যেনো নানাজীর জীবনের মতো সাফল্যের জীবন হয়। আমরাও যেনো রাসুল স. প্রদর্শিত আদর্শমতো চলতে পারি দেই কামনা করছি।

আমাদের প্রিয় নানাজী

লায়লা নাসরীন

লায়লা নাসরীন খান সাহেবের একমাত্র মেয়ের ঘরের দ্বিতীয় নাতনী

নানাজীকে নিয়ে লিখতে হবে এ কথা কখনো ভাবিনি। স্মৃতির পাতায় অনেক কিছুই জমা হয়ে আছে। দুঃখ, কষ্ট, আনন্দ, বেদনার সব স্মৃতিই আজ বারবার মনের পর্দায় ভেসে উঠছে। যখন বুঝতে শিখিনি তখন থেকেই তাঁর কাছে কোলে পিঠে বড় হয়েছি। থাক্তাম খঞ্জনপুরে। আমরা চার ভাইবোন, আব্বা, আম্মা এবং নানাজী, নানী আম্মা।

খুব ছোটবেলার স্মৃতি কিছু কিছু স্পষ্ট মনে আছে। নানাজীর হাতে ছাড়া কখনো খেতে চাইতামনা। নানাজী যখন থাকতেননা তখনই খুব কাঁদতাম। এতো বেশী কাঁদতাম যে আমার কান্না দেখে বাসার কেউ সুস্থির থাকতে পারতোনা। নানী আম্মার দায়ত্বি ছিলো আমাকে থামানোর। নানুমার আদরে আদরে এক সময় ঘুমিয়ে যেতাম।

নানাজী আমাদের ভাইবোনদের নিয়ে প্রায়ই ছড়া লিখতেন এবং পড়ে শোনাতেন। আমি তাঁর কাছে প্রথম গোলাপ ফুল আঁকা শিখেছিলাম। একবার একটি সুন্দর গোলাপ এঁকে উনি তার পাশে লিখলেন ঃ

"গোলাপ তোমার মিষ্টি সুবাস মিষ্টি হাসি
তাইতো তোমায় বড্ড আমি ভালবাসি"

গোলাপ ফুলটি আমি সযত্নে রেখে দিয়েছিলাম দীর্ঘদিন। তিনি যেভাবে গোলাপটি আঁকা শিখিয়েছিলেন আজও আমি সেভাবেই আমার ছেলেমেয়েদের আঁকা শেখাই।

আমার ছোট বোন পারু আমার চেয়ে সাত বছরের ছোট ছিলো। কিন্তু স্কুলে এক সাথে যেতাম। আমি যখন এসএসসি পাস করলাম তখন ও খুব মন খারাপ করেছিল। সেই সময় নানাজীর লেখা একটি ছড়ার কথা আজও মনে পড়ে।

পান্না বুবু পাশ করেছে বেশ করেছে
পারু বুবুর কষ্ট হবে একলা যেতে স্কুলে
ভয় কি তাতে?
আল্লাহ্ আছেন সাথে!

নানাজী দেশে বা বিদেশে বাইরে কোথাও গেলে সব সময় আমাদের জন্য কিছু না কিছু নিয়ে আসতেন। মৃত্যুর আগে পর্যন্ত তাঁর এই অভ্যাসের কোনো পরিবর্তন হয়নি। আমাদের বিয়ের পরেও তাঁর এই স্নেহের দান থেকে আমরা বঞ্চিত হইনি।

মূল্যের দিক থেকে এগুলো যদিও ছিলো খুবই সামান্য, কিন্তু আমাদের স্মৃতিতে তাঁর এসব দান চির অম্লান হয়ে রয়েছে।

নানাজীর কাছ থেকে খুব ছোট বেলাতেই 'সালাতুত তসবীহ্" শিখেছিলাম। স্কুলে পড়ার সময় থেকেই আমার দায়িত্ব ছিলো তাঁর রচিত বেশ কিছু লেখা কপি করার। বিয়ের আগে পর্যন্ত আমি পড়শুনার ফাঁকে ফাঁকে এ দায়িত্ব পালন করেছি। মনে পড়ে একবার তিনি এ জন্য আমাকে এক হাজার টাকা দিয়েছিলেন। ঐ টাকা দিয়েই প্রথম আমি ব্যাংকে একাউন্ট খুলেছিলাম।

হঠাৎ করে সবাইকে অবাক করে দেয়া ছিলো নানাজীর একটি স্বভাব। আমি যখন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় হোস্টেলে থাকতাম তখন অপ্রত্যাশিতভাবে তাঁর কাছ থেকে আমার নামে টাকা আসতো। আমার বান্ধবীরা এর জন্য আমাকে ঈর্ষা করতো। কারণ, আব্বার কাছ থেকে নিয়মিত টাকা পাবার পরেও নানাজী প্রায় টাকা পাঠাতেন।

তিনি প্রায়ই নিয়মিত আমাদের নিয়ে পারিবারিক বৈঠকে বসতেন। আমাদের দোষত্রুটিগুলো তিনি তুলে ধরতেন এবং তা সংশোধনের জন্য উপদেশ দিতেন। নামায এবং পর্দার ব্যাপারে সবচেয়ে বেশী বলতেন। এসব ব্যাপারে নানীআম্মার মতন হওয়ার জন্য তাগিদ দিতেন। নানীআম্মা ছিলেন অত্যন্ত পর্দানশীন ও দানশীল মহিলা। আমরা নানীআম্মার কাছেই নানাজী সম্পর্কে অনেক গল্প শুনতাম।

নানাজী সব সময় চাইতেন আমরা অর্থাৎ নাতি নাতনীরা যেনো সব সময় তাঁর মতো আল্লাহর রহমত ও মাগফিরাতের ভিখারী হই। কেননা তাহলেই রাব্বুল আলামীন আমাদের জান্নাতে স্থান দিবেন। নানাজী সব সময় চাইতেন আমরা যেনো এ পৃথিবীর মতো জান্নাতেও এক সাথে থাকতে পারি এবং সেজন্য আমল করতে পারি। তিনি মৃত্যুর প্রায় ৩১ মাস আগে আমাদের জন্য একটি অসিয়তনামা লিখে গেছেন। সেখানে তিনি তাঁর লেখা বইগুলো পড়ার জন্য আমাদেরকে বিশেষভাবে অনুরোধ করেছেন। এ কথা সত্যি যে নানাজীর মৃত্যু হয়েছে পরিণত বয়সে। কিন্তু আমাদের কাছে মনে হয়েছে তিনি যদি আরো কিছুদিন আমাদের মাঝে এভাবেই বেঁচে থাকতেন! পার্থিব জীবনে তাঁর কোনো চাওয়া পাওয়া ছিলোনা।

আমাদের নানাজীর মৃত্যুতে দেশ বিদেশের হাজারো মানুষের শোক বাণী আমরা কাগজে দেখেছি। শোকার্ত জনতার ঢল নেমেছিল ঢাকায়, বগুড়ায় ও জয়পুরহাটে। বিশেষ করে জয়পুরহাটে দলমত নির্বিশেষে সকল স্তরের মানুষ যেভাবে তাঁর প্রতি শেষ শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা জানিয়েছেন তাতে আমরা আরো বেশী আবেগ আপ্লুত হয়েছি। মনে হয়েছে সমস্ত দেশজুড়ে রয়েছে আমাদের সাথী, বন্ধু ও অভিভাবক। তাঁর মৃত্যুতে শুধু আমরাই শোকার্ত নই, গ্রামে, গঞ্জে, নগরে, বন্দরে আমাদের মতো সবাই তাঁর জন্য প্রাণ খুলে দোয়া করেছেন। আল্লাহ যেনো তাঁর ত্যাগ ও কোরবানীকে কবুল করেন। খোদা যেনো নানাজীকে জান্নাতের উচ্চ মর্যাদা দান করেন এবং আমাদের ধৈর্য ধারণের সামর্থ দান করেন। তাঁকে হারানোর শূন্যতা যেনো আল্লাহপাক পূরণ করে দেন।

আমার নানাজী

শামীমা পারভীন চৌধুরী (পারু)

পারু খান সাহেবের কনিষ্ঠ নাতনী। আদর করে তিনি তাকে 'পারু বুবু' ডাকতেন। কনিষ্ঠা হবার কারণে পারু খান সাহেবের মায়া মমতা এবং আদর যত্ন একটু বেশীই পেয়েছে। পারুর লেখাটি আকর্ষণীয়। - সম্পাদক

কি লিখবো নানাজীর কথা, উনার বড় আদরের সবচেয়ে ছোট নাতনী 'পারু বুবু' (নানাজীর ভাষায়) অর্থাৎ আমি। প্রতিটি চিঠিতেই নানাজীর সম্বোধন ছিলো 'পারু বুবু'। শেষে লিখতেন তোমার "প্রিয় নানাজী"। চিঠির প্রথমেই ভালমন্দ ২/৪টা কথা লিখার পরেই লিখতেন কুরআনের কথা, আল্লাহ, নবী রসূলগণের কথা। কিভাবে চললে জান্নাতে একত্রে বসবাস করা যাবে এ কথা উনি আমাদের পারিবারিক বৈঠকে কুরআনের উদ্ধৃতি দিয়ে বুঝাতেন। নানাজী বাড়ীতে থাকলে নানাজীর কুরআন তেলাওয়াতের মধুর কণ্ঠের আওয়াজ শুনেই ঘুম ভেঙ্গে যেতো। নানাজী কখনও ডাকতেননা যে উঠ নামায পড়। উনি কায়দা করে প্রয়োজনের অতিরিক্ত শব্দ, হাটা-চলা ইত্যাদি করতেন যাতে আমাদের ঘুম ভেঙ্গে যায়। নামায কুরআন তেলাওয়াত শেষে নানাজী আমাকে নিয়ে মর্নিং ওয়াকে যেতেন। মাঝে মাঝে রাস্তার পাশের ডোবা থেকে শাপলা ফুল তুলে দিতেন। বিকালের দিকে মাঝে মাঝে নানাজীর সাথে বাইরে যেতাম। নানাজী আমার পছন্দের টুকিটাকি খাবার, খেলনা কিনে দিতেন। নানাজী খুব স্বাধীনচেতা ও সৌখিন ছিলেন। উনি দেশের বাইরে গেলেই আমাদের জন্য চুড়ি, মালা এ ধরনের জিনিসও আনতেন। আমি যখন দেশে আসি বা যাই (আমি কয়েক বছর থেকে সিংগাপুর প্রবাসী) তখন নানাজী আমার ছেলেকে প্রতি ওয়াক্তের নামাযে নিয়ে যেতেন। এমনিতেও বাইরে নিয়ে যেতেন। নানাজী কখনই আমাদের আদেশের সুরে কথা বলতেননা। শুধু এটা করলে ভাল হতো, এটা করা উচিত। এভাবে বলতেন। নানাজীর সাথে আমাদের সম্পর্ক বিশেষ করে যে কোনো বাচ্চার সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিলো। আমাদের সবাইকে উনি জান দিয়ে ভালবাসতেন। আমাদের যে কোনো বিপদে নানাজীকে দেখেছি জায়নামাযে থাকতে। প্রায়ই উনি আমাদের জন্য সাদকা দিতেন। এক দিনের ঘটনা মনে পড়ছে, আমার খুব মন খারাপ লাগছিল কারণ ঐ দিন নানীমার সঙ্গে খঞ্জনপুরে নানীমার আব্বা আম্মার কবর জিয়ারত করে ওখানে উনার ভাইদের বাড়ী বেড়ানোর কথা ছিলো। কিন্তু হঠাৎ বৃষ্টি এসে পড়ার কারণে যেতে না পারায় খুব কষ্ট লাগছিল। আর একটু পরেই নানাজী আমাকে ডেকে ১টা কবিতা লিখে দিলেন। (জায়গায়টির নাম খঞ্জনপুর) কবিতাটি নিম্নরূপ ঃ

"আজকের এ বাদলা দিনে স্কুল বিহনে, কেমন কাটাব বলো।
চলো না, রিকশা ডেকে খঞ্জনপুরে বেড়াইতে চলো।

সারাদিন খেলাধুলা শেষে ফিরিব সাঁজে,
আনন্দেতে ঢুলিয়া পড়িব ঘুমের মাঝে।"

কোনো ছোটো ঘটনা ঘটলেই উনি একটা না একটা কিছু লিখে ফেলতেন। নানাজী খুব সুন্দর গজল (ইসলামিক গান) গাইতে পারতেন। বিশেষ করে কারেন্ট গেলেই আমরা সবাই তাঁর জীবনের গল্প শুনতে চাইতাম। নানাজী যা মজা করে গল্প করতেন মনে হতো সত্যিই সব সামনে হাজির। নানাজী মাঝে মাঝেই ক্যাসেটে কুরআন তেলাওয়াত চুপ করে চোখ বন্ধ করে শুনতেন। গাড়ীতে উঠেই কুরআনের ক্যাসেট ছাড়তে বলতেন ড্রাইভার সাহেবকে। নিজেও গাড়ী স্টার্ট দেয়ার সাথে সাথেই একটু জোরে জোরেই দোয়া পড়ে নিতেন। নানাজী সব সময় আমাকে নিয়ে যেতেন বাড়ী থেকে ও নিয়ে আসতেন ঢাকা থেকে।

আবার এই শেষ বারের মতন (সাংগঠনিক সফর শেষে) জাপান থেকে ফিরার পথে সিঙ্গাপুরে নানাজী আমার কাছে ৪দিন ছিলেন। এটা ছিলো এই ১৯৯৯ সালেরই ৮ই মে'র কথা। অসুস্থ অবস্থায় হসপিটালে যাবার পূর্ব মুহূর্তেও নানাজীর সাথে কথা বলেছি টেলিফোনে। নানাজী বলতেন আল্লাহ্‌র রহমতে আগের চাইতে ভালো। নিজের শত কষ্টও উনি বুঝতে দিতে চাইতেননা কাউকে। যে কোনো ব্যাপারই নানাজী আমাদের বুঝতে দিতেননা অথচ নিজেই আমাদের জন্য চিন্তা করতেন সব সময়। আমরা বাড়ী বাইরে চলে যাবার সময় বলতেন আল্লাহ্‌র উপরে সোপর্দ করে দিলাম। নানাজী যখন বুঝতে পারলেন জীবন শেষের পথে, তখন উনি উনার শেষ লিখনীতে নিজের ডাইরীতে থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে উঠে বসে লিখলেন, (আমি তখনো সিঙ্গাপুর। তখনো এসে পৌঁছুতে পারিনি)

"পারু বুবু"
তুই একটা পাগল। ধৈর্য ধরো, সবুর, করো। আমার যদি হায়াত না থাকে, তবে দুনিয়ার কোনো ডাক্তারই আমাকে বাঁচাতে পারবেনা। যদি এ জীবনে দেখা না হয় তবে মৃত্যুর পরে জান্নাতে দেখা হবে।

ইতি তোমার
"প্রিয় নানাজী"

বড় প্রিয় নানাজী আমার। বড় ভরসার, বড় সম্মানিত নানাজী আমার। আমরা তো কাঁদবোই সেইসাথে আমাদের পাশে লাখো মানুষ, মু'মিন ভাইরা, মুরুব্বীরা কাঁদছেন আমার প্রাণপ্রিয় নানাজীর জন্য। নানাজী যে এতো মানুষের প্রিয় ছিলেন যা উনার মৃত্যুর পরে দিবালোকের মতো সত্য বলে প্রমাণিত হলো।

স্মৃতিতে অম্লান আব্বাস আলী খান
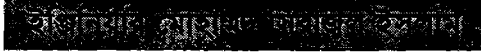
মরহুম আব্বাস আলী খানের নাতজামাই। বড় নাতনী নাসিমা আফরোজের স্বামী

আব্বাস আলী খান মরহুম আর এ দুনিয়ার আমাদের মাঝে নেই। আমাদের অতি শ্রদ্ধেয় নানাজী গত ৩রা অক্টোবর' মহান রাব্বুল আলামীনের ডাকে সাড়া দিয়ে এ দুনিয়া থেকে চির বিদায় নিয়ে চলে গেছেন (ইন্না লিল্লাহে ....)।

উনার সাথে আমার পরিচয় ১৯৭৫ সালের শেষ দিকে। সময়টা সঠিক মনে নেই। উনার বড় নাতনী নাসিমা আফরোজ-এর (নানাজীর একমাত্র মেয়ের বড় মেয়ে) সাথে আমার বিয়ে হয়।

১৯৭৬ সালে ১২ই ফেব্রুয়ারী আব্বাস আলী খান মরহুমের পরিবারের সাথে আমার সামাজিক বন্ধন স্থাপিত হয়। মুরগী যেমন তার ছোট ছোট বাচ্চাদেরকে নিজের শরীরের নীচে পাখা দিয়ে বাইরের বিপদ থেকে রক্ষা করে। তেমনি করেই নানাজী তাঁর পরিবারের সবাইকে আগলিয়ে রাখতেন। আল্লাহ্‌র দরবারে দোয়া করতেন অহরহ ঃ সবার ভালোর জন্য। মরহুম নানাজীর প্রচণ্ড বিশ্বাস ছিলো আমার উপরে, কোনো পারিবারিক সমস্যা বা সিদ্ধান্তের প্রয়োজন হলেই বলতেন যে নাসিমকে জিজ্ঞাসা করো। এসব ব্যাপারে কোন ভূমিকা ছাড়াই সরাসরি কথা বলতেন। কথা সংক্ষেপ করতেন। সরাসরি কারও উপর সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দিতেননা। সিদ্ধান্তে পজিটিভ দিকগুলো তুলে ধরে উনার মতামত জানিয়ে দিতেন। শ্বশুড় সাহেব ইন্তেকাল করার পর মাইয়িতকে কোথায় কবর দেওয়া হবে এ নিয়ে আলোচনা হচ্ছিলো। নানাজী শুধু বললেন, যে জয়পুরহাটে নিজেদের বাড়ী আঙ্গীনায় মেইন রোডের পার্শ্বে কবর হবে এবং সেখানে আরও ৭/৮ জনের কবর দেবার মতো স্থান রাখলেই চলবে। আমি প্রথমে প্রতিবাদ করেছিলাম। পরে বুঝতে পারলেন যে ওখানেই উনি নিজের কবর এর স্থান হিসেবে বেছে নিয়েছেন। কবরস্থানের পার্শ্বেই তিনতালা বিল্ডিং করে সাদাকাত ট্রাস্টের সাইনবোর্ড ঝুলিয়ে রেখে গেছেন। উনি মারা যাবার আগে বলেছেন যে ওখানে একটা ইসলামী লাইব্রেরী হবে এবং ট্রাস্টের আরাফত দীনি দাওয়াত ও ইসলামী সমাজকল্যাণমূলক কাজ হবে। আজ উনি সেই কবরস্থানেই চির নিদ্রায় শায়িত আছেন।

সবাইকে বিশ্বাস করতেন। খুউব সরল সাদাসিদে স্বভাবের মানুষ ছিলেন। উনার আদরের কোনো বাহ্যিক রূপ ছিলোনা। উনার আদরকে বুঝতে হলে উনার আত্মার সাথে সম্পর্ক করতে হতো। শিশুদেরকে ভীষণ ভালোবাসতেন এবং দেখা হলেই ওদের সাথে কথা বলতেন বা কিছুটা সময় তাদের খেলায় অংশ নিতেন।

রাসূল স. যেমনটি করতেন, নানাজীও যেনো তেমনিটি করতে চেয়েছেন সব সময়। মেহমানদারীতে উনার কোনো তুলনা ছিলোনা । জামাই হবার পর বিভিন্ন সময় নানাজীর সাথে ঢাকায় ২/১ রাত কাটাতে হয়েছে। এটুকু সময়ের মধ্যে আমি যা যা খেতে ভালোবাসতাম তা উনি কিনে আনতেন। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা জ্ঞান ছিলো অত্যন্ত প্রখর, উনার পরিবারে এসেই আমি সর্ব প্রথম দৈনন্দিন নামাযের জন্য পাক-সাফ করা আলাদা লুঙ্গির ব্যবস্থা রাখতে শিখলাম। আজও বাসায় নামাযের লুঙ্গিটা আলাদা থাকে এবং মাঝে মধ্যে তা আবার আলাদাভাবে পাক করে ধুয়ে দেয়া হয়। নানাজী বড় সৌখিন ছিলেন, এই বৃদ্ধ বয়সেও তাঁর নাতনীর হাতের কাজ করা পাঞ্জাবী পরতেন। নিজেই ডিজাইন ছাড়া সাদা পাঞ্জাবী কিনে এনে তাঁর নাতনীকে দিয়ে কাজ করিয়ে নিতেন। আমি উনাদের পরিবারের বড় নাতনী জামাই হয়েও যেনো ও বাড়ীর বড় ছেলের আদর পেতাম। আসলে মরহুম নানাজী গোটা পরিবারকে একটা আত্মার বন্ধনে বেধে রেখেছিলেন।

ইসলামী আন্দোলনের একমাত্র সংগঠন হিসেবে প্রথমে জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তান ও পরবর্তীতে জামায়াতে ইসলামী বংলাদেশ উনার প্রাণপ্রিয় সংগঠন ছিলো। বর্তমানে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের মুহতারাম আমীরে জামায়াতের দাওয়াতে সাড়া দিয়ে উনি পাকিস্তান আমলে সংগঠনে যোগদান করেন।

বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর প্রাথমিক অবস্থায় জামায়াতে ইসলামীর প্রকাশ্যে কাজ করার সুযোগ ছিলোনা। তাইতো নানাজীকে জীবনের বাজি নিয়ে সংগঠনের কাজ করতে দেখেছি। সংগঠনের অন্যান্য নেতারাও নানাজীর সাথে নিরলস কাজ করেছেন। তখন নানাজী নাখাল পাড়ায় ছোট্ট বাসায় আমাদের সাথে থাকতেন। ঐ সময় মরহুম শহীদ জিয়াউর রহমান তাঁর মন্ত্রীসভায় নানাজীকে যোগদান করার জন্য পর পর দু'বার আমন্ত্রণ জানান। নানাজীর উত্তর ছিলো নেতিবাচক, উনি বলেছিলেন যে শুধুমাত্র বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম যোগ করলেই সব ইসলামিক হয়ে যায়না। আল্লাহর রঙ্গে রঙিন একদল সাচ্চা ঈমানদার লোকের দলছাড়া ইসলামী হুকুমাত গড়া সম্ভব নয়।

১৯৮২ থেকে ১৯৮৮ সাল পর্যন্ত স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে নানাজীর ভূমিকা ছিলো আপোষহীন। ঐ সময় প্রায়ই আমার ভক্সওয়াগণ কারে করে উনাকে বিভিন্ন জায়গায় নিয়ে গিয়েছি সন্ধ্যের পর। আন্দোলনের স্বার্থে কোনো কষ্টই তাঁকে বিচলিত করে নাই। একবার সংগঠনের সিদ্ধান্ত মোতাবেক নানাজীকে প্রেসক্লাবে বক্তব্য রাখতে বলা হলো, ঐ সময় ১৪৪ ধারা জারী ছিলো এবং ঐ ধরনের বক্তব্য দেয়া নিষেধ ছিলো। আগের দিন সন্ধ্যায় মুহতারাম মুজাহিদ ভাই আমাকে ডেকে নিয়ে বললেন, আগামীকাল আমি যেনো অফিসে না যাই এবং সকাল থেকেই খাঁন সাহেবের সাথে সাথে থাকি। উনি প্রেসক্লাবে যাবার সময় যেনো আমি গাড়ী নিয়ে পেছনে পেছনে যাই। উদ্দেশ্য ছিলো পথিমধ্যে কোন কিছু ঘটলে আমি আত্মীয় হিসেবে উনার সাহায্যে লাগতে পারি। সকাল হতেই এস বির লোকেরা খান সাহেবের (ভাড়া) বাসা ৩/৩ গ্রীনওয়ে ঘিরে ফেললো।

নানাজী বাসায়ই ছিলেন, ঠিক সকাল ৯টায় নীল রংয়ের একটি কার নানাজীকে নেবার জন্য বাসায় এলো এবং ফিরে গেলো। গাড়ীর ভেতর নানাজীকে দেখতে পেলামনা। কিছুক্ষণ পরই খবর পেলাম যে উনি প্রেসক্লাবে এ্যারেস্ট হয়েছেন।

তিনি সংগঠনের নির্দেশ সর্বদাই মেনে চলতেন, এমনকি বৃদ্ধ বয়সেও উনাকে দু-দু'বার ঢাকা ও জয়পুরহাট দুটো সীট থেকে ইলেকশন করতে হয়েছে সংগঠনের নির্দেশ মোতাবেক। আমি একবার আপত্তি করেছিলাম। বলেছিলাম যে শুধু জয়পুরহাট থেকে ইলেকশন করলেই ভালো হয়। কিন্তু নানাজী বললেন যে এটা সংগঠনের সিদ্ধান্ত। এটা অবশ্যই আমাকে মানতে হবে। সংগঠনের নেতৃবৃন্দ ও কর্মীদের মধ্যে উনার জন্য শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা ছিলো অতুলনীয়। একবার রাতে উনাকে এ্যারেস্ট করে রমনা থানায় নিয়ে যায়। ভোরে ফযরের নামায শেষেই দেখা করতে গেলাম। উনি অত্যন্ত হাসিমুখী। শান্ত, কতো সহজভাবে সব ব্যাপারটা নিয়েছেন তা না দেখলে বুঝা যাবেনা। শুধু উনার কিছু প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র পাঠিয়ে দিতে বললেন। মরহুম মাওলানা মওদূদী (র.) ফাঁসির কুঠিতে যে প্রাণবন্তভাবে ছিলেন, মরহুম আব্বাস আলী খানও জেলের মধ্যে তেমনিইভাবেই উনার দিনগুলো কাটিয়েছেন, কখনো দুশ্চিন্তায় পড়েন নাই। কেননা আল্লাহর উপর তাঁর অগাধ বিশ্বাস ছিলো। আর উনিও শাহাদাতের অমৃত সুধা পান করার জন্য সদাজাগ্রত ছিলেন। জান্নাত পাবার জন্য শাহাদতই মু'মিনের জীবনের সবচেয়ে নিশ্চিত ব্যবস্থা, তাই ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের শাহাদাত পাওয়াই একমাত্র তামান্না হওয়া উচিত।

অসুস্থতার শেষ দিকে উনি বুঝতে পেরেছিলেন যে উনার দিন শেষ হয়ে এসেছে। মাঝে মধ্যে তাইতো দুচোখ বেয়ে শুধু পানি গড়িয়ে পড়তো। কথা বলতে পারতেননা বলে ডায়েরীটা নিয়ে লিখতে চেষ্টা করতেন। আমার আব্বা - আম্মাও সর্বদা নানাজীর খোঁজ খবর রাখতেন। উনারা জানতেন যে নানাজীকে সাহাচার্য দেবার জন্যই আমরা গ্রীনওয়েতে থাকতাম। নানাজীর শেষের কটা দিন আমাদের সবার স্মৃতিতে চির অম্লান হয়ে থাকবে। হঠাৎ করে আঘাতটা আসলে হয়তবা সহ্য করা কঠিন হয়ে পড়তো। তাইতো আল্লাহ রাব্বুল আলামীন অসুস্থ অবস্থায় ধীরে ধীরে অল্প সময়ের মধ্যে আব্বাস আলী খান মরহুমকে দুনিয়া থেকে তুলে নিলেন।

সেদিন ছিলো ৩রা অক্টোবর '৯৯ । বিরোধীদলগুলো হরতাল ডেকেছিলো। আমি একা মগবাজার থেকে হেঁটে সকাল ১০ টার দিকে ইবনেসিনা হাসপাতালে পৌঁছি। সেদিন নানাজীর শয্যাপার্শ্বে প্রায় ২ ঘন্টা সময় কাটালাম। উনি একদম শান্ত, শারীরিক দুর্বলতা আরও নিস্তেজ করে ফেলেছে। সেই সময়টুকুই ছিলো উনার সাথে আমার এ দুনিয়ায় শেষ দেখা। ইবনেসি থেকে আমার ইস্টার্ন প্লাজার অফিসে এলাম। ১-১৬ মিনিটে মোবাইল বেজে উঠলো। আমার বড় মেয়ে সিরাজুম মুনিরা শার্লি চিৎকার করে বললো যে নানাজী আর নেই। মুখ থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবেই বেরিয়ে এলো ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন।

পরদিন (৪/১০) দুপুর ২টায় জানাযার নামায পল্টন ময়দানে যেখানে মাত্র তিন মাস আগেই নানাজী তাঁর শেষ মিটিং করেছিলেন। জানাযার আগে আন্দোলনের নেতা ও কর্মীদের জন্য শেষ দীদারের ব্যবস্থা করা হয়েছিল জামায়াতের সিটি অফিসে। মাইয়িতকে নিয়ে সকাল ১১টার দিকে পৌঁছে গেলো। সংগঠনের নেতা ও কর্মীরা শেষ বারের মতো দেখছেন তার ঘুমিয়ে পড়া মুখটা । সে এক গুরু গম্ভীর অথচ হৃদয়বিদারক পরিবেশ। দুপুর ১-৩০ মিনিটে জামায়াত নেতৃবৃন্দ মাইয়িতকে ঘিরে দাঁড়িয়ে, আমি নানাজীর মাথার কাছে। মুহতারাম আমীরে জামায়াত তাঁর দীর্ঘ দিনের আন্দোলনের সাথীর দীদারের জন্য নেমে আসলেন, চারিদিকে চাঁপা কান্নার আওয়াজ, অধ্যাপক গোলাম আযম সাহেব নানাজীকে বিদায়ী চুম্বন দেবেন। আমি নিচু হয়ে নানাজীর মাথাটা একটু উপরে তোলার জন্য মাথার নীচে হাত দিয়েছি। আমীরে জামায়াত মুখটা নীচু করেছেন। অভাবনীয়ভাবে নানাজীর মাথাটা একটু উপরে উঠে এলো আমীরে জামায়াত বেশ শব্দ করে খান সাহেবের কপালে চুম্বন দিলেন। সেই চুম্বনের শব্দ আজও আমার কানে বাজছে। আল্লাহর রাহে বন্ধুর প্রতি কি অকৃত্রিম ভালোবাসা। কি হৃদয় নিংড়ানো বিদায়ের দৃশ্য। তা না দেখলে ভাষায় প্রকাশ করা যাবেনা।

মাইয়িতকে সব সময়ই আমি ঘাড়ে নিয়ে চলছিলাম। সবাই আমাকে বলছিলাম যে আপনের ব্যাথা লাগবে। আপনি ছেড়ে দিন। কেউ যদি জানতো যে আমার কলিজার মধ্যে কি হয়েছে গত ক'দিন তাহলে কেউই আর এ অনুরোধ করতেননা। উদ্দেশ্য নানাজীর শেষ মঞ্জিল পর্যন্ত তাকে জড়িয়ে থাকা, সত্যি বলতে কি মাইয়্যিতের কফিন যেনো হাল্কাভাবে বাতাসে ভাসছিলো। মনে হচ্ছিল আল্লাহর অগণিত ফেরেশতা সেইদিন আমাদের কাফেলায় শরীক হয়েছিলেন এবং তাঁরাও মরহুমের আত্মাকে মোবারকবাদ জানাতে এসেছিলেন। যে নানাজীর ২৩টি বছর তেমন খেদমত করতে পারি নাই। শেষ সময়ে তাঁর তীব্র অনুভূতি আমাকে কুড়ে কুড়ে খাচ্ছিল। যাহোক! মাইয়িতের কফিন পরিবারিক কবরস্থানে নিয়ে আসলাম। প্রচন্ড ভিড়। জনসমুদ্রের চাপে কফিন নিয়ে এগুতে পারছিলামা। একমুহূর্ত দেরী না করে কালেমা পড়তে পড়তে আমি মাইয়িতের মাথার দিকে। মুহতারাম নিজামী ভাই মাঝখানে ও শ্রদ্ধেয় জামিল মামু পায়ের দিকে ধরে আমাদের সবার অতি শ্রদ্ধেয় নানাজীকে জান্নাতের পথে শেষ বারের মতো বিদায় দিলাম। হয়তো আমাদের অগোচরে ধ্বনিত হলো "হে প্রশান্ত আত্মা! ফিরে চলো তোমার রবের দিকে এমন অবস্থায় যে তুমি তোমার পরিণামের জন্য তুষ্ট এবং তুমি প্রিয়পাত্র তোমার রবের কাছে। অতএব নেক বান্দাদের মধ্যে শামিল হয়ে যাও এবং প্রবেশ করো আমার জান্নাতে" (ফযর ২৭-৩০)

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের অন্যতম নেতা আব্বাসী আলী খান মরহুমের পরকালের অন্তীম যাত্রা আল্লাহর অগণিত নেক বান্দাদের মতোই হউক, এই দোয়াই করছি, আমীন।

স্বপ্নলোকের সিঁড়ি

কাজী মোরতুজা

মরহুম খান সাহেবের মেজ নাতিন জামাই

সেদিন রাত
স্বপ্ন দেখলাম;
দেখলাম একজন সংগ্রামী নায়ককে।
তিনি নিথর নিরব হয়ে
শুয়ে আছেন
আত্মীয় স্বজন পরিবেষ্টিত হয়ে।
তারা সবাই অশ্রু আপ্লুত।
কুরআনুল করীম থেকে
তেলাওয়াত করছেন সবাই।
আমি শুধু অপলক চোখে
তাকিয়ে রয়েছি
নিস্পন্দন লাশটির দিকে।

চমকে উঠলাম আমি।
নিজের চোখকে যেন বিশ্বাস হলোনা,
সংগ্রামী সে নায়কের হাত
যেন একটু নড়ে উঠলো।
আরো গভীরভাবে আমি
তাকিয়ে রইলাম
হতবাক বিস্ময়ে।

ধীরে ধীরে তিনি উঠে দাঁড়ালেন,
সবাইকে বললেন শান্ত স্বরে
"কেঁদনা তোমারা,
আমি তো বেঁচেই আছি।"

চারিদিকে নিস্তব্ধ নিরবতা।
নির্বাক সবাই।
সংগ্রামী পুরুষ এবার
সফেদ পাজামা আর পরিধান পরে

প্রশ্ন এক রাখলেন তিনি,
"আমাকে কি ভালোবাসনা তোমরা?
চেয়ে দেখ, আমি আছি বেঁচে"
তোমাদের স্বপ্নের আদর্শ মাঝে!

এরপর ধীরে ধীরে
তিনি একাই এগিয়ে গেলেন
সামনের আঙ্গিনায়।
সেখানে খোলা আকাশের নিচে,
সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেলেন তিনি
ক্রমশ উপরে।

মহান পুরুষ এবার দরাজ কণ্ঠে
সুমধুর সুরে গাইলেন গান এক।
গাইতে গাইতে তিনি উঠে গেলেন।
উপরে আরো উপরে।
মধুময় সুরের মুর্ছনায় আমি
মোহিত হয়ে গেলাম।

আমিতো কখনো শুনিনি
এমন সুরেলা গান।
আমিতো কখনো দেখিনি কাউকে
স্বপ্নলোকে সিঁড়ি বেয়ে এভাবে
উঠে যেতে উপরে।

বুকের গভীরে এক অতৃপ্ত অনুভব নিয়ে
জেগে উঠলাম ঘুম থেকে।
সবাইকে জানালাম
স্বপ্নলোকে সিঁড়ি বেয়ে
উপরে চলে যাওয়া
সৈনিকের নাম।
তিনি অতি সাধারণ
আমাদের অতি প্রিয়জন
আব্বাস আলী খান।

ছোটদের কলম থেকে

ছোটদের চোখে আব্বাস আলী খান

মরহুম আব্বাস আলী খান সাহেব অত্যন্ত ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন মানুষ ছিলেন। ছোটদের তিনি দারুন আদর করতেন। ছোটরা প্রথমে তাঁকে দেখলে ভয় পেতো। কিন্তু একবার নিকটতর হতে পারলে তাঁর স্নেহের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়তো। পড়ুন তার সম্পর্কে ছোটদের অনুভূতি। – সম্পাদক।

স্মৃতিতে অম্লান ঃ নানাজী আব্বাস আলী খান

মনিরুজ্জামান ফরিদ

বিশ্ব ইসলামী আন্দোলনের সিপাহ্সালার, প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ বর্ষিয়ান জননেতা নানাজী আব্বাস আলী খানের প্রতিষ্ঠিত তা'লীমুল ইসলাম একাডেমীর আমরা ছিলাম প্রথম ব্যাচের ছাত্র। সেই দ্বিতীয় শ্রেণী থেকে শুরু করে দশম শ্রেণী পর্যন্ত। ঢাকা থেকে জয়পুরহাট আসলেই সালাতুল ফজর কিংবা আসরের পর আমাদের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন বিষয়ে কুরআন ও হাদীস থেকে আলোচনা রাখতেন। ঢাকায় ফিরে যাওয়ার প্রাক্কালে স্নেহ বৎসল নানাজী আমাদের বুকে জড়িয়ে অশ্রুসজল হয়ে বিদায় নিতেন। একাডেমীর মসজিদ প্রাঙ্গনে রাখা কফিনে তিনি যখন চির নিদ্রায় শায়িত, তাঁর পবিত্র মুখাবয়ব দেখে অশ্রু সংবরণ যখন কঠিন, তখন মন প্রবোধ দিচ্ছিল, নানাজী মারা যাননি, তিনি তো আমাদের মাঝেই আছেন। ঐ তো মসজিদে বসে নানাজী আমাদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য দিচ্ছেন, আমাদের সাথে কথা বলছেন। রমজান মাসে আমাদের নিয়ে মসজিদে এ'তেকাফ করছেন। এ অনুভূতি যেনো শেষ বারের মতো প্রিয় নেতাকে দেখতে আসা আগত সকলের। বিশেষ করে নানাজীর স্কুলের আমরা (প্রথম ব্যাচের) সহপাঠিরাসহ অনুজ ছাত্র ভাইদের সকলের। কিন্তু তিনি যে চলে গেছেন, মৃত্যু যবনিকার ওপারে, সুন্দর ভুবনে। নানাজীর মত করে এমন আর কে আমাদেরকে বুকে জড়াবেন, সত্য পথের সন্ধান দিবেন, দেশ গড়ার কথা বলবেন, হৃদয়ের গভীরতা দিয়ে ভালবাসবেন, শত ব্যস্ততার মধ্যেও আমাদের উদ্দেশ্যে এমন চিঠি লিখবেন?

আমাদের উদ্দেশ্যে নানাজীর লেখা একখানা চিঠি ঃ

ফরিদ, কবির ও দশম শ্রেণীর অন্যান্য ছাত্র ভাইয়েরা!
আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহ্মাতুল্লাহ্

আমার দোয়া, সালাম ও ভালোবাসা নিও। তোমাদের উপর আমার এবং এ স্কুলের বিরাট ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। তোমরা যদি এখন থেকে কঠোর পরিশ্রম করো, তাহলে আশা করা যায় Letter সহ পাশতো ইনশাআল্লাহ করবেই, দু'একজন standও করতে পারো।

তোমরা ইসলামী আন্দোলনে যোগদান করে ইসলামী জ্ঞান ও চরিত্র গঠনের চেষ্টা করছো, এটাই ত করার কাজ। কিন্তু এসব কাজ এবং পড়াশুনার মধ্যে একটা ভারসাম্য রাখতে হবে। পড়াশুনা বাদ দিয়ে ইসলামী আন্দোলন করা চলবে না। জ্ঞানী লোক ব্যাতীত ইসলামী আন্দোলন অর্থহীন। পড়াশুনার কোনো ক্ষতি না হয় - এমনভাবে শিবিরের কাজ করতে হবে। ক্লাশ করা বাদ দিয়ে, পড়াশুনা বাদ দিয়ে হৈ চৈ করবে, পরীক্ষায় নকল করে 3rd Division-এ পাশ করবে

এমন ত কিছুতেই হওয়া চলবেনা। বোর্ডের ভালো ছাত্র হবে এবং শিবিরেরও ভালো কর্মী হবে। ভালো ছাত্র না হলে দেশ চালাবে কে? তোমরা পড়াশুনা ও ক্লাশ করা বাদ দিয়ে শিবিরের কাজ করছো এটা শিবিরের মূলনীতিরও খেলাপ। SSC, HSSC, BA, MA সর্বত্রই খুব ভালো Result করতে হবে।

আশা করি আমার কথাগুলো চিন্তা করে দেখবে। তোমরা যদি ২/৪ জন Letterসহ পাশ না করো, আমার এ স্কুল রেখে লাভ নেই।

তোমরা কঠোর পরিশ্রম করো, খোদার সাহায্য চাও, আমি তোমাদের জন্য সর্বদা দোয়া করি ও করবো।

আগামীতে বাড়ি আসার সুযোগ হলে তোমাদের সাথে সাক্ষাৎ হবে, তখন বিস্তারিত আলোচনা করবো। ইতি

খোদা হাফেজ।

তোমাদের

নানাজী

এটা শিবিরের মূলনীতিরও খেলাপ। SSC, HSC, BA., MA সর্বত্রই খুব ভালো Result করতে হবে। আশা করি আমার কথাগুলো চিন্তা করে দেখবে। তোমরা যদি ২/৪ জন Letter সহ পাশ না করো, আমার এ স্কুল রেখে লাভ নেই।
তোমরা কঠোর পরিশ্রম করো, খোদার সাহায্য চাও, আমি তোমাদের জন্য সর্বদা দোয়া করি ও করবো।
আগামীতে বাড়ি আসার সুযোগ হলে তোমাদের সাথে সাক্ষাৎ হবে। তখন বিস্তারিত আলোচনা করবো। ইতি খোদা হাফেজ
তোমাদের
(নানাজী)

ব্যক্তিগত ডায়েরী থেকে

আতিয়া ইসলাম

আতিয়া ইসলাম দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের তৃতীয় বর্ষ অনার্সের ছাত্রী। –সম্পাদক।

১৯৯৬-৯৭ সালের সমস্ত স্মৃতির পাতা হাতড়াচ্ছি .... খুঁজেই চলেছি, ওলোট-পালোট করে অস্থির হচ্ছি–তারিখটা গেলো কোথায়? দিনক্ষণগুলো প্রয়োজনের সময় কীভাবে যেনো লুকিয়ে পড়ে, হারিয়ে যায়; কিন্তু খোদাই করা স্মরণীয় ঘটনার চিহ্নটি যেনো আরো বেশী স্পষ্ট হয়ে ওঠে! উত্তরবঙ্গ সফরের এক পর্যায়ে সেদিন 'জয়পুরহাট'-এ প্রবেশ করেছি আব্বুর office-এ নামাজটা সেরে নেব বলে। তক্ষুণি phone— আব্বুকে ওপাশ থেকে বলা হচ্ছে (আদুরে ধমকে!), 'আমি ঠিকই দেখেছি তোমরা এসেছো- আমার বাড়ী নয় কেন? জল্‌দি এসো, আমি দাঁড়িয়ে আছি .....' অগত্যা নিজেরাই লজ্জা পেয়ে রওয়ানা করলাম-তাঁদের বাগান-বাড়ীর পুরনো রাজকীয় সদরের সামনে ধব্‌ধবে পোশাকে গাছের পরিচর্যা থেকে আমাদের দিকে মনোযোগ ঘুরিয়ে এনে সে কী উষ্ণ অভ্যর্থনা! উনার বয়স যে আশি পেরিয়ে গেছে, কে বলবে? সমস্ত বাড়ীটা, এমনকি বাড়ীর bathroomটা পর্যন্ত মেয়েলী হাতের আবশ্যক ছোঁয়াকে অগ্রাহ্য করে এই পবিত্র পুরুষের যত্নেই আজ পর্যন্ত ঝক্‌ঝক্ তক্‌তক্ করছে। শুনেছি এমনি করেই, রাজনৈতিক যাত্রাপথে, দীনের দাওয়াতী দায়িত্ব পালনে শুধু আল্লাহকেই সন্তুষ্ট করার চেষ্টায় তিনি এক মুহূর্তের জন্যও পিছপা' হন্‌নি, অলসতাকে কাছে ঘেঁষতে দেন্‌নি, এখনো দেন্‌না! এবার স্বচক্ষে দেখলাম এই এতোদিনের 'চিরপরিচিত' 'প্রায় না দেখা' (ছোটবেলার কথাতো তেমন মনে নেই!) মহান মানুষটিকে; সত্যি ভীষণ অদ্ভুত মুগ্ধতার শিহরণ বয়ে গেলো আমার সারা দেহ মনে ... সত্যিকারের মুমিন হয়তো এঁরাই, ... হয়তো নয়, নিশ্চয়ই! অহংকারের সবগুলো উপাদান নিজের মধ্যে অর্জন করা সত্ত্বেও দম্ভের কোনো ক্লেদাক্ত ধূলিকণা তাঁকে স্পর্শ পর্যন্ত করতে পারেনি। ঐ তো শোনা যাচ্ছে পাশের ঘরে তাঁর তিলাওয়াতের বজ্রগম্ভীর মনোমুগ্ধকর উচ্চারণ, তিনি নামাযে ইমামতি করছেন ... শুধু যদি কান পেতে শোনা যেতো!

প্রায় তিন-তিনটি বছর পেরিয়ে গেছে, তাঁর সাথে আরও কতোবার কতো জায়গায় দেখা হয়েছে।.... তাঁর বক্তৃতার প্রতিটি শব্দ, রসবোধ, প্রাণময় ভাষণ, তাঁর লেখনীর উচ্চাংগতা আমার মনে-মগজে, হৃদয়ে গ্রথিত হয়েছে, প্লাবিত করেছে আমার অন্তরাত্মাকে, আমি আরও শুনতে চেয়েছি, বুঝতে চেয়েছি ....।

আজ খুব বেশী মনে পড়ছে 'নজরুল জন্ম শতবার্ষিকী'র অনুষ্ঠানের কথা- সেই শেষ দেখা–আমি হতবাক হয়েছিলাম তাঁর ' শৈশবে দেখা নজরুল' স্মৃতি রোমন্থনের সাথে সাথে স্বতঃস্ফূর্ত আবৃত্তি–কবিতার পর কবিতা (কী অসাধারণ তাঁর স্মৃতি শক্তি!),

সাহিত্য ও দর্শনের পাণ্ডিত্যপূর্ণ মন্তব্য ও সমালোচনার পারদর্শিতায় একজন মানুষের মধ্যে এতো বিভিন্ন বৈচিত্রপূর্ণ শৈলীর প্রাসাদ উপস্থিত! আর কতো ব্যতিক্রমী উপস্থাপনা ও প্রকাশভঙ্গী তাঁর! এভাবে ক'জন পারে?

আব্বুর মুখে 'নানা-নানা' ডাকে যখন শুধু ভালো-লাগাকেই ছড়িয়ে পড়তে দেখেছি, তখন আমিও আপনার ভেতর থেকে একটি গভীর ভালোবাসার উঠে আসার অনুভূতিকে টের পেয়েছি।

কিন্তু আজ! আজ দুপুরে একটি মাত্র telephone-এর ring-"ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন।" আমার এ ক'দিনের অজানা, দুর্বোধ্য কষ্টের অস্থিরতার কারণকে পরিষ্কার করে তুললো-তিনি নেই! তিনি নেই! আব্বু, তোমার নানা তোমাকে দূরে রেখেই .... তোমার সাথে শেষ দেখা না করেই ... তোমাকে আর তাগাদা না দিয়েই .... তিনি নেই! শুধু নেই! নেই!' ধ্বনি-হাহাকার ... কান্না-নিজের অজান্তেই বুকের গভীরে চাপা যন্ত্রণাগুলোকে ঝরিয়ে দিচ্ছি, তবু প্লাবনের কোনো শেষ নেই যেনো!

'জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশে'র সিনিয়র নায়েবে আমীর জনাব আব্বাস আলী খান! আমার কাছে তাঁর পরিচয় তিনি একজন নিখুঁত, সুন্দর অসাধারণ মানুষ, আদর্শবান মানুষ!

আল্লাহ! তুমি তাঁকে বেহেশ্তের সবচাইতে সুন্দর নরম জায়গাটি দান করো। আমীন!

আচ্ছা! দুনিয়ার বাগানে পানি দেয়া মানুষটি কি এখন বেহেশ্তের বাগানেও পানি দিচ্ছেন? ঐ বাগানটা দেখতে কেমন সুন্দর?

ঐ পানির রঙ কেমন?
বাগানের ফুলের গন্ধ?!

'আসান ফেকাহ্'য় দোয়া খুঁজতে গিয়েই চোখে পড়ে তাঁর নাম – তিনি অনুবাদ করেছেন বলেই বইটি যথার্থতা পেয়েছে! তিনিও যেন তাঁর যথার্থ মর্যাদা পান (আমিন)।

আব্বাস আলী খান সাহেব ইন্তেকাল করেছেন! বিশ্বেস করতে ইচ্ছে করে না, কিন্তু বিশ্বাস না হওয়ারইবা কী আছে? আল্লাহ্ তাঁর প্রিয় বান্দাকে আর দূরে থাকতে দেবেন না বলে ঠিক করেছেন।

মনিবের ডাক, বান্দার সাড়া – তাইতো অবধারিত। তবুও তাঁর মৃত্যু আমার অনুভূতিতে বেদনার শিহরণ জাগিয়ে গেলো।

আমার প্রিয় দাদু আব্বাস আলী খান

সা'আদ ইবনে শহীদ
(দশম শ্রেণী)

আমার দাদু ছিলেন মরহুম মাওলানা আব্দুল হামিদ। তিনি ছিলেন জামায়াতের একজন রোকন এবং বড় আলেমে দীন। তিনি আমাকে খুব আদর করতেন। কিন্তু খুব ছোট বেলাতেই আমরা দাদুকে হারাই। তখন আমরা দাদুর আদর থেকে বঞ্চিত হই। তবে আমরা পেয়েছি আরেকজন দাদু। তাঁর নাম আব্বাস আলী খান।

ঢাকার মগবাজারের ৩/৩ গ্রীনওয়ের বাড়ীটিতে আমার জন্ম হয়। কিছুটা বড় হবার পর বুঝলাম, দাদু আব্বাস আলী খান এবং আমার আব্বু মাওলানা আব্দুস শহীদ নাসিম এ বাড়ীতে ভাড়া থাকেন। এটা আমাদের নিজের বাড়ী নয়। এ বাড়ীর ৪র্থ তলায় থাকতাম আমরা, আর ৩য় তলায় থাকতেন দাদু আব্বাস আলী খান।

প্রায় সময়ই দাদুর বাসায় যেতাম। তিনি ছোটদের পেলে খুব আদর করতেন। ছোটরাও তাঁকে দারুন ভালবাসতো। তিনি আমাকে অত্যন্ত আদর করতেন। আমি ছোট বেলায় প্রায় সময়ই তাঁর সাথে নামায পড়ার জন্য মসজিদে যেতাম। রমযান মাসে প্রত্যেক দিন তাঁর পিছনে তারাবীর নামায পড়েছি। তাঁর কুরআন তেলাওয়াত ছিলো অত্যন্ত মধুর। তাঁর চেহারা ছিলো গম্ভীর রকমের, কিন্তু তাঁর মনটা ছিলো ফুলের মতই পবিত্র।

তাঁর প্রত্যেকটি কথার মধ্যে ছিলো প্রাঞ্জলতা। তিনি খুবই ধীরে ধীরে এবং সুস্পষ্ট ভাষায় কথা বলতেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত জ্ঞানী ব্যক্তি। তিনি প্রত্যেকটি কথা বলতেন যুক্তি দিয়ে। তিনি এমনভাবে কথা বলতেন যে, তা সাথে সাথে হৃদয়ে গেঁথে যেতো। তিনি কারো মনেকষ্ট দিতেননা। তিনি সবার মন জয় করতে পারতেন এবং সবাই তাঁর আন্তরিকতায় মুগ্ধ হতো। যে-ই তাঁর সাথে কথা বলেছে সে-ই তাঁকে ভালোবেসে ফেলেছে। আমি তাঁকে যতোটুকু দেখেছি। তিনি মানুষের আবদার রক্ষা করতেন। তাঁর সাথে যখন তারাবীর নামায আদায় করার জন্য যেতাম তখন দেখতাম, তাঁর সাথে অনেক লোক কথা বলছে। তাঁর ছিলোনা কোনো অহঙ্কার, ছিলোনা, কোনো হিংসা।

মাঝে মাঝে আমি তাঁর অফিসে যেতাম। তাঁর সাথে আমার যখনই দেখা হতো তখনই আমি তাঁকে সালাম দিতাম এবং তিনি আমাকে কুশলাদি জিজ্ঞাসা করতেন। তাঁর সাথে কথা বলতে আমি সাচ্ছন্দ্যবোধ করতাম। তিনি এমনই একজন মানুষ, যিনি ছিলেন সবার প্রিয় নেতা আর আমার প্রিয় দাদু। কারণ, তাঁকে আমার আপন দাদুর মতোই লাগতো। যদিও আমি আমার আপন দাদুকে আমার বুঝ বুদ্ধি হওয়ার পর আর দেখিনি। আমি আব্বাস আলী খান দাদুর জন্য খুব গর্বিত। মহান আল্লাহ তায়ালার কাছে তাঁর মাগফিরাত কামনা করছি। আল্লাহ যেনো তাঁকে জান্নাতের সর্বোচ্চ স্থানে অধিষ্ঠিত করেন সেই দোয়া করছি।

আমার স্মৃতিতে বড় আব্বু

শবনম সাবাহ্

শবনম সাবাহ্ খান সাহেবের বড় নাতিনের ঘরের পুতিন। সে একাদশ শ্রেণীতে পড়ে।

একদিনের কথা। সেদিন সকাল বেলায় আমি ও আমার ছোট বোন ফারিয়া মেহেদী তুলছিলাম। মেহেদী গাছের চারদিকে আগাছায় ভরা, বড় আব্বু আমাদের ভীষণ অবাক করে দিয়ে সাগ্রহে মেহেদী তুলতে লেগে গেলেন। ফাঁকে ফাঁকে আমাদের সাথে গল্প করছিলেন। আগাছার মধ্য দিয়ে বড় আব্বু মেহেদী তোলার সেই দৃশ্য আজ স্মৃতিকে কাঁদায়।

এমনই শিশুসুলভ ছিলেন তিনি। দিনে অনেকবার আমাদের বাসায় আসতেন। আসলেই দেখা যেতো আমার ছোট ভাই সাবিতের সাথে বল ব্যাট নিয়ে ক্রিকেট খেলছেন। সাবিত জোরে 'চার' মারতেই তাঁর মুখ নির্মল হাসিতে ভরে উঠতো। সাবিত ছিলো চারুচিনির ভীষণ ভক্ত। তিনিও খুব পছন্দ করতেন। বাসায় নির্দিষ্ট কৌটায় দারুচিনি রাখতেন আর আমাদের বাসায় এলেই সাবিতকে দারুচিনি দিতেন। বড় আব্বুর মুত্যুর পর সাবিতকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। 'বাবু' আর কে দারুচিনি দেবে?" ছোট্ট শিশু মুত্যুর অর্থ বোঝেনা। তার স্বতঃস্ফূর্ত উক্তি, 'আরও একটা বড় আব্বু আসবে, সেই বড় আব্বু দেবে।' জামায়াত অফিস সংলগ্ন মসজিদে বড় আব্বু যখন নামায পড়তে যেতেন, তখন সাবিত 'বড় আব্বু, বড় আব্বু' বলে ডাকতো। বড় আব্বু হেসে হাত নাড়তেন। বড় আব্বু 'কিশোর কণ্ঠ', 'ফুলকুড়ি' সৌজন্য সংখ্যা হিসেবে পেতেন আর প্রায়ই বাসায় এসে তা আমাদের হাতে ধরিয়ে দিতেন। তাঁর কলিংবেলের একটা আলাদা সুর ছিলো, তিনি কলিংবেল বাজালেই সাবিত ছুটে যেতো।

বড় আব্বুর সাথে আমরা প্রায় নানার বাসায় যেতাম। পথের সব জায়গাই তাঁর চেনা ছিলো। 'বড় আব্বু, এটা কোন জায়গা?' জিজ্ঞেস করলেই চটপট উত্তর দিতেন।

বড় আব্বু ছিলেন আমাদের পরিবারের বিশেষ অভিভাবক, কুরআান, হাদসির শিক্ষা দিয়ে ইসলামের পথে চালিত করেছিলেন। আমাদের ভুল ভ্রান্তি সবসময় শুধরে দিতেন। প্রতি রমযানে একদিন হলেও আমাদের সাথে ইফতার করতেন। এই রমযানে আর তাঁর সাথে ইফতার করা হবেনা-মনে হতেই চোখে পানি আসছে। আমরা সাধারণত কুরবানীর ঈদ দাদুর বাসায় করে থাকি। কিন্তু আল্লাহর মেহেরবানি যে, তাঁর শেষ ঈদ আমরা তাঁর সাথে জয়পুরহাটে করেছিলাম।

তিনি আমাদের মজার মজার গল্প বলতেন। এখন একটা গল্প মনে পড়ছে। বড় আব্বুর মতো মজা করে হয়তো বলতে পারবোনা। ঘটনাটা এরকম - বড় আব্বু

একবার জয়পুরহাট যাচ্ছিলেন। তখন রাস্তাঘাট এতো উন্নত ছিলোনা। বাস না পেয়ে নিরুপায় হয়ে গভীর রাতে হাঁটতে শুরু করলেন। কিছুদূর যেতেই দেখলেন সামনে ভীষণ লম্বা কে যেনো রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে। ভীত হয়ে তিনি সূরা কালাম পড়তে শুরু করলেন। (ইতিমধ্যে আমরা ভয়ে হাত পা গুটিয়ে নিয়েছিলাম)। যেতে যেতে দেখলেন সামনে আরও একটা ভয়ংকর ব্যাপার। অসংখ্য দীর্ঘাকৃতির কিছু একটা পাশ জুড়ে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে আছে। বড় আব্বু হেসে শেষটুকু বলে ছিলেন এভাবে, 'আমি তো ভয়ে দিশেহারা, পরে আত্মস্থ হয়ে বুঝলুম ওগুলো তালগাছ ছাড়া আর কিছুই নয়।'

লোডশেডিং যখন হতো তখন তিনি আমাদের বাসায় দক্ষিণের জানালার পাশে বসে পাখা বাতাস করতেন অথবা মনে মনে কুরআনের সূরাগুলো মিষ্টি সুরে তিলাওয়াত করতেন। বড় আব্বুর অতি প্রিয় একটি হামদ হলো ঃ

(যারে) আউলিয়া, আম্বিয়া ধ্যানে না পায়
কুল মখলুক যাঁহারই মহিমা গায় -
(তাঁর) যে নাম নিয়ে এসেছি এ দুনিয়ায় -
সে নাম নিতে নিতে মরি এই আরযু
আল্লাহু আল্লাহু।

বড় আব্বু আমাদের জন্য প্রত্যেক নামাযে দোয়া করতেন। কারও অসুখ হলেই বার বার খোঁজ নিতেন। সর্দি কাশি হলে হোমিও প্যাথির বক্স থেকে ওষুধ এনে দিতেন।

বড় আব্বুর সাধারণ জ্ঞান ছিলো অসাধারণ। ৫ম শ্রেণীতে বৃত্তির জন্য তিনি আমাকে 'The Parrot' প্যারাগ্রাফটি লিখে দিয়েছিলেন। বড় আব্বু যে এতো চমৎকার ইংরেজী লিখতে পারেন, আমি জানতামনা।

সেদিন বড় আব্বুর ডাইরিটা হাতে নিয়ে কতো লেখা চোখে পড়লো। একদিন শার্লি আপু নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি থেকে যানজাটজনিত কারণে দেরিতে বাসায় এলো। বড় আব্বু সেই কথা অসুস্থ অবস্থায় লিখেছেন এভাবে - "Shirly Comes from N. S. varsity after sunset. Her classes close at 6. P. M. Nhe was reminding of the DOA....' এমনি কতো কথা ডাইরীতে লেখা।

বড় আব্বুর সব কথা লিখতে গেলে দীর্ঘ কাহিনী হয়ে যাবে। আজও যেনো কান পেতে থাকি তাঁর কলিংবেলের জন্য তাঁর কথা শোনার জন্য, 'সাবা, আজ কলেজে যাওনি?' বড় আব্বুর স্মৃতি আমি কোনদিন ভুলতে পারবোনা। আল্লাহ তাঁকে তাঁর নেক বান্দার মার্যাদায় ভূষিত করুন। আমীন।

সত্যের সৈনিক

শবনম মুনিরা মুন্নি
(৪র্থ শ্রেণী, ভিকারুন্নিসা নুন স্কুল, ঢাকা)

আল্লাহর হুকুম মানলে হয় আল্লাহর দাস্,
আব্বাস আলী খান আল্লাহর বান্দাহ খাস্।
বাংলাদেশে করতে কায়েম আল্লাহ্র দীন,
করতেন কাজ করতেন ফিকির নিশিদিন।
সত্যের সৈনিক আল্লাহর অলী নিষ্ঠাবান,
তাইতো আল্লাহ দিলেন অনেক উচু শান।
জ্ঞানের প্রদীপ আলোর মশাল আল্লাহর দান,
জীবন ভর গেয়ে গেলেন সত্যের জয়গান।

আমার বড় আব্বু

নাজিয়া নুসরাত
নাজিয়া নুসরাত খান সাহেবের নাতিনের ঘরের পুতিন। সে ২য় শ্রেণীতে পড়ে

হঠাৎ টেলিফোন বেজে উঠলো। আমরা শুনতে পেলাম আমাদের বড় আব্বু খুব অসুস্থ। দিনটি ছিলো ৩/১০/৯৯ ইং তারিখ, সে দিন হরতাল ছিলো। যেদিন তিনি মারা গেলেন সেদিন আমাদের বাসায় ছোট খালা ছিলেন। খবর শুনে আম্মু ও খালামণি প্রায় পাগল হয়ে গিয়েছিলেন। অসুখের সময় আমরা যখন ইবনে সিনা হাসপতালে যেয়ে তাঁকে দেখে আসতাম, তখন তাঁর মুখ দেখে তো কষ্ট হতো যে বলে বোঝাতে পারবোনা। আমরা যখন তাঁর সাথে জয়পুরহাটে যেতাম, তখন তিনি প্রত্যেক রাতে একটা করে গল্প শোনাতেন। তার মধ্যে একটি গল্প আমার স্পষ্ট মনে আছে।

এক রাতে তিনি বললেন, আগে আমাদের নানপুর বাসায় অনেক ইঁদুর ছিলো। এক রাতে বড় আব্বুর ঘরে কোনো ঈঁদুর'ই ছিলোনা। বড় আব্বু তখন বুঝতে পারলেন যে নিশ্চয়ই ঘরে সাপ এসেছে। তাই ভেবে তিনি অনেক দোয়া পড়ে শুয়েছিলেন, রাতে ঘুমের মধ্যে তার কানে সাপের মতো একটা আওয়াজ হলো। তাঁর ঘুম ভেঙ্গে গেলো, তিনি দেখতে পেলেন একটা সাপ তাঁকে ছোবল দেবার জন্য ফোঁস করে উঠেছে। তিনি লাফ দিয়ে উঠে আমার নানাভাই ও নানুর ঘরে গেলেন। তিনি তাদের ডেকে তুলে সব বললেন। তারপর দেখলেন সাপটা আবার এসেছে। আমার নানু চিৎকার দিলে আশেপাশে সবাই জেগে উঠে সাপটাকে মেরে ফেলল।

আমার ভাইকে তিনি মাঝে মাঝে “কিশোর কণ্ঠ” পত্রিকা দিতেন। একদিন আমার খুব ভালো লেগেছিল। কারণ সেদিন তিনি আমাদের বাসায় ইফতারীর সময় শাহী হালিম নিয়ে এসেছিলেন। এখন তিনি আর আমাদের গল্প বলতে পারবেননা, মজার মজার খাবার আনতে পারবেননা। তাই আমাদের দুঃখ হয়। আমরা দোয়া করি আল্লাহ যেনো তাঁকে ভাল রাখেন।

মহাপুরুষ

সাইয়েদা মাইমুনা হ্যাপী
(৮ম শ্রেণী, মগবাজার টিএণ্ডটি উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা)

মহাপুরুষ তিনি জ্ঞানী গুণী
আব্বাস আলী খান,
শেষ করা যায় না বলে তাঁর সব
গুণ আর অবদান।
ছোট বেলায় ছিলাম আমরা তাঁরই
পাশের বাসায় ভাড়া,
আমার দাদুর মতোন ছিলেন তিনি
মনকে দিতেন নাড়া।
হিংসা-বিদ্বেষ ছিলনা কারো প্রতি
ছিলো আদর মায়া,
আল্লার পথে সবার প্রিয় তাই
খান সাহেবের কায়া।
সারাজীবন তিনি আল্লাহর পথে
করে গেছেন কাজ,
আশা করি আল্লাহপাক দিবেন তাঁরে
দীপ্ত নূরের তাজ।

অনুরাগীদের অনুভূতি

যে জীবন প্রেরণা যোগায়
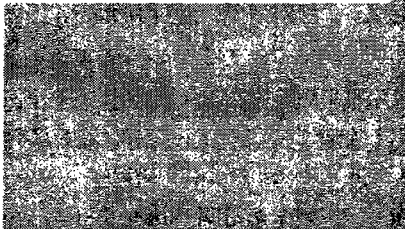
আব্বাস আলী খান ঃ এক উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব

মুহাম্মদ হামিদ হোসাইন আজাদ, লন্ডন থেকে
প্রাক্তন সভাপতি, বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির

জনাব আব্বাস আলী খান কখনো বেশী কথা বলতেননা। তিনি মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের সূরা মু'মেনুন-এর ৩নং আয়াতে বর্ণিত "তারা বেহুদা কথা বলা থেকে বিরত থাকে" সফল মুমিন দলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। অপ্রয়োজনীয় কথা যেমন তিনি বলতেননা তেমনি প্রয়োজনীয় কথা বলা থেকেও তিনি কখনো বিরত থাকতেননা। সাধারণ কথা বলা থেকে শুরু করে শিক্ষা বৈঠক ও জনসভার বক্তব্য পর্যন্ত সর্বত্রই তাঁর কথা বলা ছিলো যথার্থ ও ভারসাম্যপূর্ণ। সময় ও পরিবেশকে সামনে রেখে প্রয়োজনীয় কথাগুলোই তিনি বলতেন। ভাবাবেগতাড়িত প্রান্তিক বা বলগাহীন অথবা নিরেট শ্রোতার মনোরঞ্জনের জন্য কোনো কথা তিনি বলতেননা। শুধু তাই নয়, বক্তব্য উপস্থাপনের সময় তিনি সময়ের দাবীর পাশাপাশি সুদূর প্রসারী লক্ষ্যকে কখনো উপক্ষো করেননি।

আমার নোট ফাইলে সংরক্ষিত তার বক্তব্যগুলোর মধ্যে ১৯৯২ সালে জামায়াতের রুকন সম্মেলনে এবং ইসলামী ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় সদস্য সম্মেলনে প্রদত্ত তাঁর প্রধান অতিথির বক্তব্যটুকু এক্ষেত্রে সর্বোত্তম দৃষ্টান্ত। ইসলামী ছাত্রশিবিরের সদস্য সম্মেলনে তিনি "ইসলামী বিপ্লবের জন্য কি ধরনের নেতা ও কর্মী প্রয়োজন" এ বিষয়ে বক্তব্য রেখেছিলেন। তাঁর কিছু গুরুত্বপূর্ণ অংশ এখানে তুলে ধরা আবশ্যক মনে করছি।

বক্তব্যের শুরুতে তিনি বলেন, ইসলামী বিপ্লব সাধনে তৎপর নেতাদের প্রথমেই "ইসলামী আন্দোলন সম্পর্কে সঠিক ধারণা থাকা আবশ্যক"-"আল্লাহ্পাক যে নেয়ামত দিয়েছেন তা যে কোনো সময় (প্রয়োজনানুসারে) যে কোনো পরিমাণ নির্দ্বিধায় আল্লাহর রাহে ব্যয় করার নাম যথার্থ ইসলামী আন্দোলন। অতঃপর তিনি শিক্ষাঙ্গনের পরিবেশের আলোকে ছাত্র ইসলামী আন্দোলনের নেতাদের কি কি গুণ থাকা দরকার তা বলতে গিয়ে বলেন, "একজন ছাত্র ইসলামী আন্দোলনের নেতাকে মেধাবী ছাত্র হতে হবে, ইসলাম ও বর্তমান বিশ্ব সম্পর্কে গভীর জ্ঞানের অধিকারী হতে হবে, নিজেকে ইসলামের মূর্ত প্রতীক হিসেবে গড়ে তুলতে হবে, সকলের সাথে হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক রাখতে হবে ও হৃদ্যতাপূর্ণ আরচণ করতে হবে এবং শিক্ষকদের মন জয় করতে হবে ও তাদের প্রিয় হতে হবে।" অতঃপর তিনি বলেন, ইসলামী বিপ্লবের জন্য আন্দোলনের নেতাদের মাঝে কুরআন হাদীসে বর্ণিত গুণাবলীতো

থাকতেই হবে। তার সাথে নিম্নোক্ত পার্থিব যোগ্যতাগুলোও থাকতে হবে ঃ

১. দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসনিক যোগ্যতা থাকতে হবে যারা অকল্যাণ নয় কল্যাণই বেশী করবে।

২. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে দক্ষতা থাকতে হবে।

৩. আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাথে সংগতিশীল এবং ভারসাম্যপূর্ণ উচ্চতর ডিগ্রী থাকতে হবে।

৪. যারা আরবী জানেন তাদেরকে আরবীতে দক্ষতা অর্জন করতে হবে আর যারা ইংরেজী জানেন তাদেরকে ইংরেজীতে দক্ষতা অর্জন করতে হবে।

৫. ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণণা এবং ইসলামের পক্ষে বিশ্ব জনমত তৈরি করতে হবে।

এসব পার্থিব গুণের বর্ণনা দেয়ার পর জনাব খান ইসলামী আন্দোলনের নেতা ও কর্মীদের প্রয়োজনীয় ব্যক্তিগত গুণের কথা বলতে গিয়ে বলেন -

১. 'মুজাহিদায়ে নফস তথা নফসের বিরুদ্ধে জিহাদ করার যোগ্যতা থাকতে হবে।'

২. রূহানিয়াত বা আধ্যাত্মিক গুণ থাকতে হবে। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, It is immeterial এটার সম্পর্ক উর্ধজগতের সাথে, আর এর বিকাশ হয় আল্লাহর জিকির-এ। আল্লাহর জিকির থেকে তাকওয়ার পয়দা হয়, তাকওয়া খোদা প্রেম সৃষ্টি করে আর খোদা প্রেম খোদার পথে ত্যাগ ও কোরবানীর অনুভূতি সৃষ্টি করে।

৩. হিজরত, পাপাচার, অনাচার পরিত্যাগ করতে ও আল্লাহর অপছন্দনীয় কাজ থেকে দূরে থাকতে হবে।

৪. ফানাহ্ ফিল ইসলাম তথা ইসলামের জন্য নিবেদিত প্রাণ হতে হবে।

   এ প্রসঙ্গে তিনি রাসূলুল্লাহর স. একটি হাদীস উল্লেখ করেন যে হাদীসে রাসূলুল্লাহর স. প্রতি আল্লাহর ৯টি নির্দেশের কথা উল্লেখ আছে।

৫. উদ্দেশ্য লক্ষ্য সুস্পষ্ট থাকতে হবে। খুলুসিয়াত থাকতে হবে এবং ১০০% মুসলিম হতে হবে।

অতঃপর উপরোল্লেখিত গুণাবলী অর্জনের উপায় বর্ণনা করে তিনি বলেন "এসব গুণাবলী যার মধ্যে সবচেয়ে বেশী থাকবে তিনিই নেতৃত্ব দানের যোগ্য হবেন।"

জনাব আব্বাস আলী খানের উপরোল্লেখিত বক্তব্যটা নিয়ে সামান্য চিন্তা করলেই এ কথা সুস্পষ্ট হয়ে উঠে যে তিনি কতটুকু ভারসাম্যপূর্ণ Vissionary এবং বাস্তবধর্মী চিন্তার অধিকারী ছিলেন। শুধু কি চিন্তায়? বাস্তব জীবনেও তিনি ছিলেন এসব গুণের জীবন্ত উদাহরণ, আলহামদুলিল্লাহ।

ধৈর্য ও তাওয়াক্কুল ছিলো মুহতারাম আব্বাস আলী খানের আরেকটি মহৎ গুণ। আন্দোলনের বাঁকে বাঁকে কঠিন মুহূর্তগুলোতে তাঁর পাহাড় সম ধৈর্য ও আল্লাহর উপর নিরবিচ্ছিন্ন তাওয়াক্কুল কর্মীদেরকে নবচেতনায় সঞ্জিবীত করতো।

১৯৮৪ সালে সন্দ্বীপের উড়িরচরে ইতিহাসের ভয়াবহ জলোচ্ছ্বাসের পর জনাব আব্বাস আলী খানের নেতৃত্বে রিলিফ ওয়ার্ক করতে গিয়েছিলাম। প্রায় পুরো সন্দ্বীপ এবং উড়িরচর ছিলো বিধ্বস্ত জনপদ। খাওয়া, থাকার সুবন্দোবস্ত সেখানে কল্পনা করাও ছিলো কঠিন। রাত দিন বিপর্যস্ত মানুষের সেবায় কাটাতে হয়। মাঝে মাঝে মাইলের পর মাইল কাদাযুক্ত রাস্তা হাঁটতে হয়। এ কঠিন সময়ে সত্তর উর্ধ খান সাহেব ক্লান্তিহীনভাবে দুস্থদের মাঝে রিলিফ ওয়ার্ক করেছেন। কাজের সময় ক্লান্তির ছাপ তার মাঝে দেখা যায়নি। মাঝে মাঝে মনে হতো তিনি আমাদের চেয়ে জোয়ান।

উড়িরচরে রিলিফ ওয়ার্ক করে আমরা স্বন্দ্বীপের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হবো। কিন্তু সমুদে ভাটা থাকার কারণে আমাদেরকে জোয়ারের জন্য অপেক্ষা করতে হচ্ছিল। ট্রলারে মাগরিব আদায় করে অপেক্ষার সময়টাকে কাজে লাগানোর জন্য খান সাহেবকে অনুরোধ করা হলো কিছু বলার জন্য। তিনি আমার যতোটুকু মনে পড়ে, শিক্ষা ও সভ্যতা সম্পর্কে বক্তব্য রাখছিলেন। সাগরতীরে ট্রলারে বসে আলো-আঁধারির মিলন ক্ষণে তাঁর বক্তব্যগুলো এতো হৃদয়গ্রাহী, মনোমুগ্ধকর এবং সময়োপযোগী ছিলো আমরা মন্ত্রমুগ্ধের মতো তন্ময় হয়ে শুনছিলাম। কোন্ সময় যে এক ঘন্টারও বেশী সময় পার হয়ে গেলো আমরা কেউ বুঝতেও পারিনি। বক্তব্যের মাঝে ভরাগলায় তিনি যখন দ্বিমুখী শিক্ষা ব্যবস্থার পক্ষে লর্ড ম্যাককলের বক্তব্যের ইংরেজী কোটেশন উপস্থাপন করছিলেন এলো নিখুঁতভাবে তিনি বলছিলেন, মনে হচ্ছিলো যেনো লর্ড ম্যাককলের বক্তব্যের ক্যাসেট শুনানো হচ্ছে। আমি সেদিন বুঝে নিয়েছিলাম খান সাহেবের মেধা ও স্মৃতি শক্তি কতো প্রখর এবং ইসলামী জ্ঞানের পাশাপাশি সমসাময়িক জ্ঞান অর্জনে তিনি কতোটুকু সক্রিয় ছিলেন। জাহেলিয়াতের চ্যালেঞ্জের মোকাবিলায় ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করার যোগ্যতা কাকে বলে, সেদিন প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার ব্যর্থতার কারণ ও ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার অনিবার্যতা সম্পর্কে তার বক্তব্য শুনেই আমি বুঝতে পেরেছিলাম।

জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে জনাব খান ছিলেন "যেখানে দেখিবে ছাই, উড়াইয়া দেখ তাই, পাইলেও পাইতে পার অমুল্য রতন" নীতিতে বিশ্বাসী। হজ্বের সময় (১৯৯৩ সালে) হজ্বের আগে ও পরে আমরা মক্কা ও মদীনার এবং আশেপাশের বিভিন্ন ঐতিহাসিক ঘটনার স্মৃতিবিজড়িত জায়গাগুলো দেখতে গিয়েছিলাম। সব জায়গায় দেখলাম আমাদের দেখা আর খান সাহেবের দেখার মাঝে বিস্তর ফারাক। উনি সব কিছুই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতেন ও জানতেন। কাগজ কলম সব সময় তার কাছে প্রস্তুত ছিলো। যখনি গুরুত্বপূর্ণ কিছু দেখতেন সেটা নোট করে নিতেন। সেদিন আমরা বদরের প্রান্তর দেখতে গিয়েছিলাম। রাত্রিবেলা বদরের ময়দান দেখে আমরা চলে আসার জন্য একত্রিত হচ্ছিলাম। হঠাৎ দেখি মুহতারাম খান সাহেব আমাদের মাঝে নেই। খুঁজতে গিয়ে দেখি তিনি একজন গবেষণাকর্মে নিয়োজিত ছাত্রের মতো প্রবেশ পথের অদূরেই শহীদদের নাম খচিত পিলারের সামনে দাঁড়িয়ে বদরের শহীদদের নামগুলো লিখে নিচ্ছেন।

জ্ঞান চর্চা ও গবেষণা ছিলো জনাব আব্বাস আলী খানের প্রশান্তির খোরাক এবং বিশ্রামের আনন্দ। মাঝে মাঝে জরুরী প্রয়োজনে ওনার সাথে দেখা করার জন্য অফিস সময় শেষে রাতে বাসায় যাওয়ার সুযোগ হতো, তিনি তখন জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ-এর ভারপ্রাপ্ত আমীর। মাঝে মাঝে নিজেকে খুবই অপরাধী মনে হতো এ জন্যে যে বেচারা বয়স্ক মানুষ, সারাদিন ব্যস্ত সময় কাটিয়ে ঘরে ফিরেছেন একটু বিশ্রামতো অবশ্যই নিতে হবে - এসময় বিরক্ত করা কি ঠিক হবে? কিন্তু উপায় নেই দেখা করতেই হবে। সংকোচমাখাচিত্তে বেল টিপতেই দেখতাম অবিলম্বে কেউ না কেউ দরজা খুলে দিতেন, কোনো কোনো সময় খান সাহেব নিজেই, আর রুমে গিয়ে দেখতাম হয় তিনি পড়ছেন অথবা লিখছেন। বেশীর ভাগ সময় তাকে পেতাম তিনি লিখছেন। আমরা যাওয়া মাত্রই লিখা বন্ধ করে সাদর সম্ভাষণ জানিয়ে আমাদের কথা শুনতেন। কথার মাঝখানে তিনি কখনো Interfare করতেন না। আমরা যখন বলতাম মনোযোগ সহকারে আমাদের কথা শুনতেন অতঃপর আমাদের কথা শেষ হলে তিনি প্রয়োজনীয় পরমার্শ দিতেন। মাঝে মাঝে মনে হতো প্রশান্ত মহাসগারের মতোই গভীর ও প্রশান্ত জনাব আব্বাস আলী খান। কথা ও কাজের ফাঁকে মেহমানদারী করতেও তিনি কিন্তু ভুল করতেননা। কাজ শেষ হওয়ার পর কখনো শিক্ষকের মত কখনোও বা দাদার মত তিনি আমাদেরকে বিদায় দিতেন।

শরীয়তের সীমারেখার মধ্যে থেকে হাস্যরসও জনাব খান করতেন মাঝে মাঝে। শিবিরের সদস্য সম্মেলনের উন্মুক্ত অধিবেশনে তিনি যে রসাত্মক গল্প বলতেন তা যেমন ছিলো আনন্দদায়ক তেমনি ছিলো শিক্ষামূলক। তাঁর রচনায় রম্য সাহিত্যে দিল্লিকা লাড্ডু আর ভ্রমণ সাহিত্যে বিভিন্ন ঘটনার রসাত্মক উপস্থাপনা প্রমাণ করে তারও একটি মন ছিলো উদারতা ও ভালবাসায় পূর্ণ। আমরা জানি একজন আদশ নেতা বা শিক্ষকের অন্যতম মহৎ গুণ হচ্ছে তিনি যা শিখেন বা জানেন তা হুবহু তার ছাত্রদের বা কর্মীদের শিখিয়ে দেন, এ ক্ষেত্রে এতোটুকু কার্পণ্য করেননা। জনাব আব্বাস আলী খানের মাঝে এ গুণটি ছিলো অত্যন্ত সুস্পষ্ট। তার আলোচনা বা লেখনিতে এ নজির ভুরি ভুরি। "কাজ করবো করবো বলে ফেলে রেখোনা, করে ফেলো, না হলে করা হবেনা।" জ্ঞান বিতরণের ক্ষেত্রে মুহতারাম খান সাহেব সম্ভবতঃ এ নীতিতেই বিশ্বাসী ছিলেন। তাই আমার মনে হয় মুহতারাম খান সাহেবকে জননেতা আব্বাস আলী খান বলার চেয়ে ওস্তাদ আব্বাস আলী খান বলাই যথার্থ।

মরহুম আব্বাস আলী খানের অমূল্য অবদান

অধ্যক্ষ আ. ন. ম. আব্দুস শাকুর

লেখক ও গবেষক

চরিত্র মাধুর্য

মরহুম আব্বাস আলী খান অনুপম চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। বিনয়ী ভাব, ধৈর্যশীল ও গতিশীল নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব, উদার মনোভাব, সৎ ও সত্যনিষ্ঠতা, আন্দোলন ও তৎসম্পর্কিত কার্যাদির প্রতি ত্যাগ ও একনিষ্ঠতা, সদালাপ ও নির্লোভ, দুনিয়ার আকর্ষণ ও সহায় সম্পদের প্রতি ঝোঁকহীনতা এবং অমায়িক ব্যবহার ও সুরসিক বাচন ভঙ্গি, সময়ের প্রতি একনিষ্ঠতা, মিতব্যয়ী, সকলের বিপদে আপদে সাহায্য ও মিথ্যা অহংকার হীনতা, নেতৃত্বের প্রতি ও অর্থবিত্তের প্রতি নির্লোভ মনোভাব, সর্বোপরি ইসলামী আন্দোলনের প্রতি তাঁর একাগ্রতা, একনিষ্ঠতা, জালিমদের প্রতি ভয়লেশহীন এবং সরকারী বেসরকারী চাপে অনমনীয় বজ্র কঠিন দায়িত্ব পালনে তৎপর এবং আধ্যাত্মিক দিক থেকে সদা তাহাজ্জুদ গুজার এবং ইসলামী আন্দোলনের দায়িত সশরীরে ও কলমের লেখনীর মাধ্যমে সদা সক্রিয় এক মহান ব্যক্তিত্ব ছিলেন তিনি।

ফলে তিনি তাঁর দলে ও অন্যান্য দলের অনুসারীদের কাছে প্রিয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন। এরকম দুর্লভ ব্যক্তিত্ব খুব কমই জন্ম গ্রহণ করে থাকেন। ৪৫ বৎসর ব্যাপী এক নাগাড়ে ইসলামী আন্দোলনের জন্য জীবন উৎসর্গকারী এ ব্যক্তিত্ব সত্যিই অনুসরণীয় এক আদর্শ।

বাংলা ভাষায় মাওলানা মওদূদী রহ.-কে উপাস্থাপন

এক্ষেত্রে জনাব আব্বাস আলী খানই একমাত্র লেখক ও গবেষক যিনি ইতিবাচকভাবে যথাযথ রূপে মাওলানা মওদূদী র.-এর ব্যক্তিত্বকে তুলে ধরেছেন। তিনিই প্রথম অনুভব করেন যে জামায়াতে ইসলামীর ইসলামী আন্দোলনকে মানুষের সামনে উপস্থিত করতে হলে প্রথমে আল্লামা মওদূদী র. -কে বিরোধীরা যেভাবে সকলের সামনে বিতর্কিত করেছেন, তাদের নিকট প্রথমে আল্লামা মওদূদীর র. জীবনকে তুলে ধরতে হবে। তাই তিনি "মাওলানা মওদূদী একটি জীবন একটি ইতিহাস (১৯৬৭)" নামক একটি জীবনী ইতিহাস তুলে ধরে মাওলানাকে বাংলা ভাষাভাষিদের নিকট পরিচিত করে তুললেন। এতেই তারা সন্তুষ্ট হতে পারবেন না জেনে তিনি পরবর্তীতে পেশ করলেন "বিশ্বের মনিষীদের দৃষ্টিতে মাওলানা মওদূদী" র. (১৯৮৭) বিশ্বের নন্দিত আলেমে দ্বীনগণের লিখিত রচনা ও বক্তব্য এতে তুলে ধরলেন যাতে এদেশের মওদূদী র. বিরোধী আলেমগণও তা জানতে পান।

দেওবন্দী আলেমগণ আল্লামা মওদূদী র. কে আলেমই মনে করতেন না। কেননা তিনি দেওবন্দ মাদ্রাসা থেকে ডিগ্রী নেননি। ফলে তাকে আধুনিক শিক্ষিত লোক

হিসেবেই তাঁরা উপস্থাপন করতেন। জনাব আব্বাস আলী খান র. তাদের ঐ চিন্তাধারার জবাব হিসেবে তুলে ধরলেন "আলেমে দ্বীন সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী র." (১৯৮৫)। এতে তিনি মাওলানার দ্বীনি শিক্ষা গ্রহণ সম্পর্কিত প্রামাণ্য বিবরণ তুলে ধরে প্রতিষ্ঠিত করেছন যে, আল্লামা মওদূদী র. একজন সত্যিকার আলেমে দ্বীন।

কংগ্রেসপন্থী দেওবন্দী আলেমগণের সাথে রাজনৈতিক মতদ্বৈততার কারণে তারা আল্লামা মওদূদী র.-এর কার্যাবলী সম্পর্কে জানতেই ইচ্ছুক ছিলেননা। বরং তাঁর বিরুদ্ধে কত শত কিতাব লিখে অপপ্রচার করেন। জনাব খান সংক্ষেপে তাঁকে ও তাঁর কার্যাবলীকে তুলে ধরেন "মাওলানা মওদূদীর বহুমুখী অবদান" (১৯৮৫) নামক গ্রন্থে। বাংলা ভাষায় বলতে গেলে এ এক অসীম সাহাসের ব্যাপার। তিনি নিজেকে বিতর্কিত না করে পজিটিভ পদ্ধতিতে আল্লামা মওদূদী র. কে বাংলা ভাষাভাষির সামনে যথাযোগ্য উপস্থাপন করেছেন। এতে করে দেওবন্দী আলেমগণের অপপ্রচারের কিছুটা পরোক্ষ জবাবও হয়েছে এবং তাদেরও অনেকের চোখ খুলে গেছে। জনাব আব্বাস আলী খানের এই সাহসিক কার্যাবলী থেকে আমাদের শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে।

মাওলানা মওদূদী র. কে প্রত্যক্ষভাবে তুলে ধরতে গেলে বিতর্কের ফাসাদ হতে পারে, এমন ধারণা মাওলানার যোগ্য অনুসারী বিদ্বানদেরকে ত্যাগ করতে হবে। জনাব আব্বাস আলী খানের মত সাহসিকতার সাথে মাওলানাকে লেখনীর মাধ্যমে তুলে ধরতে হবে।

দক্ষ অনুবাদক

আপনারা জানেন অনুবাদ কোনো সহজ কাজ নয়। যিনি অনুবাদক তাঁকে মূল লেখকের ভাষা এবং যে ভাষায় অনুবাদ করবেন সে ভাষায় সমান জ্ঞান ও দক্ষতা রাখতে হয়। এক্ষেত্রে আব্বাস আলী খান মাওলানার বিপ্লবী উর্দূ ভাষা ও সাবলীল সহজ বাংলা ভাষায় তা প্রকাশের সমান দক্ষতা দেখিয়েছেন।

বাংলার ভাষায় আব্বাস আলী খান কর্তৃক অনূদিত মাওলানা মওদূদীর র. গ্রন্থাবলীর বিবরণ নিম্নে পেশ করা হলো ঃ

১. পর্দা ও ইসলাম বাংলায় প্রকাশ (১৯৯৩-৩য় সং)
২. সীরাতে সরওয়ারে আলম (৩-৫ খন্ড) (১৯৮২, ১৯৯৩, ১৯৯৫, ১৯৯৬, ১৯৮৮)
৩. সুদ ও আধুনিক ব্যাংকিং
৪. বিকালের আসর
৫. আদর্শ মানব
৬. ইসলাম ও সামাজিক সুবিচার (১৯৮৯-২য় সং)
৭. জাতীয় ঐক্য ও গণতন্ত্রের ভিত্তি (১৯৮৪)
৮. ইসলামী অর্থনীতি (আংশিক) (১৯৯৪)

৯. একটি ঐতিহাসিক সাক্ষাৎকার (১৯৮৪)
১০. পর্দার বিধান
১১. মুসলমানদের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের কর্মসূচী (১৯৮৮)

মাওলানার যুগান্তকারী গ্রন্থসমূহ অনুবাদ করে তিনি বাংলা ভাষাভাষি পাঠকের নিকট মাওলানাকে শ্রদ্ধাভাজন করেছেন এবং মাওলানাকে প্রত্যক্ষভাবে তুলে ধরে নিজে শ্রদ্ধাভাজন হয়েছেন। এটা তাঁর বিরাট অবদান হিসেবে স্বীকৃত হবে।

উপরের সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকে বুঝা যায় মাওলানা মওদূদী র. কে বাংলা ভাষাভাষিদের নিকট উপস্থাপন করার জন্য আব্বাস আলী খান ইতিবাচক পাঁচটি সেক্টরে কাজ করেছেন।

ক. আলেমে দ্বীন ও সংস্কারক হিসেবে মাওলানা মওদূদীর র. জীবনেতিহাস বিস্তারিতভাবে পেশ।
খ. মাওলানার রাজনৈতিক কার্যাবলী ও জামায়াতে ইসলামীর ইতিহাস উপস্থাপন।
গ. মাওলানার লিখিত যুগান্তকারী গ্রন্থাবলীর অনুবাদ।
ঘ. মাওলানা মওদূদী র. প্রসঙ্গে সমকালীন মনীষীদের মতামত পেশ।
ঙ. মাওলানার সার্বিক অবদানকে তুলে ধরা।

বলাবাহুল্য জনাব আব্বাস আলী খান এতে সফলকাম হয়েছেন।

যোগ্য সংগঠক

আব্বাস আলী খানের সাংগঠনিক পজিশন তো সবাই অবগত। এক কথায় বলতে গেলে বাংলাদেশে জামায়াতে ইসলামীর আন্দোলনে লক্ষ লক্ষ লোকের অংশ গ্রহণে তাঁর সাংগঠনিকভাবে বিশাল অবদান রয়েছে। শুধু তা নয় একজন সুদক্ষ লেখক হিসেবে তিনি এই আন্দোলনের জন্য সাংগঠনিক নিয়ম কানুন সম্বলিত বেশ কয়েক খানা পুস্তকও রচনা করেছেন। নিম্নে তা পেশ করা হলো ঃ

ক. ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের কাংখিত মান
খ. ঈমানের দাবী,
গ. ইসলামী বিপ্লব একটি পরিপূর্ণ নৈতিক বিপ্লব
ঘ. একটি আদর্শবাদী দলের পতনের কারণ ঃ তার থেকে বাঁচার উপায়
ঙ. সমাজতন্ত্র ও শ্রমিক,
চ. মৃত্যু যবনিকার ওপারে (১৯৭৫)
ছ. Muslim Ummah
জ. ইসলাম ও জাহিলিয়াতের চিরন্তন দ্বন্দ্ব (১৯৯১)

আন্দোলনের ক্রমধারায় তিনি সাংগঠনিক প্রয়োজনে উপরোল্লেখিত গ্রন্থাধির রচনা করে ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের দিক নির্দেশনা দিয়েছেন। বিগত নির্বাচনের পর নির্বচনী ফলাফল নিয়ে কর্মীদের মধ্যে হতাশা সৃষ্টি হয়। ফলে তাদের কাজে স্থবিরতা

দেখা দেয়। জনাব আব্বাস আলী খান কর্মীদের মধ্যে হতাশা ও তার প্রভাব দেখে এক যুগান্তকারী পুস্তক রচনা করে ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদেরকে এই দুর্যোগে দিশা দান করেন। পুস্তকের নাম (একটি আর্শবাদী দলের পতনের কারণ; তার থেকে বাঁচার উপায়) (১৯৯৮)।

এতে হতাশ কর্মীবৃন্দ নিজেদের দিশা খুঁজে পায়। উপরোল্লিখিত গ্রন্থসমূহ তাঁর সাংগঠনিক অভিজ্ঞতাও দূরদর্শিতার প্রমাণ বহন করে।

এক সফল ঐতিহাসিক

তিনি ছিলেন একজন প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ। জামায়াতে ইসলামীর ইতিহাস, মাওলানার জীবনেতিহাস ছাড়াও তিনি "বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস" (১৯৯৪) নামে এক বিশাল ইতিহাস লিখেছেন। এটি ছিল এদেশের মুসলিম ইতহিাসের এক অনুল্লেখিত অধ্যায়। এ ধরনের উচ্চতর প্রামাণ্য গবেষণা বাংলাদেশের ইতিহাসে অবশ্যই উল্লেখযোগ্য অবদান।

এই ইতিহাস বিরচনা তাকে ঐতিহাসিক স্যার যদুনাথ সরকার, রাখাল দাস বন্দোপাধ্যায়, সুখময় মুখোপাধ্যায়, ডঃ আব্দুল করিম, প্রফেসর আব্দুর রহীম প্রমুখ ঐতিহাসিকগণের কাতারে উল্লেখ করা যেতে পারে। এতে তাঁর বহুমুখি যেগ্যাতা ও অভিজ্ঞতার পরিচয় মিলে।

পরিশেষে বলা যায় জনাব আব্বাস আলী খান ছিলেন বহুমুখী প্রতিভা। এ ধরনের বহুমুখী প্রতিভা সত্যিই বিরল। তিনি একাধারে শিক্ষক, রাজনীতিবিদ, দক্ষ সংগঠক, শিক্ষাবিদ, বুদ্ধিজীবী, ঐতিহাসিক, সুযোগ্য অনুবাদক, ইসলামী চিন্তাবিদ, সুসাহিত্যিক, বহুভাষাবিদ, বহুদা বিষয়ে অভিজ্ঞতার একটি এনসাইক্লোপেডিয়া। ইসলামী আন্দোলনের অগ্রগতি, ইসলামী কল্যাণমূলক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য 'সৎলোকের শাসন" কায়েমের আন্দোলন। জীবনের দীর্ঘকাল সময়ে তিনি সমাজ রাষ্ট্র ও দলের কল্যাণ ও উত্তরোত্তর সমৃদ্ধিতে বিশাল অবদান রেখে যান। আল্লাহ তাঁর অবদানকে তাঁর নাজাতের ওসিলা হিসেবে কবুল করুন। আমীন।

খান সাহেব ঃ যাঁর মৃত্যু শোকের চেয়ে বেশী ঈর্ষণীয়

ডক্টর আ, ছ, ম তরিকুল ইসলাম
চেয়ারম্যান, কুরআনিক সাইন্স এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ও সহকারী অধ্যাপক, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম।

১২ই ডিসেম্বর। ১৯৮৮ সাল। আদর্শ নেতা আব্বাস আলী খান সাহেবের সাথে আমার প্রথম সাক্ষাৎ শুধু সাক্ষাৎ নয় বরং রীতিমতো পরিচয়। ঘটনাটি বেশ রসে পরিপূর্ণ।

নভেম্বর মাস। বাদশা সউদ বিশ্ববিদ্যালয়, রিয়াদ। সবে মাত্র আমার পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিপ্লোমা কোর্স শেষ হয়েছে। এইতো কদিন হলো; সৌদী সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয়ে চাকুরী নিয়েছি। পদটিও বেশ লোভনীয়। সেন্সর অফিসার। হঠাৎ দেশ থেকে ছোট্ট বোনের চিঠি পেলাম। আম্মা অসুস্থ্য জানিনা সকলের সাথে তাদের মায়ের সম্পক এতো গভীর কিনা।

আম্মা সাংঘাতিক অসুস্থ্য তাদের একমাত্র ছেলে আমি। পারিবারিক চাপের মুখে বিয়ের জন্য রাজি হয়ে গেলাম। পাত্রী জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য জনাব অধ্যাপক আব্দুল খালেকের মেঝ কন্যা ছাত্রী সংস্থার সদস্যা সাহিত্য সম্পাদিকা শামসুন নাহার সাকী।

বিয়ের ক'দিন পরে সস্ত্রীক শ্বশুরের বাসায় এলাম। শুনলাম খান সাহেব নাকি আমার শ্বশুর সাহেবকে মেয়ের জামাই না দেখানোর জন্য ঠাট্টা করেছেন। এতো বড় এক নেতা; কতো বড় খোলা মনের লোক হলে এতো রসালো ঠাট্টা করতে পারে ভেবে নেতাকে আমার আরো কাছের থেকে কাছের মানুষ মনে হলো। শ্বশুর সাহেব তাকে জামাই দেখার আমন্ত্রণ জানালেন। ধোপদুরস্ত পরিপার্টি পোশাকে যথা সময়ে তিনি উপস্থিত হলেন। এই বয়সেও পোশাকে আশাকে এতো পরিপাটি থাকা যায় তা তাকে না দেখলে আমার বিশ্বাস হতোনা। আলাপের পর আরো বুঝলাম বাহ্যিক তিনি যতো পরিপাটি তার চেয়ে মনের দিক থেকে আরো পরিপাটি বেশী। ভাবগম্ভীর, অথচ সাংঘাতিক রসিক। স্বল্পভাষী অথচ কথার শৈল্পিক আকর্ষণে মানুষকে কাছে টানেন। ব্যক্তিত্ব সচেতন, অথচ গর্ব নেই। কথাবার্তা আচার আচরণে অকৃত্রিমতার কোনো ছাপ নেই। অনাবিল মন। এতো বয়োজেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব আমার সাথে আপনা আপনি করে সম্বোধন করায় আমি প্রথমে একটু হতচকিত হয়ে পড়েছিলাম। যাই হোক যতোটুকু তাঁর সান্নিধ্য লাভ করার সৌভাগ্য সেদিন হয়েছিল তাতে নিজেকে খুব ধন্য মনে হয়। দীর্ঘ দিন দেশের বাইরে থাকার কারণে অনেক বার সাক্ষাৎ হলেও এই নেতাকে এতো কাছের থেকে কখনো পাইনি।

তার ইন্তেকালের কদিন আগে থেকেই পত্রিকা হাতে পেলেই আমি তার খবরটা আগে পড়তাম। তার মৃত্যুতে আমি যা দুঃখ পেয়েছিলাম তার চেয়ে তার এই সুন্দর মরণের জন্য তার উপরে আমার ঈর্ষা জন্মেছিলো আরো বেশী। যা আমি আমার স্ত্রী ও অন্যান্য বন্ধু-বান্ধবদেরকেও বলেছি। আমি প্রত্যহ সংগ্রাম পত্রিকা রাখি। দৈনিক সংগ্রাম খান সাহেবের উপরে যে ক্রোড়পত্র ছাপিয়েছিলো এ সংখ্যাটি আমাদের হকার কেন যেনো আমাদের বাসায় দেয়নি। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সেদিন বাসায় ফিরে মনটা খুব বিষণ্ন হয়ে গেলো। সারাটি শহর খুঁজে একটি হকারের একটি থেকে আমি একটি কপি সংগ্রহ করে যখন বাসায় ফিরলাম তখন রাত্র দুপুর। হঠাৎ দেখলাম মুহতারম আব্দুল কাদের মোল্লাহর একটি লেখা। যার শিরোনাম -"যে মরনের জন্য আমার লোভ হয়।" পড়ে বুঝলাম, এই মহান ব্যক্তিত্বের মরণ শুধু আমাকেই ঈর্ষান্বিত করেনি ঈর্ষান্বিত করেছে আরো অনেক নেতাকেও। যিনি এভাবেই মৃত্যুকে জয় করতে পারেন তিনিই লিখতে পারেন অবিস্মরণীয় বই "মৃত্যু যবনিকার ওপারে।"
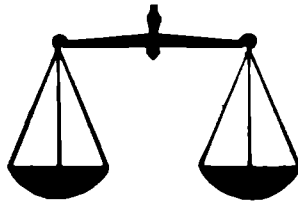
স্মৃতিতে আব্বাস আলী খান

আ. স. ম. মামুন শাহীন

সাবেক সেক্রেটারী জেনারেল
বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির

আব্বাস আলী খান সাহেবের সাথে প্রথম দেখা হয় দিনাজপুরে ১৯৮৩ সালে। আমি তখন অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র। সে সময় আব্বা দিনাজপুর সরকারী কলেজে অধ্যাপনা করতেন। বার্ষিক পরীক্ষা শেষে নওগাঁ থেকে দিনাজপুর বেড়ানোর জন্য গিয়েছি। একদিন আব্বার কাছ থেকে শুনি জামায়াতে ইসলামীর নেতা আব্বাস আলী খান সাহেব দিনাজপুরে একটা প্রোগ্রাম উপলক্ষে আসছেন। খান সাহেব এসে উঠেছেন জামায়াতের বর্তমান কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য আব্দুল্লাহ্ হিল কাফী সাহেবের বাসায়। আব্বা তখন কাফী সাহেবের বাসাতেই থাকতেন। আমার যতদূর মনে পড়ে সফর শেষে বিদায়ের সময় আমাকে লক্ষ্য করে তিনি বলেছিলেন "ছাত্রশিবিরের সাথে সম্পৃক্ত থেকে ভালোভাবে কাজ করতে হবে।" খান সাহেবের এই ছোট্ট একটি কথা ছাত্রশিবিরে অগ্রসর হওয়ার ক্ষেত্রে আমার মাঝে ব্যাপক অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করেছিল।

এরপর আব্বাস আলী খান সাহেবের সাথে বিভিন্ন সময় বহুবার দেখা সাক্ষাৎ হয়েছে। তবে ১৯৯৪ থেকে ১৯৯৭ সাল পর্যন্ত ঢাকায় থাকাকালীন সময়ে খান সাহেবের সাথে বেশী ঘনিষ্ঠ হবার সুযোগ হয়েছিল। তিনি ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। আজ খান সাহেবের অনেক কথাই মনে পড়ছে। কিছু টুকরো স্মৃতি তুলে ধরার জন্য চেষ্টা করবো।

জামায়াতের সাথে নামাজ আদায়ের ব্যাপারে তিনি ছিলেন খুবই সচেতন। প্রচণ্ড শীতের সময়ও দেখেছি জয়পুরহাটে বাসা থেকে এসে তালিমুল ইসলামী একাডেমী মসজিদে জামাতের সাথে ফজরের নামাজ আদায় করতে। '৯৪ সালে জয়পুরহাট আদর্শ স্কুলে শিবিরের একটা T. C চলাকালীন জুমার দিন খান সাহেব মসজিদে এসে T.C বিরতি না দেয়ার কারণে সেদিন তিনি বেশ ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। সেদিন জুমার খুতবায় তিনি নামাজের গুরুত্ব তুলে ধরে দীর্ঘ বক্তব্য রাখেন। ইসলামী আন্দোলনের কর্মী হিসেবে তিনি নামাজকে সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব দেয়ার তাগিদ করেন এবং জরুরী মাসলা মাসায়েল জানার ব্যাপারেও গুরুত্ব আরোপ করেন।

আব্বাস আলী খানের সমায়ানুবর্তিতা আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। শিবিরের কোনো প্রোগ্রামে কোনো দিন Late করে আসতে দেখিনি। একবার মজলিশে শূরার অধিবেশন শেষে খান সাহেবের ঢাকা থেকে নাটোরে সফরে যাওয়ার কথা শুনি। ইসলামী ছাত্র শিবিরের প্রাক্তন কেন্দ্রীয় সভাপতি তাসলিম আলম ভাই সাথে যাবেন আমি ও মর্তুজা ভাই সাথে যেতে চাইলে ভোর ৪.৩০ টার সময় উনার বাসায় পৌছার জন্য বললেন। তাসলিম ভাইসহ আমরা খান সাহেবের বাসায় পৌছে দেখি

উনি Ready হয়ে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন। আমাদের লক্ষ্য করে বললেন একটু দেরী হয়ে গেলো। এরপর একত্রে ফজরের নামাজ পরে আমরা রওয়ানা হই।

বাহির থেকে অনেকেই খান সাহেবকে খুব গম্ভীর বলে মনে করতেন। আসলে তিনি ছিলেন বেশ রসিক মানুষ। তার প্রতিষ্ঠিত তালিমুল ইসলাম একাডেমী স্কুলের ছাত্ররা সকলেই খান সাহেবকে নানা বলে ডাকত এবং তিনিও তাদের সাথে বেশ রসিকতা করতেন। একদিন খান সাহেবের কাছে জরুরী কথা বলার জন্য গিয়েছি। সে সময় একজন ভাই এসেছেন একটি আবেদনে তার সুপারিশ নেয়ার জন্য। তিনি সুপারিশ লিখে স্বাক্ষর দেয়ার পর সিল খুঁজতে গিয়ে দেখেন Acting আমীর ছাড়া কোনো সীল নেই। তখন তিনি বললেন আমি তো এখন ভারমুক্ত। একটু পরেই তিনি এমনভাবে বললেন যে আমি তো এখনো ভারপ্রাপ্ত। আমরা সকলেই হাসতে লাগলাম। আমীরে জামায়াত তখন দেশের বাইরে ছিলেন।

খান সাহেব ছিলেন প্রচণ্ড পরিশ্রমী। '৯৫ সালের বন্যার সময় দীর্ঘ ২১ দিন তিনি জয়পুরহাট থেকে ব্যাপক ত্রাণ তৎপরতা পরিচালনা করেছিলেন। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত একটানা পায়ে হেঁটে, নৌকা ও ভ্যানে চড়ে দুর্গত মানুষের দ্বারে দ্বারে গিয়ে ত্রাণ তৎপরতা চালানোর পরও তার মাঝে কোনো ক্লান্তি ছিলোনা। '৯৬ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সময় তিনি যেভাবে গণসংযোগ করেছেন তা সত্যিই আশ্চর্যজনক। যেসব প্রত্যন্ত এলাকায় জীপে যাওয়া সম্ভব নয় সেসব এলাকায় গরুর গাড়িতে চড়ে হলেও গিয়েছেন গণ সংযোগের জন্য।

শিবিরের প্রতি খান সাহেবের ভালোবাসা ও সহানুভূতি ছিলো অতুলনীয়। বিভিন প্রোগ্রামের ব্যাপারে খান সাহেবের সাথে আমাকেই যোগাযোগ করতে হয়েছে বেশী। সুস্থ থাকলে তিনি কোনো প্রোগ্রাম সাধারণত না করেননি।

অনেক স্মৃতিকথা মনের আকাশে ভিড় জমিয়ে চলেছে। সব কথা তো আর একটি লেখায় লিখে শেষ করা সম্ভব নয়। অসুস্থ থাকা অবস্থায় আগস্ট '৯৯ বিকেলে জামায়াতের কেন্দ্রীয় অফিস থেকে খান সাহেবের সাথে দেখা করার জন্য তাঁর বাসায় গিয়েছিলাম। বেশ কিছুক্ষণ তার সাথে কথা হয়। সে সময় শারীরিক অবস্থা কিছুটা ভালই ছিলো। আমি আলাপের এক পর্যায়ে খান সাহেবকে বললাম-স্যার আপনার কলেজতো MPO ভুক্ত হয়ে গেলো। তিনি বেশ প্রশান্তির সাথেই বললেন হ্যাঁ হয়েছে। সাথে সাথে তিনি বললেন এবছর সকলেই H. S. C. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে। ৩রা অক্টোবর দুপুরের পর যখন আব্বাস আলী খান সাহেবের মৃত্যু সংবাদ শুনি তখন চোখের পানি সংবরণ করতে পারিনি। তার কাছ থেকে অনেক কিছুই অর্জন করেছি, কিন্তু কিছুই দিতে পারিনি। তাই মৃত্যুর পর আল্লাহর দরবারে দু'হাত তুলে অশ্রু ফেলে ঋণ শোধ করার ব্যর্থ চেষ্টা করছি। আব্বাস আলী খান আর আমাদের দৃষ্টির সামনে নেই। তবে তিনি আমাদের হৃদয়ে যুগ যুগ ধরে থাকবেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তাঁর রচনা থেকে আমাদের নতুন প্রজন্ম পাবে পথের সন্ধান। মহান আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ জানাই, আল্লাহ যেনো তাকে জান্নাতুল ফেরদৌসে স্থান দান করেন।

প্রিয় নেতার স্মৃতি

আবদুল মজিদ মোল্লা
(জয়পুরহাট)

আমরা একই শহরের বাসিন্দা। তাই তাঁকে খুব নিকট থেকে দেখার সুযোগ আমার হয়েছিল। তিনি জয়পুরহাট রামদেওবাজলা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। উত্তরবঙ্গের মুসলমানদের মধ্যে ডিস্টিংশনসহ প্রথম গ্রাজুয়েশন ডিগ্রী লাভ করেন তিনি। তিনি শিক্ষামন্ত্রী হিসেবে রামদেওবাজলা উচ্চ বিদ্যালয় পরিদর্শন করেন। সেই দিন আমি ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র হিসেবে ক্লাসে উপস্থিত ছিলাম। আমি ১৯৯৬ সালের জুন মাসে জামায়াতে ইসলামীতে যোগদান করি। তখন থেকে জয়পুরহাটে তাঁর সফরের সময় আমি এবং আমার সহকর্মী আইনজীবীগণ প্রায়ই তাঁর সাথে দেখা করতাম।

১৯৯৮ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারীর একটি ঘটনা, যা আমার ডায়েরীতে নোট করে রেখেছি। জয়পুরহাট তালিমুল ইসলাম একাডেমী এ্যাণ্ড কলেজ মাঠে আসরের নামাযের পর তাঁর সাথে দেখা করলাম। তিনি আমার কুশল জিজ্ঞাসার পর আমাকে চা ও কিছু বিস্কুটের দ্বারা আপ্যায়ন করলেন। তিনি ইসলামের সৌন্দর্যের উপর অবলোকপাত করলেন। তিনি বললেন ঃ ইসলামের সৌন্দর্য হলো অকৃত্রিম ভ্রাতৃত বন্ধনে একে অপরকে আবদ্ধ করা এবং প্রত্যেকেই অপরের স্বার্থকে অগ্রাধিকার দেয়া। কিন্তু, এর পরিবর্তে যদি কেউ পরশ্রীকাতর হয় তাহলে সে ইসলামী ভ্রাতৃত্বের বন্ধন থেকে নিজকে বিচ্ছিন্ন করলো।"

এক বর্ষাকালে তিনি আমার বাসায় আসতে চাইলেন। কিন্তু আমার বাসায় যাতায়াতের রাস্তার কিছু অংশ কাঁচা কর্দমাক্ত এবং দুই এক ফুট পানির নীচে নিমজ্জিত থাকার কারণে তিনি আমার বাসা পর্যন্ত পৌছতে পারলেননা। আমি খুব ব্যথা পেলাম। কিছুদিন পর রাস্তার পানি নেমে গেলো। সেদিন ছিলো শুক্রবার। তাঁকে দাওয়াত করলাম। জুম্মার নামাজান্তে তিনি আমার বাসায় আসলেন। আমি খুবই আনন্দিত হলাম। আমার পরিবার পরিজনও এতো আনন্দিত হয়েছিল যে তা ভাষায় প্রকাশ করা যায়না। আমি মহান আল্লাহপাকের দরবারে শুকরিয়া আদায় করলাম।

জয়পুরহাট জেলায় আইনজীবীদের মধ্যে জামায়াতে ইসলামীর সাংগঠনিক কোনো ইউনিট ছিলনা। ১৯৯৭ সালের গোড়ার দিকে জেলার কয়েকজন আইনজীবীকে নিয়ে তিনি একটি ইউনিট গঠন করে নাযেম হিসেবে আমাকে দায়িত্ব দেন। এর পরে যখনই তিনি জয়পুরহাটে আসতেন প্রায় সময়ই আইনজীবীদের নিয়ে বৈঠক করতেন। একদিন তাঁর ড্রয়িং রুমে আমরা কয়েকজন উপস্থিত ছিলাম। তিনি সাইয়্যেদ আবুল আলা মওদূদী (র.)-এর লেখা, "ইসলামী রাষ্ট্র ও সংবিধান" বইটি

আমার হাতে তুলে দিয়ে বললেন, আইনজীবী এবং সংসদ সদস্যদের পড়ার জন্য খুবই জরুরী পুস্তক। এ ছাড়াও তিনি আইনজীবী ইউনিটে বেশ কিছু বই দিয়েছেন। এভাবে তিনি আমাদেরকে ইসলামী আন্দোলনে উৎসাহিত করেছেন। জয়পুরহাট জেলা জামায়াতে ইসলামী অফিসে একদিন বিকেল বেলা আমরা বিশ-পঁচিশ জন আইনজীবী তাঁর সঙ্গে মত বিনিময় অনুষ্ঠানে মিলিত হয়েছিলাম। তখন ছিলো রমযান মাস। তিনি বললেন, "আইনজীবীদের কাজ হলো যুলুমের প্রতিকার করা "যুলুম থাকলে আইনের শাসন থাকে না।"

তিনি হজ্বব্রত পালন করে এসেছেন। একদিন তাঁর বাসায় গেলাম। একটি কাঁচের গ্লাসে তিনি জমজমের পবিত্র পানি এবং আরব দেশের খেজুর নিজ হাতে পরিবেশন করে বললেন, "উকিল সাহেব পানি দাঁড়িয়ে খাবেন।" এই কথা বলে একটু মৃদ হাসলেন। এ ধরণের বহু স্মৃতি রয়েছে।

আমি একদিন একটি ইসলামী জলসায় বক্তৃতা করার পর তিনি প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখলেন। অতঃপর জলসার উদ্যোক্তা জনাব আবু মোসলেম খাঁনের বাসায় রাতের খাবার খেতে বসেছি, খেতে খেতেই তিনি বললেন, বক্তৃতার সময় বেশী জোরে কথা বলেন কেন? তার জন্যতো মাইক আছেই। এইভাবে তিনি উপদেশ দিলেন।

গত রমযানের শেষ দশ দিন তিনি জয়পুরহাটে বড় মসজিদে এতেকাফে বসেছিলেন। তারাবী নামায পড়ার সময় তাঁর পার্শ্বে বেশ কয়েকদিন নামায পড়ার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। যখন পবিত্র কুরআন শরীফ তারাবী নামাযে খতম হয়ে গেলো অতঃপর অবশিষ্ট রমযানের দিনগুলো তিনিই তারাবীর নামাযসহ অন্যান্য ওয়াক্তের নামাযেও ইমামতি করতেন। তাঁর পিছনে নামায পড়ার কি যে তৃপ্তি তা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়।

একদিন সংবাদ পেলাম আমার রুকনিয়াত মঞ্জুর হয়েছে। সম্ভবত জেলা আমীর সাহেব বাইয়াৎ গ্রহণ করবেন। কিন্তু দেখা গেলো ঐদিনই তিনি ঢাকা থেকে জয়পুরহাট এসেছেন। ১৯৯৮ সালের ২৯শে নভেম্বর আসর নামাযের পর জেলা জামায়াত অফিসে তিনি আমার বাইয়াৎ নিলেন। ঐ সময় চোখের অশ্রু সংবরণ করতে পারিনি। প্রিয় নেতার আরও বহু স্মৃতি বাঁকী থেকে গেলো।

আব্বাস আলী খান সাহেব আমার আদর্শ

আঃ বঃ মঃ সুজা আযম চৌধুরী

জনাব আব্বাস আলী খান আমার আপন মামার শ্বশুর। সেই সূত্র ধরে উনাকে নানা বলে ডাকতাম। আমার মামা ঘর জামাই থাকতো। সেইজন্য উনি পাঁচবিবিতে খুব একটা আসতেন না। তাছাড়া আমি তখন ছেলে। উনি যে খান সাহেব তা জানতাম না। পরে জেনেছি উনিই আমার আলতাফ মামার শ্বশুর। তাছাড়া মামার পরিবারের অনেকে আওয়ামী লীগ করতো। তাই তেমন একটা আমাদের পরিবারে উনাকে নিয়ে আলোচনা হতো না। ১৯৬৯ সালের কথা তখন আমি ৯ম শ্রেণীর ছাত্র। আমার আব্বা আগে মুসলিম লীগ করতেন। পরে জামায়াতে ইসলামীতে যোগ দিয়েছিলেন। আমি ছাত্রলীগ করতাম। আমি জামায়াত পছন্দ করতামনা। ১৯৬৯ সালে প্রাদেশিক পরিষদে নির্বাচনে আমার আব্বা মরহুম শাহাবউদ্দিন চৌধুরী জামায়াত থেকে মনোনীত হলেন। পরে আমার আব্বা খান সাহেবের অনুরোধে নাম প্রত্যাহার করে নিলেন। মরহুম ইব্রাহীম হোসেন মহব্বত জুরী সাহেবকে মনোনয়ন দিলেন। সেই দরবার আমাদের বাসায় হয়েছিল। সেই দরবারেই আমার খান সাহেবকে ভালেভাবে দেখার সুযোগ হয়েছিল। তখন তার বিভিন্ন কথাবার্তা শুনে আমি অবাক হয়েছিলাম। আর চিন্তা করতে ছিলাম আমাদের পরিবার কেন তার দল করে না। তখন থেকে তার প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা জন্মাতে লাগলো। তখন থেকে তার প্রতি ও তাঁর দলের প্রতি আমার দুর্বলতা দেখা দিলো, কিন্তু আমি বাতিল সংগঠন করার কারণে তা প্রকাশ করতে পারলামনা।

৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ায় আমিও ওদিকে ঝুকে পড়লাম। এর মধ্যে অনেক সময় পার হয়ে গেলো। দেশ স্বাধীন হবার পর আমি বুঝলাম আমরা কোথায় যাচ্ছি। শেখ মুজিব নিহত হবার পর বুঝলাম যে আমি ভ্রান্ত পথে আছি আওয়ামী লীগের নেতাদের ভূমিকা দেখে। তখন থেকে আমি ধীরে ধীরে সরে আসলাম।

কিন্তু তখন আমার মনের ভিতর জামায়াতের কথা ও খান সাহেবের কথাও চিন্তা-চেতনা ঢুকে পড়লো। তখন আমি আস্তে আস্তে জামায়াত নেতা ও কর্মীদের সঙ্গে যোযাযোগ করতে লাগলাম। যখন খাঁন সাহেব জয়পুরহাট আসেন তখনি আমি গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করি। এতে আমার মামা খুব খুশী হতেন। আমি খান সাহেব এর সঙ্গে বেশী মেলামেশা করার ইচ্ছা পোষণ করতাম।

সেই ৬৯ সালের কথা মনে পড়লো। আমার বাড়ীতে খান সাহেবের আগমন। চিন্তা করতে লাগলাম এমন নেতা ও এমন দলের আনুগত্য করা যায়। সেখানে দুনিয়া ও আখেরাত দুটো পাওয়া যায়।

মুক্তি যুদ্ধের সময় খান সাহেব তার জামাইয়ের ভাইদেরকে কি সাহায্য সহযোগিতা

করেছে তা ভাবতে অবাক লাগে। তার চাচাতো ভাইদেরকে খান সাহেব আল্লাহর রহমতে পাক সেনাদের কাছ থেকে জীবন রক্ষা করেছেন। কিন্তু বেঈমান সেনাদের এমন মহান নেতার বিরোধিতা করতে একটু লজ্জাবোদ করেনা। কিন্তু আমি তার এই উদারতা দেখে মুগ্ধ হয়েছি। তাকে আরো গভীরভাবে বুঝার চেষ্টা করেছি। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছি এমন নেতাকে আনুগত্য আমাকে করতেই হবে। নইলে আল্লাহর কাছে জবাব দেবার ভাষা থাকবে না। পাঁচবিবিতে আসলে উনি আমাদের বাসায় আসতেন। আমি ৮৪ সালে জামায়াতের ফরম পূরণ করে জামায়াতের কর্মী হলাম। ১৯৮৬ সালে আমার আব্বা মারা যাবার পর খান সাহেব আমাদের বাড়ীতে আসলেন। তিনি আমাদেরকে এমনভাবে সান্ত্বনা দিলেন তখন সমস্ত ব্যথা বেদনা ভুলে গেলাম। মনে হলো খান সাহেব সত্যিই আমাদের আপনজন। তাঁর সান্ত্বনা বাণীশুনে আর মনে কোনো দুঃখ থাকলোনা।

তারপর থেকে যখনি উনি পাঁচবিবি আসতেন তখনই আমাদের বাড়ীতে আসতেন। আমার কাছে সংগঠনের খোজ-খবর নিতেন। আমি থানার কোনো দায়িত্বশীল নয় তবুও উনি আমার সঙ্গে এমনভাবে আলাপ করতেন যেনো আমি একজন থানার দায়িত্বশীল। আমিও উনাকে সমস্ত খবর বলতাম। সেইজন্য থানার নেতারা আমাকে খুব গুরুত্ব দিত। যেটা তারা খান সাহেবকে বলতে পারতোনা সেটা আমার দ্বারা বলাতো।

১৯৯৫ সালে আমার স্ত্রী হার্ট স্ট্রোক করলেন। উনি জয়পুরহাট এসে জানতে পেরে সঙ্গে সঙ্গে পাঁচবিবিতে আসলেন এবং সোজা আমার বাড়ীতে এসে আমার স্ত্রীর পাশে এসে দেখলেন ও আমার কাছ থেকে সব শুনলেন। আমার স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলেন আমাকে চিনতে পারছো? আমার স্ত্রী আস্তে আস্তে উত্তর দিলোঃ খান সাহেব নানা। উনি শুনেছেন যে স্থানীয় নেতারা নাকি আমার এই বিপদে কোনো খোঁজ-খবর নেন নাই। সেইজন্য তিনি স্থানীয় নেতাদের ভর্ৎসনা করেছেন। তখন তারা বলেছেন, না স্যার আমাদের দুইজন কর্মী সেখানে গিয়েছে এবং যতো রকম সাহায্য লাগে করেছে। সেই কথাটা যাচাই করার তিনি জন্য আমাকে জিজ্ঞাসা করেছেন আমি বলেছি হ্যাঁ তারা এসেছিল এবং সবরকমের সহযোগিতা করেছে। এতে বুঝা যায় কতো বড় নেতা তিনি। আমার স্ত্রী তার এই মহানুভবতা দেখে মুগ্ধ হয়েছেন। এমনকি আমার শ্বশুরবাড়ীর সকলেও অভিহিত হয়েছেন। তারা সকলে জামায়াতের দিকে ঝুকে পড়ছেন। খান সাহেবের সঙ্গে যারা মেলামেশা করেন নাই তারা কল্পনাও করতে পারবেননা যে, উনি কতো বড় দয়ালু উদার মনের অধিকারী। তাই তার সঙ্গে যতো আলাপ করি ততোই মুগ্ধ হই। আর মনে মনে বলি এতো বড় নেতা পাওয়া যাবেনা।

আব্বাস আলী খান : তাঁর সাহিত্য-মনীষা

মোশাররফ হোসেন খান
কবি ও গবেষক

সর্বজন শ্রদ্ধেয় আব্বাস আলী খান [১৯১৪-১৯৯৯] ছিলেন একাধারে শিক্ষাবিদ, রাজনীবিদ এবং একজন সুলেখক ও অনুবাদক। তাঁর রাজনৈতিক এবং অন্যান্য প্রসঙ্গ নিয়ে অনেকেই লিখবেন এবং এ ধারা বোধ করি অব্যাহতও থাকবে। সুতরাং ঐসব বিষয়াবলীর দিকে না গিয়ে আমি এখানে কেবল তাঁর সাহিত্য সংশ্লিষ্ট কাজগুলোর একটি ইঙ্গিতবহ চারিত্র স্পর্শ করার চেষ্টা করব।

আব্বাস আলী খানের সাহিত্য রুচি, অভিজ্ঞান এবং পাঠের যে তীব্র তীক্ষ্ণ দৃষ্টি বিদ্যুৎ চমকের মতো ঝলকানি দিয়ে উঠতো, তার সেই আলোকিত আভায় প্রায়শই চমকে উঠতাম। তাঁর পাণ্ডিত্য, ভাষা আর লেখার আধুনিকতম কৌশল ও কারুকাজে আপ্লুত না হয়ে পারিনি।

১৯৯২ সালের নবেম্বরের কথা। 'পৃথিবী' পত্রিকায় কাজ করতে গিয়ে আব্বাস আলী খানের হাতের লেখার সাথে প্রথম পরিচিত হলাম। এর আগেই পরিচিত ছিলাম তাঁর সাহিত্য ভাষার সাথে। কিন্তু ঐ প্রথমই তাঁর টানাটানা, নির্ভুল 'বানান, চাতুর্যপূণ ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ ও বাক্যের সাথে পরিচিত হলাম। এই সময়ে 'পৃথিবী'তে প্রকাশিত হচ্ছিল ধারাবাহিকভাবে তাঁর সেই বিখ্যাত ইতিহাসকেন্দ্রিক লেখা- 'বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস।'

লেখাটি তিনি শুরু করেছিলেন মাসিক 'পৃথিবী'তে নবেম্বর, ১৯৮৯ সালে। আর শেষ করেছেন-মে, ১৯৯৪। মাঝখানে অতিবাহিত হয়েছে [১৯৮৯-১৯৯৪] সাড়ে পাঁচ বছর। এই সাড়ে পাঁচ বছর যাবত ধারাবাহিকভাবে তিনি লিখেছেন এবং তা প্রকাশও হয়েছে।

বিস্ময়কর ব্যাপারই বটে! বিস্ময়কর এই দিক থেকেও, তিনি যখন এই লেখাটি শুরু করেন তখন তাঁর বয়স [১৯১৪-১৯৮৯] পঁচাত্তর বছর। আর যখন সেটা শেষ করলেন, তখন দাঁড়িয়েছে [১৯১৪-১৯৯৪] আশি বছরে।

ভাবা যায়! তখনও তিনি সমান লিখেছেন। কে না জানে যে তিনি কেবল লেখাকে কেন্দ্র করেই চব্বিশটি ঘন্টা অতিবাহিত করার অবকাশ পেতেন না। দিনের সিংহভাগ সময়ই তিনি ব্যস্ত থাকতেন নানাবিধ কাজে। এই সব হাজারো কাজের ফাঁকে তিনি যে কীভাবে, নিয়মিত 'পৃথিবী'র প্রতিটি সংখ্যায় লেখা দিতেন, তা আজও আমার কাছে এক বিস্ময়কর ব্যাপার হয়ে আছে। লিখতেন নিজের হাতেই। সাধারণ কাগজ আর সাধারণ বলপয়েন্ট ব্যবহার করতেন। লক্ষ্য করেছি, তাঁর প্রতিটি বর্ণের টানছিল দ্রুতগতিসম্পন্ন, অথচ স্পষ্ট। ইংরেজী এবং বাংলা দুটো হাতের লেখায় সমান

কারিশমা-তাঁর মত আর কারোর মধ্যে আমি তেমনটি পাইনি। মাঝে মাঝে অনুকরণ করতেও প্রলুব্ধ হয়েছি। কিন্তু পারিনি।

শত ব্যস্ততার মধ্যেও তিনি একাধারে লিখে গেছেন 'পৃথিবী'তে 'বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস'। অবশেষে এটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হলো ১৯৯৪ সালে, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার থেকে। যখন গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হলো তখন এর পৃষ্ঠা সংখ্যা দাঁড়াল ৫১৬। আর এই গ্রন্থ লেখার জন্য তিনি যেসব ইংরেজী ও বাংলা গ্রন্থের সাহায্য নিয়েছেন, তার সংখ্যা ১১৭। এই ১১৭ খানা সহায়ক গ্রন্থের মধ্যে ৭৮ খানা ইংরেজী এবং বাকি মাত্র ৩৯ খানা বাংলা। সুতরাং এ থেকেই অনুমান করা যায় তাঁর পাঠ, পরিশ্রম এবং অভিনিষ্ঠতা। মনে রাখা দরকার, এই সময়ে তিনি অতিবাহিত করছেন আশিতম বছর। আশি বছর বয়সে, অন্তত আমাদের দেশে এ ধরনের কাজ কেবল বিস্ময়করই নয়, মনে করি- স্মরণকালের এক ইতিহাসও বটে।

'বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস' [১৯৯৪] প্রকাশের সাথে সাথেই তুমুল আলোড়ন তুলেছিল পাঠক মহলে। যার কারণে 'একশো ত্রিশ টাকা' দামের এই বিপুলাকারের গ্রন্থটি মাত্র একটি বছর না পেরুতেই নিঃশেষ হয়ে গেল। এর দ্বিতীয় মুদ্রণ প্রকাশিত হলো ঠিক তার পরের বছরই, ১৯৯৫।

অসম্ভব পরিশ্রম, ধৈর্য এবং একাগ্রতার সমবায়ে গড়ে ওঠা 'বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস' তাঁর সাহিত্য জীবনের এক অসামান্য চূড়া স্পর্শী গ্রন্থ। এই গ্রন্থটি কেবল আজকের দিনের জন্য নয়, আগামী শতকের জন্যও সমান দরকারি গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত হবে। তিনি ইতিহাসের কেবল বহিরাঙ্গকেই ধারণ করেননি-স্পর্শ করেছেন তার অন্তর্গত দেয়ালকেও। এখানেই গ্রন্থটির গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে অনেক বেশি। আর এ কারণেই গ্রন্থটি প্রকাশের পরপরই গৃহীত এবং নন্দিত হয়ে ওঠে ব্যাপকভাবে। তারপরও তো থেমে থাকেননি তিনি। 'পৃথিবী'তে নিয়মিত লিখেছেন, আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়-'নওমুসলিমের কথা' 'পৃথিবীতে' তাঁর সর্বশেষ লেখা প্রকাশিত হয়েছে জুন, ১৯৯৯ সংখ্যায়। তখন তাঁর বয়স [১৯১৪-১৯৯৯] পঁচাশি বছর স্পর্শ করেছে। কিন্তু না, বয়সের সেই স্বাক্ষরের এতটুকুও ছায়া পড়েনি তাঁর হাতের লেখায় কিংবা বিষয়গত বিন্যাসে। এতটুকুও বদলায়নি তাঁর প্রজ্ঞা এবং পাণ্ডিত্য। বয়সের ভারে নুয়ে পড়েনি তাঁর শব্দ কিংবা বাক্যের গঠন। সকল কিছু তেমনি আধুনিক ছিলো। আধুনিক ছিলো তাঁর উপস্থাপনা কৌশলও। পঁচাশি বছর বয়সেও যে আমাদের এই দেশের ক্ষীণ কায়া শরীরের মানুষের ভেতর এমন উজ্জীবিত তরুণ প্রাণ থাকতে পারে, তাঁকে না দেখলে, তাঁর সদ্য লেখার সাথে পরিচিত না হলে বুঝাই যেতোনা।

আব্বাস আলী খানের সময়ানুবর্তিতা ঃ একটি চিত্র

আমিনুর রহমান মুহাম্মদ মনির

১৯৮৬ সাল। চতুর্থ জাতীয় সংসদের নির্বাচনে ঢাকা-৬ আসনে দাড়িপাল্লা প্রতীক নিয়ে জননেতা জনাব আব্বাস আলী খান প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছিলেন। অন্যান্য প্রার্থীদের মধ্যে জাতীয় পার্টির জনাব আব্দুর রহিম এবং আওয়ামী লীগের জনাব মোজাফফর হোসেন পল্টু ছিলেন অন্যতম। ঢাকা মহানগরীর একটি মাত্র আসনে নির্বাচন করায় মহানগরী জামায়াতের সকল জনশক্তিকে জনাব খানের নির্বাচনী এলাকায় ভোটারদের নিকট ভোট প্রার্থনার জন্য নিয়োজিত করা হয়। স্বৈরাচারী শাসকের শাসনে অতিষ্ঠ জনগণ খান সাহেবের মত সৎ, যোগ্য এবং অভিজ্ঞ পার্লামেন্টারিয়ানকে বিপুলভাবে সমর্থন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। অবশ্য স্বৈরাচারী সরকারের প্রার্থীর সশস্ত্র সন্ত্রাসী বাহিনী ভোট কেন্দ্রগুলো দখল করে নেয়ায় ভোটাররা তাদের স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করতে পারেননি বা ব্যক্ত করতে দেয়া হয়নি।

নির্বাচনে বয়োবৃদ্ধ নেতা সকাল থেকে শুরু করে গভীর রাত অবধি ভোটারদের বাড়ী বাড়ী গিয়ে নিজের আদর্শের কথা বলতেন এবং ভোটের মত পবিত্র আমানতটি সৎ পাত্রে দান করার আহ্বান জানাতেন।

একদিন গোরান ও খিলগাঁও এলাকায় খান সাহেব অন্যান্য দিনের মতো সকাল থেকে সকলকে নিয়ে হেঁটে হেঁটে ক্যাম্পেইন করলেন। নির্বাচনের দিন ঘনিয়ে আসায় এবং বিরাট এলাকা দ্রুত কভার করার লক্ষ্যে নামায ও দুপুরে খাওয়ার জন্য সামান্য বিরতি দিয়ে তিনটায় জামাত কেন্দ্রীয় অফিসে আবার একত্রিত হবার কথা বলে সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীল সকলকে বিদায় দিলেন। উপর্যুপরি রাতদিন পরিশ্রমের ফলে সবাই ক্লান্ত। বেলা তিনটায় পুনরায় বের হবার সময় নির্ধারিত হবার পরও সকলে ধারণা করেছিলেন আছরের আগে আর সম্ভবতঃ খান সাহেব বের হবেন না। কারণ সকালের দিকে তাঁকে খুবই ক্লান্ত দেখাচ্ছিল। নামায ও খাবার পর আল্লাহর মেহেরবানীতে নিজ শরীরের ক্লান্তিকে উপেক্ষা করে আমি বাসা থেকে তিনটার মধ্যে কেন্দ্রীয় অফিসে চলে এলাম। এসে দেখি আমার আগেই খান সাহেব হাজির। আমি উনাকে দেখে সালাম দিতেই গম্ভীর কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন, তিনটা তো বেজে গেছে লোকজন কোথায়? উনার প্রশ্নে এদিক ওদিক তাকিয়ে কাউকে না দেখে আমতা আমতা করতে লাগলাম। পুনরায় গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, "যাদের সময় জ্ঞান নেই তাদের দিয়ে আর যাই হোক, ইসলামী বিপ্লবের কাজ হবে না।"

আমার হৃদয়ে আব্বাস আলী খান

মুহাম্মদ শামসুল আলম
সোহাগপুর, সিরাজগঞ্জ

১৯৮৪ সালে ঢাকার কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশন ময়দানে জামায়াতে ইসলামী আয়োজিত এক কর্মী সম্মেলনে সর্বপ্রথম আমি তদানিন্তত ভারপ্রাপ্ত আমীর মুহতারাম আব্বাস আলী খানকে বেশ দূর থেকে দেখেছিলাম এবং তাঁর ভাষণ শুনে মুগ্ধ হয়েছিলাম। অবশ্য এরও বেশ আগে ৭৭/৭৮ সালে আমি যখন মাধ্যমিক স্কুলের ছাত্র, তার লেখা স্মৃতি সাগরের ঢেউ" পড়ে তাঁর ভক্ত হয়ে গিয়েছিলাম।

তারপর অনেকবার তাঁর বক্তৃতা শুনেছি। যেখানেই তাঁর জনসভার কথা শুনেছি, তাঁকে এক নজর দেখার জন্য, তাঁর কথা শুনার জন্য সেখানেই ছুটে গিয়েছি। তাঁকে খুব কাছে থেকে মাত্র দু'বার দেখার সৌভাগ্য হয়েছে। প্রথমবার সিরাজগঞ্জ বি. এ. কলেজ ময়দানে জামায়াতের সিরাজগঞ্জ জেলা আমীর অধ্যাপক আব্দুল খালেক এর জানাযা পূর্ব সমাবেশে খুব কাছে থেকে পরিতৃপ্তির সাথে তাঁকে বিভিন্ন এ্যাংগল থেকে দেখেছি। ইচ্ছে হয়েছিল তাঁকে ছুঁয়ে দেখি। তাঁর চেহারায় সেদিনই দেখেছিলাম স্বর্গীয় দিপ্তী, শ্রদ্ধাহারী অভূতপূর্ভ ব্যক্তিত্বের ছাপ। আমি মুগ্ধ হয়েছিলাম। ঐদিন তাঁর হৃদয় ছোঁয়া বক্তৃতা শুনে আমি ভীষণ কেঁদেছিলাম। খান সাহেব মরহুম আব্দুল খালেকের জন্য দোয়া করছিলেন। সবাইকে উদ্দেশ্য করে বলছিলেন তিনি (আঃ খালেক) ক্যামন লোক ছিলেন? তিনি সবাইকে সাক্ষী রেখে মহান আল্লাহর কাছ মরহুমের রূহের মাগফিরাত চাইছিলেন। আমি কাঁদছিলাম। আর কি অভূতপূর্ব আস্থায় নিশ্চিত হয়েছিলাম যে, আল্লাহ্ তাঁর দোয়া কবুল করেছেন। কী এক পরম তৃপ্তি নিয়ে সেদিন বাড়ী ফিরে ছিলাম।

সর্বশেষ '৯৫ সালে সিরাজগঞ্জ দারুল ইসলাম একাডেমী ময়দানে সিরাজগঞ্জ জেলা জামায়াত আয়োজিত এক সমাবেশে খান সাহেব আসবেন জেনে তাঁকে দেখার জন্য ছুটে গিয়েছিলাম। সেদিন দেখলাম বয়সের ভারে তিনি ক্লান্ত, শ্রান্ত। তাঁর পায়ের পাতাগুলো ফোলা ফোলা দেখলাম। তাঁর বক্তৃতা শুরু হলো। মনে হলো তাঁর সিনায় টেপ রেকর্ডার আছে তা সাবলীল ভাবে বেজে চলছে আর উনি শুধু ঠোঁট মিলাচ্ছেন। কী ওজস্বী, সুঠাম, প্রাঞ্জল তাঁর ভাষা! প্রতিটি শব্দ যেন সোনার টুকরো হয়ে ঝরছিল আর হাজার হাজার শ্রোতা তা কুড়াচ্ছিল। আসলে আমি আমার অনুভূতি পুরাপুরি ব্যক্ত করতে পারলাম না, তা ব্যক্ত করা যায় না।

তাঁর সর্বশেষ ঢাকার বাইরে মিটিং ছিলো উল্লাপাড়ায়। আমি যেতে পারিনি-এ আফসোস সারা জীবন আমাকে পীড়া দেবে।

অনেক দিন আগে থেকেই তাঁর কাছে পত্র লেখার চিন্তা-ভাবনা করতাম, লিখতামও

কিন্তু তাঁর মূল্যবান সময় নষ্ট হবে এই ভয়ে পোস্ট করতামনা। পরিশেষে গত ৩০.৮.৯৮ ইং তারিখে তাঁর কাছে একখানা পত্র পাঠাই। তাঁর লিখা "স্মৃতি সাগরের ঢেউ" বইখানার খোঁজ জানতে আর আমার শারীরিক অসুস্থতার জন্য দোয়া চেয়ে লিখেছিলাম। আমি সেই চিঠির জবাব পেয়েছিলাম। তাঁর পবিত্র হাতের লেখা চিঠিখানা এখন আমার সম্পত্তি।

ওনার ইন্তেকালের কিছুদিন আগে আমীরে জামাত সৌদী আরব যাবার খবর পড়লাম, ভারপ্রাপ্ত আমীর দেখলাম এবার শামসুর রহমান। তখনই আমার অন্তর কেঁপে উঠলো। জানলাম উনি লিভার সিরোসিস-এ আক্রান্ত। ৩ অক্টোবর/৯৯ রবিবার উনি ইন্তিকাল করলেন। আমি কাঁদতে পারিনি। তাই আমার খুব কষ্ট হচ্ছে।

আমার বড়ই আকাঙ্ক্ষা ছিলো ওনার সাথে দেখা করবো, কথা বলবো, দোয়া চাইবো। জান্নাতে যেনো ওনার সাথে আমার দেখা হয় দয়াময় আল্লাহর কাছে এ আমার প্রার্থনা। আমীন।

এখানে আমাকে দেয়া তাঁর পত্রখানা প্রদত্ত হলো ঃ

জনাব শামসুল আলম সাহেব

আস্‌সালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ

আপনার ৩০/৮ /৯৮ তাং-এর পত্র পেয়ে খুশী হয়েছি। আশাকরি ভালো আছেন এবং সর্বদা সুস্থ থাকুন এ দোয়াই করি।

আমার 'স্মৃতি সাগরের ঢেউ' বইখানা দ্বিতীয় সংস্কার চলছিল। বোধ হয় শেষের দিকে। পরবর্তী সংস্করণের প্রয়োজন হবে। প্রকাশক পাওয়া কঠিন। বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস ২য় সংস্করণ চলছে।

আমি বর্তমানে সাংগঠনিক কাজকর্ম ও সফর ইত্যাদি খুব কম করে লেখাপড়ার কাজ বেশী করি। সকাল ১০ টা থেকে যোহর পর্যন্ত এবং আসর থেকে এশা পর্যন্ত অফিসে বসে লেখাপড়ার কাজ করি।

আপনার স্বাস্থ্যের জন্য ডাক্তারের পরামর্শ নেয়া উচিত। কিন্তু একমাত্র আল্লাহতায়ালাই যখন রোগ নিরাময়কারী তখন ওষুধপত্র খাওয়ার পরও তাঁর কাছেই আরোগ্যলাভের জন্য কাতর কণ্ঠে দোয়া করতে হবে।

এ সম্পর্কে কিছু দোয়াও আছে। শিখে নিবেন।

অতি ব্যস্ততার মধ্যে আপনার এ পত্রের সংক্ষিপ্ত জবাব দিলাম।

আপনার শুভানুধ্যায়ী
আব্বাস আলী খান

তিনি আমাদের হৃদয়ে চিরদিন বেঁচে থাকবেন

মোঃ আফজাল হোসেন

সকাল বেলা হকারের হাত থেকে পত্রিকাখানা নিয়ে চোখ বুলিয়ে মাহজেবিন সেই যে নীরব অশ্রুতে বুক ভাসিয়ে চলেছে তার বিরাম এখন পর্যন্ত হলোনা। ওদিকে নাস্তার টেবিলে রকিব ওকে না দেখতে পেয়ে ঘরে এসে দেখতে পায়, মাহজেবিন পত্রিকা হাতে অনবরত কেঁদে চলেছে। আর মাঝে মাঝে ওড়নার প্রান্ত দিয়ে গণ্ডদেশের ওপর গড়িয়ে পড়া চোখের পানি মুছছে। রকিব অবাক হয়ে যায়। ভেবে পায়না এই সাত সকালে মাহজেবিনের কি হলো? কেন সে নাস্তা খেতে না যেয়ে এখানে বসে বসে কাঁদছে? রকিব ওর কাছে যায়। আদর করে স্নেহার্দ্র স্বরে ওর মাথায় হাত রেখে বলে, কি হয়েছে। আমার লক্ষী বোনটি, এই সাত সকালে কেন তুই কাঁদছিস? রকিবের আগমনে মাহজেবিন এবারে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে, ভাইয়া ....। রকিব বলে, হ্যাঁ বল, কি হয়েছে তোর? এভাবে কাঁদছিস কেন? মাহজেবিন হকারের দেয়া পত্রিকাখানা রকিবের দিকে এগিয়ে ধরে। রকিব হাত বাড়িয়ে নেয়ার আগেই পত্রিকার হেড লাইনের ওপর চোখ পড়ে যায়। দেখতে পায় বড় বড় অক্ষরে লেখা আছে, "শতাব্দীর মহীরুহ, ইসলামী আন্দোলনের অন্যতম প্রাণ পুরুষ জনাব আব্বাস আলী খান আজ আর আমাদের মাঝে নেই।" রকিব স্তব্ধ নির্বাক। ওর বাড়ানো হাত ওভাবেই থেকে যায়। কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে আসে দূরাগত ধ্বনির মতো একটি ঐশীবাণী, "ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন।"

মাহজেবিন রকিবের কাঁধে মাথা রেখে কান্না বিজড়িত কণ্ঠে বলে, এ বছরটা বড়ই অশুভ; এ বছরের শেষ প্রান্তে ঘটে গেলো এ মৃত্যু। আল্লাহ এ বাংলাদেশের ইসলামী চিন্তাবিদ শতাব্দীর প্রত্যক্ষদর্শী ইসলামী কাফেলার বুলন্দ আওয়াজকারীকে নিজের কাছে ডেকে নিলে। ইসলাম প্রিয় মু'মিনের বুকে জাগিয়ে দিলেন উত্তাল সাগরের বাঁধ ভাঙা শোকের জোয়ার। কাঁধ থেকে মাহজেবিনের মাথাটা নামিয়ে রকিব শোকাহত কণ্ঠে বলে হ্যাঁ বোন তুই ঠিকই বলেছিস। বাংলার তথা উপমহাদেশের ইসলামী আন্দোলনের রাহবার, অন্যতম দিকপাল আজ দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে গেলেন আর রেখে গেলেন ইসলামী কাফেলার বুকে দূরপনেয় শোকের দগ দগে ক্ষত।

রকিব মাহজেবিনকে সাথে নিয়ে যখন নাস্তার টেবিলে আসে তখন সকলেই নাস্তা সেরে যে যার মতো কাজে চলে গেছে। রকিব আর মাহজেবিনের নাস্তার প্রতি আর কোনো আকর্ষণ থাকেনা। দায় সারা গোছের দু'একটা রুটি খেয়ে ওরা দু'জন দু'কাপ চা হাতে নিয়ে পান করতে করতে আলাপ করতে থাকে। রকিব বলে, তোর কাজগুলো কেমন চলছে? মেয়েদের ভেতর কেমন সাড়া পাচ্ছিস? মাহজেবিন চায়ের কাপে চুমক দিতে দিতে বলে, প্রচুর সাড়া পাচ্ছি ভাইয়া। আমার ধারণাটাই বদলে গেছে।

–কিসের ধারণা?

– আমার একটা ভয় ছিলো এই ভেবে যে, আজ কাল ইসলামের কথা শুনলে মানুষ যেভাবে বাঁকা চোখে দেখে, মৌলবাদী বলে গাল দেয়। কিন্তু আল্লাহ্র রহমতে কাজ করতে নেমে আমি কোনো রকম অসুবিধা বা বাধার সম্মুখীন হইনি। গুটি কতেক বিকৃত রুচির পাশ্চাত্যেনুরাগী ছাড়া আমাদের অনার্স কোর্সের সকল সহপাঠিনীরাই আমার দাওয়াতে আন্তরিকভাবে সাড়া দিয়েছে। তারা আমার কাছ থেকে দীনী বই পুস্তক পড়ছে, সাপ্তাহিক বৈঠকেও যোগদান করছে। লক্ষণ দেখে মনে হচ্ছে, ইসলামী ধ্যান ধারণাকে সঠিকভাবে তাদের সামনে তুলে ধরতে পারলে, অচিরেই ইসলামী আন্দোলনের মহিলা শাখায় দুর্গম পথের অভিযাত্রীদের সংখ্যা বাড়বে বৈ কমবেনা। তবে ভাইয়া একটি কথা ....রকিব জিজ্ঞাসু চোখে ওর দিকে তাকায়। মাহজেবিন বলে, আমাকে যে বই-পুস্তক দিয়েছিলে তা শেষ হয়ে গেছে। আমি আগে ওদের মাঝে ফ্রি বই-পুস্তক বিতরণ করেছিলাম; এখন অনেকেই পড়ার জন্য পয়সা-খরচ করে হলেও বই কিনতে রাজি। বই-পুস্তক পাবার জন্য ওরা রীতিমত আমাকে পীড়াপীড়ি করছে; হেযাব বা পর্দার সুফল পেয়েছে বলে এখন মেয়েরা দলে দলে বোরখা পরিধান করছে।

মাহজেবিনের কথা শোনার সাথে সাথে রকিবের চেহেরার ওপর থেকে ক্ষণকাল পূবে ইসলামী আন্দোলনের মহান প্রাণ পুরুষের মৃত্যু শোকের ছায়া কেটে যেয়ে। এখন ধীরে ধীরে ফুটে উঠে সে চেহেরায় আনন্দ উৎফুল্লতার আভাষ। রকিব এবার সহসা চিন্তার গভীরে হারিয়ে যায়। কে বলে আব্বাস আলী খানের মৃত্যু ঘটেছে? এই তো তাঁর বাঁধানো সিঁড়ির পথে কাফেলারা আজ যাত্রা শুরু করেছে। একদিন এঁরা অবশ্যই মঞ্জিলে মকছুদে পৌছে যাবে।

কাজেই এই মহান বীর সৈনিকের মৃত্যু হয়নি, হতে পারে না। জনগণের মাঝে যে ইসলামী আন্দোলন, যে ইসলামী জীবন বিধান আঁকড়ে ধরে বেঁচে থাকার শুভ সূচনা পরিলক্ষিত হচ্ছে, তা রুখবার মতো কোনো শক্তি নেই। এ দুর্বার গতি অব্যাহত থাকবে। খুন, জখম, উৎপীড়ন, নির্যাতন এবং জঘন্যতম কূটকৌশলের লৌহ প্রাচীর ভেদ করে এ মৃত্যুঞ্জয়ী কাফেলার প্রাণ পুরুষের আদর্শ বাংলার মাটিতে প্রথিত গ্রথিত হবে। সত্যের আলোকে উদ্ভাসিত জনগণ বাতিলের জুলমাতকে দূরীভূত করে আল্লাহ্র জমিনে তাঁরই কানুন-একদিন প্রতিষ্ঠিত করবে। আর এরই মাঝে আজকের বিদেহী বন্ধু ইসলামের রাহবার জনাব আব্বাস আলী খান, কেয়ামত পর্যন্ত বেঁচে থাকবেন। এ অগণিত মু'মিনের শ্রদ্ধা বারিতে আপ্লুত হবেন। বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনার জন্য এদেশের কোটি কোটি তৌহিদী জনতার দোয়ার পুষ্পবারি ঝরবে অনন্তকাল ধরে।

মাহজেবিন রকিবের আকস্মিক অন্যমনস্কতায় অবাক হয়ে ওর গায়ে ঝাঁকি দিয়ে বলে, কি হলো ভাইয়া, কি এতো চিন্তা করছো? রকিব সম্বিত ফিরে পায়। নিজকে আত্মস্থ করে বলে, মাহজেবিন, তোর কথায় আজ আমি বড় শান্তি পেলাম, খুব আশ্বস্ত হলাম বোন। আমি এই ইসলামী আন্দোলনের দুর্গম পথে পা বাড়িয়ে যে কষ্ট, যে ব্যথা

বেদনার অগণিত যন্ত্রণা সয়েছি আজ তোর কথায় আমার সব দুঃখ সব জ্বালা মুছে গেলো। আল্লাহ্ এ কাফেলার পরীক্ষার প্রহর বুঝি হ্রাস করতে চলেছেন। পূবের আকাশে আজ ইসলামের সুরভিত সোনালী প্রভাত উঁকি দিচ্ছে। আব্বাস আলী খানেরা কখনও মরতে পারেনা। তিনি তো আমার, তোর এবং এ দেশের লক্ষ কোটি ইসলাম প্রিয় মানুষের হৃদয়ে জেগে থাকবেন অনন্তকাল ধরে। কালের ছোঁয়া আল্লাহর এই বীর সৈনিকদের, এই বীর পুরুষদের আদর্শকে কখনো মুছে ফেলতে পারবেনা। তাঁরই হাতে গড়া পথে ইসলামী কাফেলার দুঃসাহসী বীর নর-নারীরা একদিন অভীষ্ট লক্ষ্যে মঞ্জিলে মকছুদে পৌঁছে যাবে।

শোন বোন, তোরা সব বোনেরা মিলে মরহুমের মাগফেরাতের জন্য একটি দোয়ার মাহফিলের আয়োজন করে ফেল। আমরাও করছি। যতো বই পুস্তক লাগে আমরা তোদের সরবরাহ্ করবো। পয়সার প্রশ্ন যেনো না ওঠে। বলবি, আল্লাহর পথে যারা আত্মনিবেদিত প্রাণে কাজ করে যায়, তাদের সব প্রয়োজন, সব চাহিদা তিনি এমনভাবে পূরণ করে দেন, যার কল্পনাও কেউ করতে পারেনা।

কথা শেষ করে রকিব বিড়বিড় করে মহাকবি ইকবালের একটি চরণ আবৃত্তি করে, "কুছ এ্যায়ছে ভি ইছ বুযমছে উঠ্ জায়েংগে জিনকো তুম ঢুঁড়কে নিকলোগে মাগার পা না সাকো গে।" কিছু এমন লোক এ সমাবেশ থেকে উঠে যাবে যাদের সন্ধানে বেরুবে কিন্তু পাবেনা।

লেখক ঃ একজন হাইস্কুল শিক্ষক।

আমার প্রেরণায় আব্বাস আলী খান

চৌধুরী মুহাম্মদ আজিজুল হক

জনাব চৌধুরী আজিজুল হক সাহেব ইসলামী আন্দোলনের একজন নিবেদিত প্রাণ সৈনিক। জনাব আব্বাস আলী খান ১৯৭৯ সালে সাইয়েদ মওদূদী র.-এর জানাযায় শরীক হবার জন্য লাহোর গিয়েছিলেন। জনাব চৌধুরী খান সাহেবের সফর সংগী হয়ে মরহুম মাওলানার জানাযায় শরীক হন। এ লেখায় তিনি খান সাহেব সম্পর্কে তাঁর স্মৃতি রোমন্থন করেছেন। - সম্পাদক

যখন থেকে মুহতারাম আব্বাস আলী খান সাহেবের সাথে আমার পরিচিতি এবং সান্নিধ্য লাভ হয়েছে তখন থেকেই ইনতিকালের পূর্ব পর্যন্ত তাঁর গৌরবান্বিত পূণ্যময় জীবনের পরিচয় পেয়েছি। সেগুলোর কোন্‌টি ছাড়বো আর কোন্‌টি লিখবো তা নির্নয় করা কঠিন। অল্প কিছুদিন তাঁর সাথে উঠাবসার সুযোগ হয়েছিল তাতেই এমন কিছ স্মৃতি হৃদয়ে অংকিত হয়েছে যা এখনো মনকে দোলা দেয়। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটির বর্ণনা করছি ঃ

১৯৭৯ সালে লাহোরে সাইয়েদ আবুল আ'লা মুওদূদী র.-এর জানাযায় অংশ গ্রহণের জন্য জনাব আব্বাস আলী খান সাহেবের সফর সঙ্গী হয়েছিলাম। ঢাকা মহানগরী জামায়াতের তখনকার সম্মানিত আমীর মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী ভাইয়ের কাছে মোজাদ্দেদে জামান মর্দে মুমীন ওস্তাদে আ'ম সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী র.-এর ইনতিকালের খবর শুনা মাত্রই চোখ দিয়ে অনর্গল অশ্রু ঝরতে লাগলো।

আমীরে জামায়াত খান সাহেবকে মরহুম মাওলানার জানাযায় পাঠানোর সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করার সাথে সাথেই নিজামী ভাই খুব ধীর ও নরম কণ্ঠে বললেন "চৌধুরী সাহেবও খান সাহেবের সাথে জানাযায় যেতে চান।" আলহামদু লিল্লাহ, আমীরে জামায়াত এতে সম্মতি দিলেন। আমি এবং খান সাহেব বাংলাদেশ বিমানে করাচীর উদ্দেশ্যে রওয়ানা করলাম।

বিমানে দু'জনের পাশাপাশি সিট। বয়সে ছোট হওয়ায় খান সাহেব আদর করে আমাকে জানালার পাশের সিটে বসতে দিলেন। বিমানে উঠার, চলার এবং নামার সময় করণীয় নিয়মাবলী তিনি আমকে শেখালেন। যদিও ইতিপূর্বে ২/১ বার আমার আন্তর্জাতিক বিমান ভ্রমণের সুযোগ হয়েছিল। তথাপী সেদিন তাঁর কাছ থেকে যে শিক্ষা পেলাম তা ছিলো খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।

লাহোর এয়ারপোর্টে পৌছে জানতে পারলাম, আমরা পৌছার পূর্বেই কফিন লাহোরে পৌছেছে এবং সকাল দশটায় গাদ্দাফী ষ্টেডিয়ামে জানাযা অনুষ্ঠিত হবে। করাচী থেকে আমাদের বিমান সংগী ইম্পেক্ট ইন্টারন্যাশনাল-এর সম্পাদক সাহেব বললেন, 'সময় আর হাতে নেই, চলুন খান সাহেব, ষ্টেডিয়ামে চলে যাই।' লাহোর এয়ারপোর্ট থেকে সোজা ষ্টেডিয়ামে আমরা চলে গেলাম। আমরা ষ্টেডিয়ামে পৌছার সাথে সাথেই মরহুম মাওলানার কফিন নিয়ে আসলেন নেতৃবৃন্দ। ষ্টেডিয়াম কানায় কানায় পূর্ণ হবার পর বাইরেও অসংখ্য জনতার ঢল নামে। জানাযা শুরুর পূর্বক্ষণে ইমাম সাহেব সংক্ষিপ্ত বক্তব্যের মাধ্যমে বললেন, 'মরহুম মাওলানার জীবন আজ সার্থক।

লক্ষ কোটি লোক আজ এই আন্দোলনে শামিল। লাহোর গাদ্দাফী ষ্টেডিয়ামে মরহুমের এ ঐতিহাসিক জানাযায় শরীক হয়ে জনতা প্রমাণ করে দিলো ইসলাম ছাড়া পাকিস্তানের মুক্তির আর কোনো বিকল্প পথ নেই।' সমবেত জনতা সমস্বরে ইমাম সাহেবের কথার পক্ষে রায় দিলো। পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল জিয়াউল হকসহ অন্যান্য অনেক জেনারেল, রাজনীতিবিদ, পদস্থ সরকারী-বেসরকারী লোক জানাযায় শরীক হয়েছিলেন।

আরো একটি ঘটনায় অবাক হয়েছি। জানাযার সালাম ফিরানোমাত্র ষ্টেডিয়ামের অপর প্রান্ত থেকে পিন পতন নীরবতা ভেদ করে গুরু গম্ভীর স্বরে শ্লোগানের মতো একটা আওয়াজ এলো "সাইয়েদী মুর্শেদী" - সাথে সাথে সমবেত জনতা উচ্চ স্বরে বলে উঠলো, "মাওলানা মওদূদী"। সঙ্গে সঙ্গে কান্নার রোল পড়ে গেলো ষ্টেডিয়ামে। তখন গোটা ষ্টেডিয়মময় কী যে এক মর্মন্তুদ বেহেশতী পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছিল তা চোখে না দেখলে বুঝানো মুস্কিল। মাইক থেকে আওয়াজ এলো, "মরহুম মাওলানার কফিন নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।"

আমরা বিদেশী মেহমান ছিলাম প্রায় হাজার দুইয়ের মতো। জমিয়তের সেচ্ছা সেবকরা নিরাপদ বেষ্টনী সৃষ্টি করে লক্ষ জনতার ভীড় ঠেলে কফিন বাহিরে নিয়ে চলে যায়। আমার বাম হাতে ক্যামেরা আর ডান হাত দিয়ে খান সাহেবকে শক্ত করে ধরা। কারণ মানুষের চাপে খান সাহেব যদি পড়ে যান তাহলে আর উপায় নেই। জনতার ভীড়ে সামনের লোক অনবরত ধরাশায়ী হচ্ছে। এক পর্যায়ে আমিও পড়ে গেলাম। সাথে সাথে উঠে দেখি খান সাহেব নেই। আমার ক্যামেরা কোথায় গেছে তারও পাত্তা নেই। ক্যামেরা গেছে যাক, কিন্তু আমার খান সাহেব কোথায়? অনেকে নাম ধরে চিৎকার করে তাদের সাথীদের ডাকছেন। কিংকর্তব্য বিমূঢ় হয়ে আমি শুধু আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করছি, 'হায় আল্লাহ! অপরিচিত জায়গা, নিজেই বা কোথায় যাই আর খান সাহেবকে-ই বা কোথায় পাই।' সারা ষ্টেডিয়ামে প্রায় ঘন্টা খানেক খোঁজার পর খান সাহেবকে পেলাম বহুদূরে এক গাছের নীচে। সালাম দিয়েই বুকে জড়িয়ে ধরলাম তাঁকে। দেখি কাঁপতেছেন তিনি। যে গাড়ীতে এসেছিলাম ইতোমধ্যে সে গাড়ীও এসে পড়েছে। কথা বার্তা না বলে মনসূরা জামায়াতের কেন্দ্রীয় সদর দপ্তরে চলে গেলাম। সেখানে খান সাহেবকে ওষুধ খাইয়ে শরীর একটু চাঙ্গা করে পূর্ণ বিশ্রামের সুযোগ দিলাম। রাতে একটু সুস্থ হয়ে তিনি বললেন তাঁর হারিয়ে যাওয়ার সমস্ত ঘটনা। বললেন, 'জনাব চৌধুরী, ক্যামেরা গেছে যাক, আল্লাহ যে আমাদেরকে বাঁচিয়ে রেখেছেন সে জন্যই শুকরিয়া আদায় করা দরকার। যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল তাতে তো বাঁচারই কথা ছিলোনা। আমি অবাক হলাম, কষ্ট হয়েছে খান সাহেবের বেশী, অথচ তাঁর কোনো পেরেশানী আমার নজরে পড়লনা।

মনসুরাতে মরহুম মাওলানার কফিন আসা মাত্রই জেঃ জিয়াউল হক মাওলানাকে দেখতে গিয়েছিলেন। মাওলানার মুখের কাপড় সরিয়ে চুমু খেয়ে কেঁদে উঠে জিয়াউল হক বললেন, "আজ পাকিস্তানসে নূর চলা গিয়া।"

পাকিস্তান সফরের সময় একবার পাকিস্তানের জনৈক সাংবাদিক খান সাহেবকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ "কব বাংলাদেশ মে ইসলামী হুকুমাত কায়েম হোংগে?" খান সাহেব সাথে সাথে জবাব দিলেন ঃ "পহ্‌লে এধার কর লিয়ে না বাদমে দেখা যায়গা বাংলাদেশ মে কেয়া কিয়া যায়ে।"

এ শূন্যতা পুরাবে কে

আবু সালেহ্ আমীন (লন্ডন)

দেশবাসীর সমান বিশেষতঃ ভবিষ্যত নাগরিকদের সামনে দেশের আদি ইতিহাস বা ফাউন্ডেশন বর্জিত ইতিহাস জ্ঞান একটি জাতির সুস্থ বিকাশের পথে একটি বড় ধরনের চ্যালেঞ্জ। এই প্রেক্ষিতে অতীত ও বর্তমান সকল সরকারের ব্যর্থতার পটভূমিতে জনাব আব্বাস আলী খান সাহেব নানা শিরোনামে পৃথিবীসহ বিভিন্ন পত্রিকায় গবেষণাধর্মী ও তথ্যপূর্ণ ধারাবাহিক প্রবন্ধ লিখার মাধ্যমে বাংলাদেশের ইতিহাসের ফাউন্ডেশন রচনার কাজ শুরু করেছিলেন। আমরা আশাবাদী হয়েছিলাম যে নতুন প্রজন্ম তার শক্ত লেখনী ও দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসিক্ত উপস্থাপনা থেকে সামনে চলার পথ খুঁজে পাবে। কিন্তু তাঁর ইন্তেকালে সেই সম্ভাবনায় একটি বড় ধরণের প্রশ্নবোধক চিহ্ন যোগ হলো ঃ এ শূণ্যতা পুরাবে কে?

মরহুম আব্বাস আলী খান সাহেব কি শুধু ইতিহাস রচনায় ছিলেন সিদ্ধহস্ত? একটি প্রবন্ধে অথবা আমার মত একজন বালকের পক্ষে এই বিশাল ব্যক্তিত্বের আলোচনা করা সম্ভব নয়। জনাব খান সাহেব ছিলেন একজন সুসাহিত্যিক ও শিক্ষাবিদ। তার প্রতিষ্ঠিত জয়পুর হাটের ঐতিহ্যবাদী আদর্শ স্কুল ও অগণিত ছাত্র তার এই অবদানের একটি ক্ষুদ্র উদাহরণ। তাঁর মৃত্যুতে বাংলাদেশের ইসলামী পুনর্জাগরণ আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্তরা হারিয়েছে একজন শীর্ষস্থানীয় শিক্ষককে। শুধু বাংলাদেশ নয় ইউরোপ আমেরিকার দেশে দেশে তিনি ছুটে বেড়িয়েছিলেন ইসলামের দাওয়াতকে ছড়িয়ে দেয়ার কাজে। ইসলামী জ্ঞানের মশাল প্রজ্জ্বলিত করে ছিলেন তিনি ছাত্র যুবকদের প্রাণে প্রাণে। মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুরে (সম্ভবতঃ ১৯৮৭/৮৮) অনুষ্ঠিত ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ফেডারেশন অব ইসলামিক অর্গানাইজেশনের (ইফসুর) সম্মেলনে তিনি আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। সারা দুনিয়ার ইসলামী আন্দোলনের ছাত্রযুব নেতৃবৃন্দের সামনে তাঁর বক্তব্য সকলের জন্য দিক নির্দেশনার কাজ করেছিল। একই সময় কুয়ালালামপুরস্থ আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে তার আলোচনা দেশ বিদেশের ছাত্রশিক্ষকদের প্রশংসা কুঁড়িয়েছিল।

ভাবতে বড়ই কষ্ট হচ্ছে যার কাছ থেকে দোয়া নিয়ে পড়তে এসেছিলাম যুক্তরাজ্যে (১৯৯২ সালের সেপ্টেম্বরের কথা, অধ্যাপক গোলাম আযম সাহেব তখন জেলে), দেশে গিয়ে আর তাঁকে দেখতে পাবোনা! বাংলাদেশের এই ভূখন্ডে যিনি প্রায় অর্ধশতাব্দী ধরে ইসলামী পুনর্জাগরণ আন্দোলনের কর্ণধারের ভূমিকা পালন করছিলেন, তিনি চিরবিদায় নিলেন আমাদের মাঝ থেকে! স্বৈর সামরিক শাসকদের

মিথ্যা মামলা, জেল, জুলুম নির্যাতন লাঠি-গুলি-টিয়ার গ্যাসের সামনে দাঁড়িয়েও তিনি দৃঢ়তার সাথে দেশ ও জাতির সার্বিক মুক্তির পথ নির্দেশনা দিয়েছিলেন। বস্তুতঃ বাংলাদেশের গত সিকি শতাব্দীর রাজনীতিতে তিনি ছিলেন প্রাচীনতম অথচ দীঘ ঘটনাবহুল এক অনন্য ব্যক্তিত্ব। তাঁর নেতৃত্বে পরিচালিত কেয়ার টেকার সরকারের আন্দোলনের ফলশ্রুতিতে তা আজ বাংলাদেশের সংবিধানে সংযোজিত হয়েছে। তিনি যখন জাতীয় প্রেসক্লাবে দাঁড়িয়ে ঘোষণা দিলেন জামায়াত সংসদ সদস্যদের পদত্যাগের, - তখন ভেঙ্গে যায় ১৯৮৬-এর জাতীয় সংসদ। মানিক মিয়া এ্যাভিনিউর ঐতিহাসিক সীরাত সম্মেলনের বিশাল জন সমুদ্রে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি জাতিকে ডাক দিয়েছিলেন ইসলামকে বিজয়ী করার জন্য। রুশ প্রেসিডেন্টকে দাওযাতপত্র পাঠিয়েছিলেন তিনি ইসলাম গ্রহণের আহ্বার জানিয়ে।

মরহুম খান সাহেব ছিলেন ইসলামী আন্দোলনের একজন দূরদৃষ্টিসম্পন্ন তীক্ষ্ণজ্ঞান সমৃদ্ধ এক বিরল নেতৃত্ব। বাংলাদেশের ছাত্র ইসলামী আন্দোলনের একটি কঠিন মুহূর্তে (সম্ভবতঃ ১৯৮৯ সালে) তিনি রাসূল স. এর ইসলামী আন্দোলনের সচিত্র বর্ণনা দিয়ে উদ্ভূত পরিস্থিতির বাস্তব মূল্যায়ন করে বক্তব্য রাখলে উপস্থিত দায়িত্বশীলরা সবাই মোতমায়েন হয়ে যায়। তিনি ছিলেন অত্যন্ত সরল, ভারসাম্যপূর্ণ জীবন ও ধীরস্থির চিত্তের অধিকারী। তাই তিনি দীর্ঘ প্রস্তুতিকে সামনে রেখে জীবনের শেষ পর্যন্ত নিরলসভাবে ভূমিকা পালন করে গেছেন।

জনাব খান সাহেবের মৃত্যুতে আমরা এ জামানার মুজাদ্দিদ আল্লামা সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী র. এর এক ঘনিষ্ঠ সহচরকে হারালাম। এ ক্ষতি পূরণ হবার নয়। তাই আসুন আমরা হাত তুলি মহান রাব্বুল আলামীন যেনো তার সকল নেক আমল কবুল করে তাকে জান্নাতুল ফেরদাউসে উচ্চ মর্যাদা দান করেন। সকল সীমাবদ্ধতা ও দুর্বলতা কাটিয়ে আমাদেরকে তাওফিক দিন মঞ্জিলের পথে সঠিকভাবে এগিয়ে যাবার। আসুন আমরা শপথ নিই তার জীবন থেকে শিক্ষা গ্রহণ করার।

ইসলামী আন্দোলনের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক

মোঃ খায়রুল ইসলাম
আল আমিন ইনস্টিটিউট, মাগুরা

মৃত্যু এক অনিবার্য মহাসত্য। দিনের পর যেমন রাত আসে, আলোর পর আসে যেমন অন্ধকার, তেমনি জীবনের পরিণতি হচ্ছে মৃত্যু। মৃত্যু জীবনের চেয়েও স্বাভাবিক। কিন্তু এমন কিছু মৃত্যু আছে যা স্বাভাবিক ভাবতে কষ্ট হয়। তবুও সে মৃত্যুকে হাসি মুখেই বরণ করতে হয়। যেহেতু মৃত্যুর ব্যাপারে মানুষের কোনো হাত নেই। বয়সের দিক থেকে বিচার করলে খান সাহেব পরিণত বয়সেই দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন। কিন্তু খান সাহেবের মতো মহান সাধক প্রতিদিন বা প্রতি বছর জন্মায় না। এমন মানুষ কালে ভদ্রে জাতির ভাগ্যে জোটে। 'বাগিচায় প্রতিদিন ফুল ফোটে আবার ঝরেও যায়" কিন্তু আব্বাস আলী খানের মতো ফুল ইসলামী আন্দোলনের বিশাল কাননে প্রতিদিন ফোটে না।

আব্বাস আলী খান সাহেবের ইন্তেকালে শুধু একটি জীবন নয় একটি ইতিহাসেরও ছন্দপতন ঘটলো। বাংলাদেশে ইসলামী আন্দোলন আজ যে পর্যায়ে এসেছে তার অন্তরালে যাদের অবদান ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে তিনি তাদের অন্যতম। একটি বিরাট সুদৃশ্য বিল্ডিং নির্মিত হবার পর তার আয়তন, কারুকার্য ও শৈল্পিক কারুকার্য সকলকেই অবাক করে তোলে। কিন্তু বহুতল বিশিষ্ট আকাশ চুম্বি বিল্ডিংটি যেসব অমসৃণ ইট, সুড়কি, রড ইত্যাদির উপর মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকে, সেগুলোর দিকে কারো দৃষ্টি পড়ে না। অথচ ঐ বিশালকার বিল্ডিংটির ভিত্তি মূলে দৃষ্টির অন্তরালে থাকা ইট, সুড়কি আর রডগুলো যদি আত্মপ্রচার বিমুখ না হতো তাহলে সকলে দৃষ্টি নন্দন, কারুকার্য খচিত অপূর্ব শোভামণ্ডিত বিল্ডিংটির কোন অস্তিত্বই থাকতো না। ঠিক এই ভাবে কোনো জাতিসত্ত্বারূপ বিল্ডিংয়ের ভিত্তি মূলে এমন কিছু লোকের শ্রম, মেধা, রক্ত আর সীমাহীন ত্যাগ বিদ্যমান থাকে যা না থাকলে সে জাতি তার অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারে না।

আমাদের জাতিসত্তা বিনির্মাণে যেসব ত্যাগী আত্মপ্রচার বিমুখ ব্যক্তিদের নিঃস্বার্থ কুরবানী অনস্বীকার্য মরহুম খান সাহেব তাদেরই একজন। আমাদের এ দেশ ও সমাজে জাহেলিয়াতের অন্ধকার দূর করে সমাজে শিক্ষার আলো বিস্তারে এবং দেশকে একটি কল্যাণমুখী ইসলামী রাষ্ট্রে পরিণত করার সংগ্রামে তার অবদান জাতি শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করবে। তবে দুঃখের বিষয় হচ্ছে এটাই যে, ক্ষণজন্মা পুরুষদেরকে সঠিকভাবে এদেশের ইতিহাস মূল্যায়ণ করে না। যেমন খান সাহেব লিভার সিরোসিসের রোগী থাকায় তার লাশের ক্ষতি হবে বলে প্রধানমন্ত্রীর নিকট ভাড়া পরিশোধ সাপেক্ষে একটি হেলিকপ্টার প্রদান করার জন্য অনুরোধ করা হলে, তিনি দিলেন না। দল মত নির্বিশেষে সকল মানুষ জানাযায় এলেন ক্ষমতাসীন দল জানাযায় এলেন না। এমনকি একটা শোক বাণীও পাঠালেন না। এ থেকে তাদের হীনমন্যতার পরিচয় পাওয়া যায়।

বিশাল ব্যক্তিত্ব আব্বাস আলী খান

মুহাম্মদ আব্দুর রাশেদ

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় হতে বাসে কুষ্টিয়া শহরে যাচ্ছিলাম। হাতে একটি বই তন্ময় হয়ে পড়ছিলাম। এর মাঝে বাসের একটি চাকা কখন পাংচার হয়ে গেছে। বাস থামিয়ে নতুন চাকা লাগিয়ে আবার যাত্রা শুরু হয়েছে, আমি কিছুই বলতে পারবোনা। আমি তখনও গভীর মনোযোগ দিয়ে বইটি পড়ছি। হঠাৎ পাশের সীটের এক ভদ্রলোক বললেন, ভাই বইটার লেখক কে? বইয়ের নাম কি? আমি বললাম লেখক আব্বাস আলী খান আর বইয়ের নাম "দেশের বাইরে কিছু দিন।" ভদ্রলোক বললেন কোন আব্বাস আলী খান? বললাম জামায়াতে ইসলামীর সিনিয়র নায়েবে আমীর। তখন তিনি চিনলেন এবং বললেন, উনাকে একজন রাজনীবিদ হিসেবেই জানতাম, কিন্তু তিনি যে একজন সুসাহিত্যিক তা তো জানতামনা! আমি যখন বইটি পড়ি। আমার পাশের সীটে বসা ভদ্রলোক ও আমার সাথে সাথে পড়ছেন তা আমি এতক্ষণ লক্ষ্য করিনি। এভাবে কয়েক পৃষ্ঠা পড়েই তিনি অত্যন্ত মুগ্ধ হয়ে বললেন, ভাই বইটির দাম কত? বইটি কোথায় পাবো আমাকে অনুগ্রহ করে বলবেন? তার আগ্রহ দেখে আমি তাকে বইটি দিলাম। তিনি আমাকে দাম দিতে চাইলেন কিন্তু আমি বললাম এটা আপনাকে উপহার দিলাম।

ছোট্ট এই ঘটনাটি আজ খুব মনে পড়ছে। এভাবেই তিনি তাঁর লেখনির মাধ্যমে মানুষকে আকৃষ্ট করেছেন। ১৯৯৪ সালে কুষ্টিয়াতে এক জনসভায় তিনি প্রধান অতিথির ভাষণ দেয়ার পর রাত্রে কুষ্টিয়া সার্কিট হাউজে অবস্থান করেন। ইসলামী ছাত্র শিবির কুষ্টিয়া জেলা শাখার পক্ষ থেকে আমরা একটা ডেলিগেশান তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতে গিয়েছিলাম। তিনি খুব পরিশ্রান্ত থাকার পরও আমাদেরকে অত্যন্ত আন্তরিকভাবে দীর্ঘ সময় দিলেন। দেশ বিদেশে ইসলামী আন্দোলনের অবস্থানের প্রেক্ষাপটসহ্ অনেক বিষয়ে তিনি আমাদেরকে অবহিত করলেন। আর বিদায় বেলায় সবাইকে মাখিয়ে দিলেন সুন্দর একটা আতর। যার সৌরভ পরশ এখনো যেনো আমি অনুভব করি।

তাঁর ইন্তেকালের কয়েকদিন আগে গত ২৫ সেপ্টেম্বর বেলা ১১টার দিকে শ্রদ্ধেয় আব্দুস শহীদ নাসিম সাহেব বললেন, আমি খান সাহেবকে দেখতে যাচ্ছি, তুমি যাবে? আমি বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে লুফে নিলাম এই সুযোগ। তাঁর বাসায় গিয়ে দেখলাম সেই মহান ব্যক্তিত্ব, এক জীবন্ত ইতিহাস বেঘোরে বিছানায় পড়ে আছেন। দীর্ঘক্ষণ আমরা শিয়রে দাঁড়িয়ে থাকলাম। কিছুক্ষণ পর তিনি একটু সজাগ হলে জনাব নাসিম সাহেব সালাম দিয়ে মুছাফা করলেন। তিনি স্পষ্ট চিনতে পারলেন। পরে আঙ্গুল তুলে ইশারা করে আমাকে দেখালেন। নাসিম সাহেব বললেন, ওকে আমরা একাডেমীতে নতুন নিয়োগ দিয়েছি। তিনি নিশ্চিন্তে আবার ঘুমিয়ে গেলেন।

প্রতিভাধর নেতা আব্বাস আলী খান

মুহাঃ জহির উদ্দীন (বাবর)
স্টাফ রিপোর্টার সাপ্তাহিক রামগঞ্জ বার্তা

উনবিংশ শতাব্দীতে এশিয়ার ইসলামী আন্দোলনের নেতৃত্বে যে কয়জন যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি রয়েছেন, তাদের মধ্যে সংগ্রামী মহানায়ক, সুসাহিত্যিক, প্রবীণ রাজনীতিবিদ, খ্যাতনামা ইসলামী চিন্তাবিদ, শতাব্দীর জীবন্ত সাক্ষী, বিশ্ব নন্দিত ইসলামী আন্দোলনের নেতা, বিশ্ববরেণ্য সংগঠন জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের সিনিয়র নায়েবে আমীর জননেতা আব্বাস আলী খান সাহেব অন্যতম।

ডাঃ লুৎফর রহমান বলেছিলেন–" পাহাড় দেখে ভীত হয়ো না, আঘাত করতে শিখ, দেখবে পাহাড় একদিন ধূলো হয়ে তোমার পায়ে পড়বে।" এই বাণীর আলোকে বলবো খান সাহেব মহাগ্রন্থ আল কুরআনের গবেষণা শুরু করলেন এবং ইসলামী আন্দোলনে যোগদান করেন। ৮৫টি বছর জীবন ইকামতে দীনের দাওয়াত দিয়ে গেছেন। উপমহাদেশের ইসলামী আন্দোলনের পথিকৃত সাইয়্যেদ আবুল আ'লা মওদূদীর একজন আলোক দীপ্ত উত্তরসূরী ছিলেন আব্বাস আলী খান। ইসলাম মানবের পূর্ণাঙ্গ ও সামঞ্জস্যপূর্ণ জীবন বিধান। এতে নেই কোনো সংঘাত, নেই বৈরাগ্য। বিশ্ব মানবতার শান্তির ধর্ম ইসলামের দাওয়াতে এবং ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা কায়েমের লক্ষ্যে তিনি পাড়ি জমিয়েছেন দেশ থেকে দেশান্তরে।

ইতিহাস মানুষ সৃষ্টি করে না বরং মানুষই সৃষ্টি করে ইতিহাস। তেমনি খান সাহেব একটি জীবন, একটি আন্দোলন একটি ইতিহাস। মানুষ তথা বিশ্ব মুসলিমের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ হলো ঈমান। ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করতে প্রয়োজন দক্ষ নেতৃত্ব। আর নেতৃত্ব প্রদান করতে জ্ঞান, তাকওয়া ও চরিত্র অপরিহার্য। আব্বাস আলী খান তিনটি রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে সক্রিয় রাজনৈতিক ভূমিকায় থাকার যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন তা বর্তমান বিশ্বে বিরল। তিনি বৃটিশ-ইণ্ডিয়া, পাকিস্তান ও আজকের বাংলাদেশের ইতিহাসের সাথে জড়িত ছিলেন। জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ নামক সংগঠনটিকে বাংলাদেশের জনতার আদালতে প্রতিষ্ঠিত করতে অনেক বেশী যার অবদান তিনি আর কেউ নন আমার আপনার নন্দিত নেতা আব্বাস আলী খান।

মানবতার মুক্তির একমাত্র ধর্ম ইসলাম। ইসলামের আরেক নাম আনুগত্য। আনুগত্যের ব্যাপারেও তিনি ছিলেন অত্যন্ত নিষ্ঠাবান। তার প্রমাণ মেলে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের আমীর, প্রখ্যাত ভাষা সৈনিক সাবেক ডাকসু জিএস। গোলাম আযম সাহেব আব্বাস আলী খান সাহেবের অনেক ছোট। কিন্তু আনুগত্যের তাগিদে তিনি আযম সাহেবকে অতি উচ্চ মর্যাদায় দেখতেন। ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করা আব্বাস আলী খান সাহেবের আমরণ স্বপ্ন ছিলো। এ জন্য প্রয়োজন নেতৃত্ব।

নেতৃত্বের প্রয়োজন অনুভব করে তিনি সাবেক শিক্ষামন্ত্রী, জাতীয় সংসদ সদস্য এবং জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তানের সংসদীয় দলের নেতার দায়িত্ব পালন করেছেন।

খান সাহেবের মৃত্যুতে আমরা হয়ে গেলাম এতীম নিঃস্ব, মানুষ। বাংলাদেশ তথা বিশ্ব ইসলামী আন্দোলন আজ তাঁর শ্রেষ্ঠ সন্তান হারানোর বেদনায় বিমূঢ়। সমগ্র বিশ জুড়ে আজ একটাই ধ্বনি আগামী শতাব্দী হবে ইসলামের বিজয়ের শতাব্দী। ইসলামের বিজয়ের যে অবশ্যম্ভাবী সম্ভাবনা আজ সুস্পষ্ট, এর প্রেক্ষিত বিনির্মাণে বিশ্বের যে কয়কজন ব্যতিক্রমধর্মী মনীষীর অবদান অবিস্মরণীয় তাঁদের মাঝে মহান সাধক আব্বাস আলী খান অন্যতম সমুজ্জ্বল মহিমায় চির ভাস্বর।

খান সাহেবকে হারিয়ে জাতি হারিয়েছে তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ সেবক, সংগঠন ও সমাজ সংস্কারক এবং একজন সাধক পুরুষ। তাই আব্বাস আলী খান শুধু একটি নামই নয়, বরং গ্রেট লিডার, সমাজ সংস্কারক তথা বিশ্ব ইসলামী আন্দোলনের প্রেরণার উৎস। খান সাহেবের জীবনব্যাপী ব্রত ছিল ইলমে দীনের প্রসার। তাইতো তিনি প্রতিষ্ঠা করেছেন তালিমুল ইসলাম একাডেমী কলেজ। শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ ইসলামী ব্যক্তিত্ব। ইসলামী রেনেসাঁর অগ্রপথিক, বিশ্ববরেণ্য ইসলামী আন্দোলনের সিপাহসালার ইসলামী জনতার প্রাণপ্রিয় নেতা, তাকাওয়া ও ঈমানী দৃঢ়তার এক মূর্তপ্রতীক সুলেখক, দাওয়াতে দীনের খ্যাতিমান ব্যক্তিত্ব, বর্ষীয়ান জননেতা, অনলবর্ষী বক্তা, আব্বাস আলী খান বিশাল কর্মময় জীবনের যবনিকা টেনে নশ্বর পৃথিবী ত্যাগ করে লোকান্তরিত হয়েছেন। তাই মহা কবি হাফিজ যথার্থই বলেছেন

> "সব বুলি মিছে, সবার মাঝে একটি বচন সত্য সার
> যে ফুল গিয়াছে নিশায় ঝরিয়া সে ফুল নাহি ফুটিবে আর।"

পরিশেষে বলবো, খান সাহেবের মৃত্যু, অশ্রুর বন্যায় প্লাবিত এ তিরোধান আমাদের শিক্ষা দিয়ে গেছে শুধুমাত্র আল্লাহর সুন্তুষ্টি ও কর্তব্য পালনের তাগিদে ইহকালীন কল্যাণ ও পরকালীন মুক্তির পথে কাজ করা। যবনিকায় তাঁর কর্মময় জীবন পর্যালোচনা করে কুরআনকে সংবিধান হিসেবে এবং রাসূল স. কে নেতা হিসেবে ইসলামী সমাজ গড়ার প্রত্যয় নিয়ে কাজ করার উদাত্ত আহ্বান করছি এবং সাহায্য কামনা করছি বিশ্ব মানবতার মহান প্রভুর সান্নিধ্যে। আমিন।

জিয়া আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের ভিআইপি লাউঞ্জে আমীরে জামায়াতের সাথে মরহুম আব্বাস আলী খান
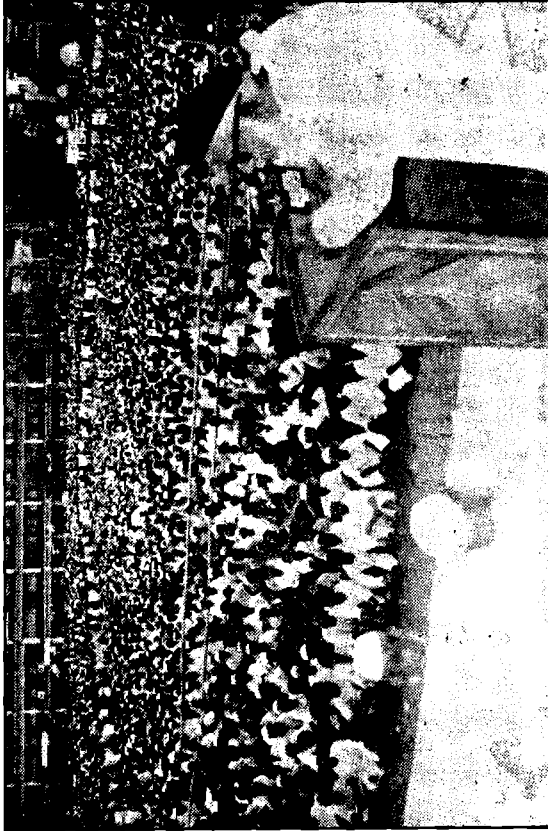
ঢাকার পল্টন ময়দানে আব্বাস আলী খানের শেষ ভাষণ ৪ জুলাই ১৯৯৯ইং

দোয়ার মাহফিলে গোলাম আযম, আবদুর রহমান বিশ্বাস, এরশাদ সহ জাতীয় নেতৃবৃন্দ

জালিম সরকারকে পদত্যাগে বাধ্য করে আব্বাস আলী খানের সর্বশেষ রাজনৈতিক ইচ্ছাকে বাস্তবে রূপ দিতে হবে

স্টাফ রিপোর্টার ঃ প্রবীণ রাজনীতিবিদ জামায়াতে ইসলামীর সিনিয়র নায়েবে আমীর আব্বাস আলী খানের রূহের মাগফিরাতের জন্য জামায়াতে ইসলামী আয়োজিত দোয়ার মাহফিলে গতকাল বুধবার জামায়াত, বিএনপি, জাতীয় পার্টি, ইসলামী ঐক্যজোটসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের শীর্ষ পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের মাধ্যমে দেশের সার্বভৌমত্ব ও অখন্ডতা বিরোধী সরকারকে পদত্যাগে বাধ্য করে আব্বাস আলী খানের সর্বশেষ রাজনৈতিক ইচ্ছা বাস্তবে রূপ দেয়ার

ছবিতে স্মারক
এ্যালবাম
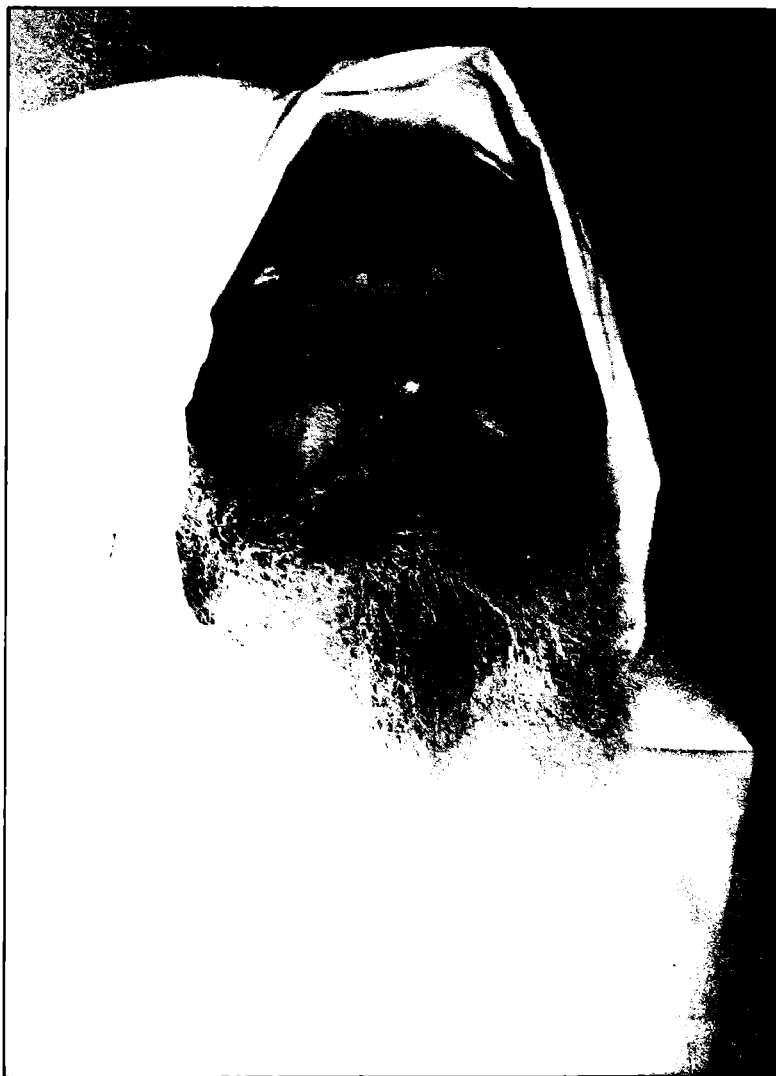
কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার বৈঠকে মঞ্চে আমীরে জামায়াতের ডান পাশে উপবিষ্ট আব্বাস আলী খান
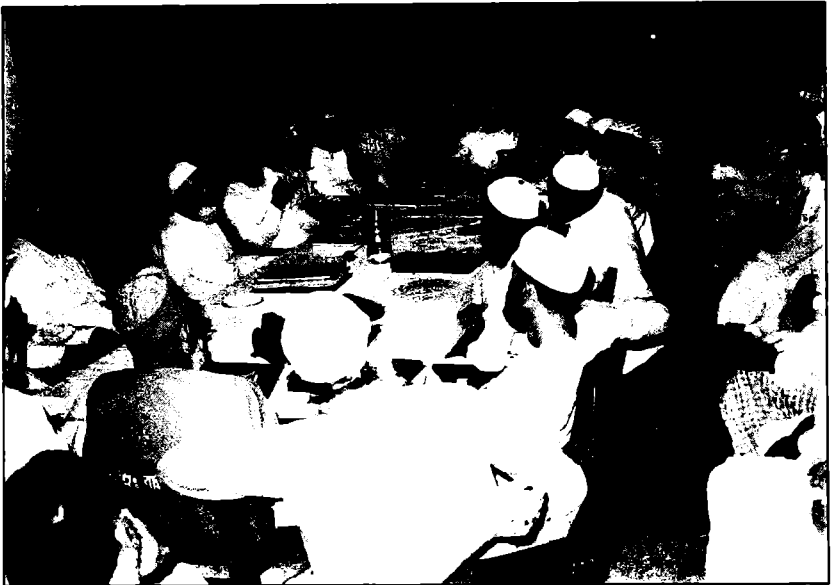
'৯১-এর সংসদ নির্বাচনের পর কর্ম পরিষদের প্রথম বৈঠকে আমীরে জামায়াতের পাশে উপবিষ্ঠ আব্বাস আলী খান

একটি বিশেষ সাক্ষাতকার অনুষ্ঠানে অধ্যাপক গোলাম আযম, আব্বাস আলী খান ও অন্যান্য

সাইয়েদ আবু আ'লা মওদূদী রিসার্চ একাডেমীতে ইসলামী সম্মেলন সংস্থার সফররত সহকারী মহাসচিব ফুয়াদ আব্দুল হামিদ আল খতীবের সংগে মরহুম আব্বাস আলী খান, জনাব বদরে আলম, মরহুম মাওলানা সাইয়েদ মুহাম্মদ আলী ও জনাব আবদুস শহীদ নাসিম (১৯৯১ সাল)
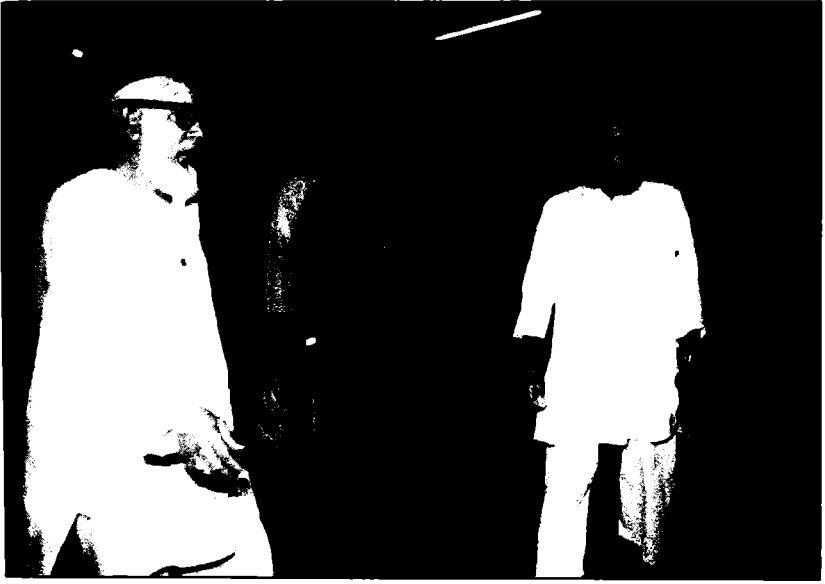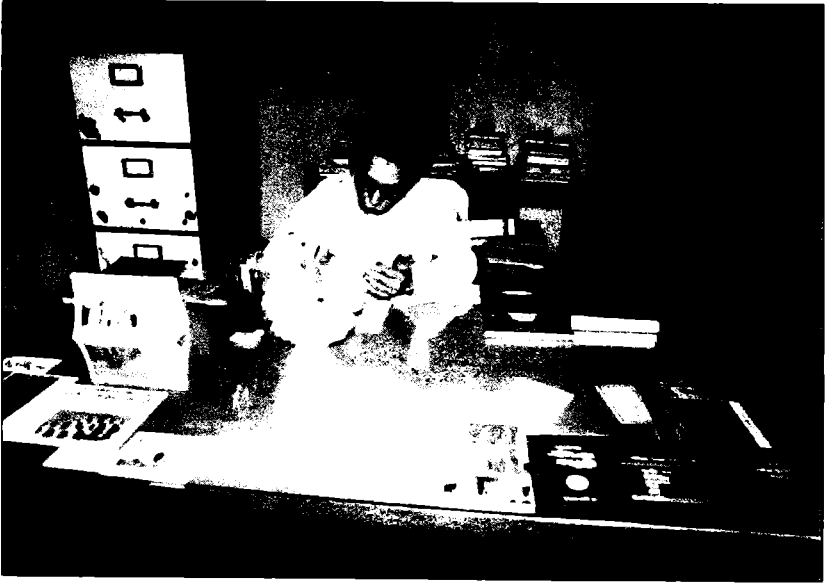
অধ্যয়নরত অবস্থায় আব্বাস আলী খান (১৯৯[illegible] সাল)

একাডেমীর বার্ষিক সাধারণ সভায় সভাপতিত্ব করছেন জনাব আব্বাস আলী খান (১৯৯১ সাল)

একটি আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি আব্বাস আলী খান

চিরনিদ্রায় আব্বাস আলী খান

পল্টন ময়দানে অনুষ্ঠিত জানাযার আর একটি দৃশ্য

[illegible] মরহুম [illegible]
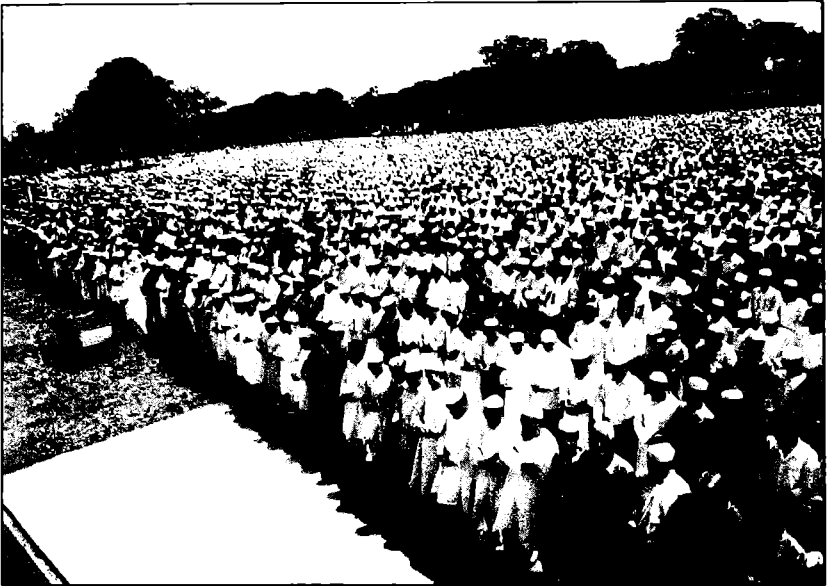
জয়পুর হাটের সিমেন্ট ফ্যাক্টরী ময়দানে মরহুম খান সাহেবের তৃতীয় জানাযা। ইমামতি করছেন জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের সেক্রেটারি জেনারেল মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী

[illegible]
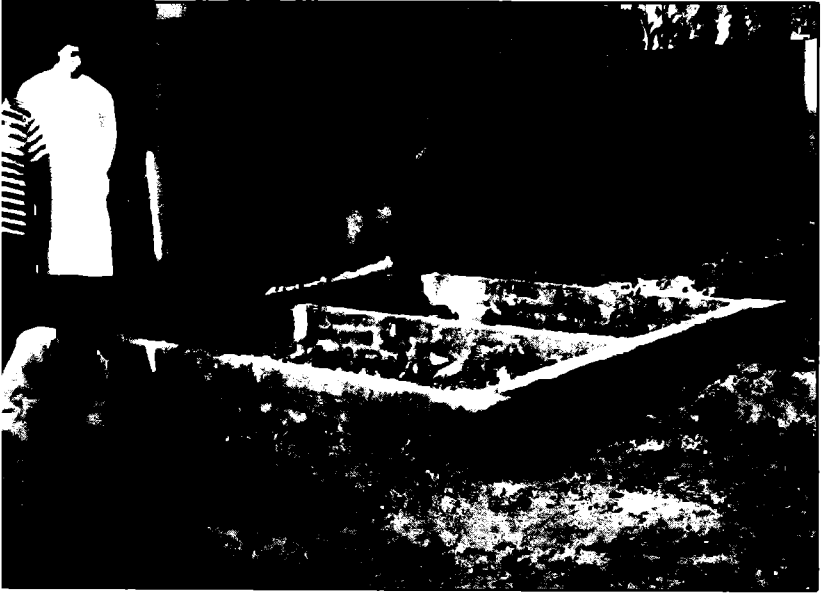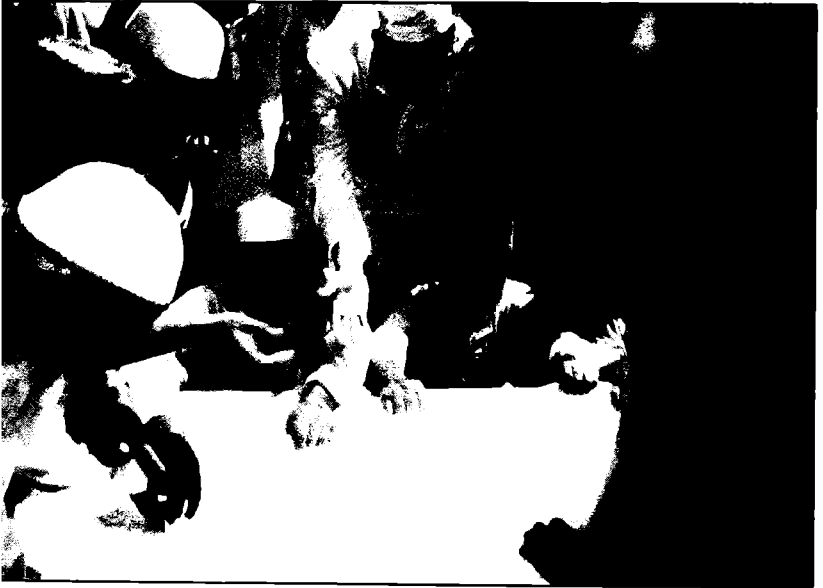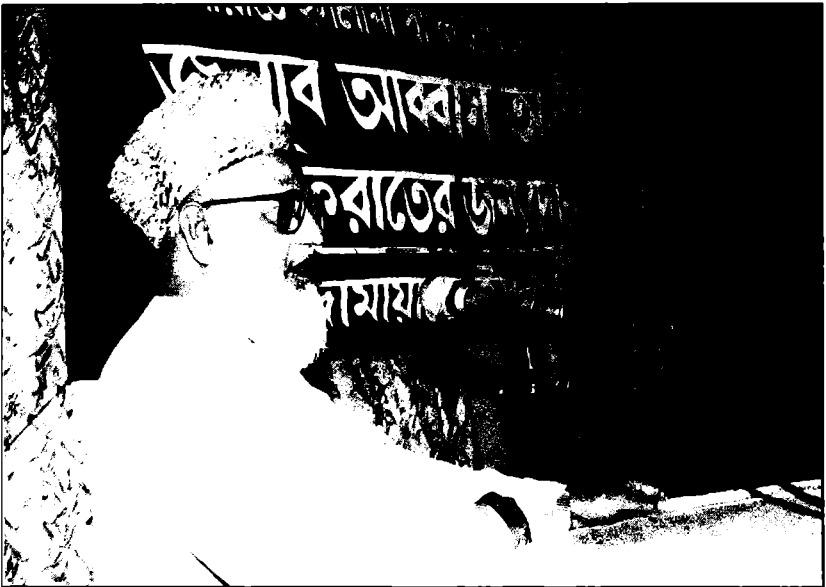
৮ অক্টোবর জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ-এর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত দোয়ার মাহফিলে বক্তব্য রাখছেন অধ্যাপক গোলাম আযম

১ অক্টোবর'৯৯ ঢাকা মহানগরী জামায়াতে ইসলামী আয়োজিত দোয়ার মাহফিলে বক্তব্য রাখছেন আমীরে জামায়াত অধ্যাপক গোলাম আযম

ইসলামী ছাত্র শিবির আয়োজিত দোয়ার মাহফিলে মোনাজাত করছেন মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী

১৯ অক্টোবর '৯৯ জাতীয় প্রেস ক্লাবে সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রিসার্চ একাডেমী আয়োজিত স্মরণ সভায় সভাপতির বক্তব্য রাখছেন একাডেমীর ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী

জয়পুর হাট হাইস্কুল, মরহুম খান সাহেব এই স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন

জয়পুর হাট হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষকগণের তালিকা। তালিকায় খান সাহেবের নাম ৫ নম্বরে। তালিকায় দেখা যায় তার পূর্বে সকল প্রধান শিক্ষকই ছিলেন হিন্দু।

জয়পুর হাটের বাড়ীতে খান সাহেবের খাওয়ার টেবিল
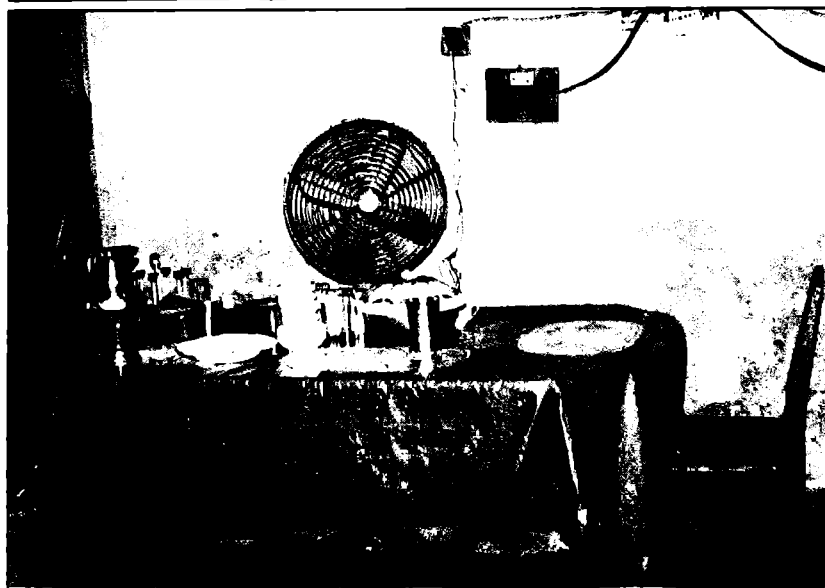
জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নেতৃবৃন্দের শোক বাণী

এ অধ্যায়ে আব্বাস আলী খানের মৃত্যুতে যাঁরা পত্র পত্রিকায় এবং আমীরে জামায়াতের নিকট শোক বার্তা পাঠিয়েছেন, তাঁদের নাম ছাপা হলো। শোক বার্তা প্রেরণকারী সংগঠন/সংস্থার নামও ছাপা হলো। তবে কোনো কোনো ব্যক্তি ও সংগঠনের নাম বাদ পড়ে গিয়ে থাকতে পারে। সেজন্যে আমরা দুঃখিত। এখানে কিছু কিছু পত্রিকার কাটিংও ছাপা হলো। - সম্পাদক।

জাতীয় নেতৃবৃন্দের যারা শোক বার্তা পাঠিয়েছেন

১.	অধ্যাপক গোলাম আযম	ঃ	আমীর, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ
২.	বেগম খালেদা জিয়া	ঃ	বিরোধী দলীয় নেত্রী, সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও চেয়ারপারসন, বি. এন. পি.
৩.	হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ	ঃ	সাবেক প্রেসিডেন্ট ও চেয়ারম্যান, জাতীয় পার্টি
৪.	আবদুর রহমান বিশ্বাস	ঃ	সাবেক প্রেসিডেন্ট
৫.	শায়খুল হাদীস আল্লামা আজীজুল হক	ঃ	চেয়ারম্যান, ইসলামী ঐক্যজোট
৬.	মিজানুর রহমান চৌধুরী	ঃ	চেয়ারম্যান, জাতীয় পার্টি (মিজান)
৭.	শামসুর রহমান	ঃ	নায়েবে আমীর, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ
৮.	এ. কিউ. এম. বদরুদ্দোজা চৌধুরী	ঃ	জাতীয় সংসদে বিরোধী দলীয় উপনেতা
৯.	মাওলনা মতিউর রহমান নিজামী	ঃ	সেক্রেটারী জেনারেল জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ
১০.	আবদুল মান্নান ভূঁইয়া	ঃ	মহাসচিব, বিএনপি
১১.	ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ	ঃ	সাবেক উপ রাষ্ট্রপতি
১২.	আনোয়ার হোসেন মঞ্জু	ঃ	যোগাযোগ মন্ত্রী ও মহাসচিব, জাতীয় পার্টি মিজান
১৩.	সালাহ্ উদ্দীন কাদের চৌধুরী	ঃ	এমপি, বিএনপি
১৪.	মাওলানা দেলাওয়ার হুসাইন সাঈদী	ঃ	লিডার, পার্লামেন্টারি গ্রুপ জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ
১৫.	সৈয়দ ফজলুল করীম	ঃ	আমীর, ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন
১৬.	মাওলানা মহিউদ্দীন খান	ঃ	ভাইস -চেয়ারম্যান, ইসলামী ঐক্যজোট
১৭.	আবদুল মতিন চৌধুরী	ঃ	সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, সদস্য, স্থায়ী কমিটি, বিএনপি
১৮.	লেঃ জেঃ মাহবুর রহমান	ঃ	সাবেক সেনাবাহিনী প্রধান
১৯.	শফিউল আলম প্রধান	ঃ	সভাপতি, জাগপা
২০.	জাহানারা আজহারী	ঃ	সেক্রেটারী, মহিলা বিভাগ জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ
২১.	মাওলানা শাহ্ আহমদুল্লাহ্ আশরাফ	ঃ	আমীরে শরীয়ত বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন
২২.	নূরুল হক মজুমদার	ঃ	চেয়ারম্যান, এনডিএ
২৩.	মুহাম্মদ ইউনুস	ঃ	সেক্রেটারী, শিল্প ও বাণিজ্য বিভাগ জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ
২৪.	সাদেক হোসেন খোকা	ঃ	আহ্বায়ক, বিএনপি, ঢাকা মহানগরী
২৫.	সুবিদ আলী ভূঁইয়া	ঃ	মেজর জেনারেল (অবঃ)

২৬. মিজানুর রহমান মিনু ঃ মেয়র, রাজশাহী মহানগরী
২৭. মনিরুল হক চৌধুরী ঃ প্রেসিডিয়াম সদস্য, জাতীয় পার্টি (মিজান)
২৮. মাওলানা এম.এ. মান্নান ঃ সভাপতি, বাংলাদেশ জমীয়াতুল মুদাধেছীন
২৯. এডভোকেট ফজলে রাব্বী ঃ যুগ্ম মহাসচিব, জাতীয় পার্টি (মিজান)
৩০. শামসুল ইসলাম ঃ সাবেক মন্ত্রী
৩১. আবদুল আলীম ঃ সাবেক মন্ত্রী
৩২. ব্যারিস্টার জমিরুদ্দীন সরকার ঃ সাবেক মন্ত্রী
৩৩. মির্জা আব্বাস ঃ সাবেক মেয়র, ঢাকা সিটি
৩৪. বেগম তাহমিনা ঃ মুসলিম নারী কল্যাণ সংস্থা
৩৫. সরকার ইমরুল চৌধুরী ঃ আহলে হাদীস জামায়াত
৩৬. বাবু গয়েশ্বর চন্দ্র রায় ঃ সাধারণ সম্পাদক জাতীয়তাবাদী যুবদল
৩৭. প্রিন্সিপাল ইসহাক আলী ঃ সভাপতি মুসলিম লীগ ইসহাক
৩৮. এ. এন. এম. ইউসুফ ঃ সভাপতি, মুসলিম লীগ (ইউসুফ)
৩৯. জমির আলী ঃ সভাপতি, মুসলিম (জমির)
৪০. এডভোকেট আবদুর রকীব ঃ সভাপতি, নেজামে ইসলামী পার্টি
৪১. শেখ আনোয়ারুল হক ঃ মহাসচিব , ন্যাপ (ভাসানী)
৪২. অধ্যাপক কে. এম. জাকারিয়া ঃ সভাপতি, ডেমোক্রেটিক লীগ (জাকারিয়া)
৪৩. স্বামী সভ্যসাচী মহারাজ ঃ সংখ্যালঘু লিডার্স কনভেশন
৪৪. শ্রী গোবিন্দ চন্দ্র প্রামাণিক ঃ ঐ
৪৫. শ্রী শংকর দেবনাথ ঃ কমান্ড ইন চীপ, জাতীয় কৃষ্ণসেনা বাংলাদেশ
৪৬. রতন কান্তি বড়াল ঃ ডেপুটি কমান্ড ইন চীপ ঐ
৪৭. মনোজ কুমার বিশ্বাস ঃ ঐ ঐ
৪৮. মিহির লাল বৈরাগী ঃ ঐ ঐ
৪৯. প্রদীপ সূতার ঃ ঐ ঐ
৫০. বাসুদেব প্রামাণিক ঃ ঐ ঐ
৫১. শ্রীমতি শান্তারাণী মল্লিক ঃ ঐ ঐ
৫২. মীর কাসেম আলী ঃ পরিচালক, রাবেতা আলমে ইসলামী বাংলাদেশ
৫৩. এডভোকেট নূরুল ইসলাম ঃ চেয়ারম্যান, জাতীয় জনতা পার্টি
৫৪. রেদোয়ান আহমদ ঃ সভাপতি, জাতীয়তাবাদী মুক্তিযোদ্ধা দল
৫৫. মেসবাহ উদ্দীন সাবু ঃ মহাসচিব, ঐ
৫৬. মাওলানা মহিউদ্দীন রব্বানী ঃ সভাপতি, বাংলাদেশ আইম্মাহ পরিষদ
৫৭. নাজিম উদ্দীন আলম ঃ প্রধান উপদেষ্টা, দেশনেত্রী গণপরিষদ
৫৮. এডভোকেট এখলাস হোসেন ঃ সভাপতি, বিএনপি রাজশাহী মহানগরী
৫৯. এডভোকেট নওয়াব আলী ঃ সভাপতি, ইসলামিক ল' ইয়ার্স কাউন্সিল

৬০. ব্যারিস্টার আব্দুর রাজ্জাক : মহাসচিব, ঐ
৬১. পীর মোসলেহ উদ্দীন আহমদ : মহাসচিব, ফারায়েজী জামায়াত
৬২. মেসবাহুর রহমান : সভাপতি, সম্মিলিত ইসলামী সংগ্রাম পরিষদ
৬৩. মাহবুব হোসাইন : সভাপতি, প্রজন্ম '৭৫
৬৪. অধ্যাপক ইউসুফ আলী : তামিরুল মিল্লাত ট্রাস্ট
৬৫. অধ্যক্ষ মুহাম্মদ আবদুর রব : ঐ
৬৬. এডভোকেট হাসিবুর রহমান ভূঁইয়া : সভাপতি, বাংলাদেশ মুসলিম দল
৬৭. ৩২ জন খ্যাতনামা আলেমের যুক্ত বিবৃতি

শোক প্রকাশ করেছেন আরো অনেকে। সকলের নাম উল্লেখ করতে না পারায় আমরা দুঃখিত। শোকে শরীক হবার জন্যে আমরা তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ।

বিদেশ থেকে শোকবার্তা পাঠিয়েছেন যাঁরা

১. মুয়াম্মার আল গাদ্দাফী : প্রেসিডেন্ট, জমহুরিয়া লিবিয়া
২. মুস্তফা মাশহুর : মুরশিদে আম, ইখওয়ানুল মুসলিমুন
৩. কাজী হুসাইন আহমদ : আমীর, জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তান
৪. প্রফেসর খুরশীদ আহমদ : চেয়ারম্যান, ইসলামিক ফাউন্ডেশন লেস্টার. ইউ. কে.
৫. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ আস সোবাইল : সম্মানিত প্রধান ইমাম, মসজিদুল হারাম মক্কা মোকাররমা
৬. মিয়া তোফায়েল মুহাম্মদ : সাবেক আমীর, জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তান
৭. করম এলাহী : মাসকাতে পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত
৮. সউদ আব্দুল আযীয আল মোখলেদ : চার্জ দ্যা এফেয়ার্স, কুয়েত এম্বেসী, ঢাকা
৯. মুহাম্মদ জাফর : সেক্রেটারী জেনারেল জামায়াতে ইসলামী ভারত
১০. সাইয়েদ মুনাওয়ার হাসান : সেক্রেটারী জেনারেল জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তান
১১. আমীর, জামায়াতে ইসলামী, শ্রীলংকা
১২. আবদুর রশীদ তোরাবী : আমীর, জামায়াতে ইসলামী, আযাদ কাশ্মীর
১৩. খালেদ ফারুক মওদূদী : মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী র.-এর পুত্র
১৪. শেখ দীন মুহাম্মদ : প্রেসিডেন্ট, রোহিংগা সলিডারিটি অরগ্যানাইজেশন, আরাকান, বার্মা
১৫. প্রফেসর আলিফ উদ্দীন তোরাবী : মহাপরিচালক, কাশ্মীর মুসলিম সংবাদ কেন্দ্র।
১৬. ডঃ মানাজির আহ্সান : ডাইরেক্টর জেনারেল, ইসলামিক ফাউন্ডেশন লেস্টার, ইউ. কে.
১৭. মোসলেহ্ উদ্দীন ফারাজী : সভাপতি, ইসলামিক ফোরাম, ইউরোপ

১৮. ড. এম. এ. বারী	ঃ	সহ-সভাপতি, ইসলামিক ফোরাম ইউরোপ
১৯. হাবিবুর রহমান	ঃ	সেক্রেটারী জেনারেল ঐ
২০. মোহাম্মদ সফিউল্লাহ	ঃ	সভাপতি, ইসলামিক ফোরাম, ফ্র্যান্স
২১. আব্দুর রহীম	ঃ	সভাপতি, ইসলামিক কালচারাল সেন্টার সংযুক্ত আরব আমীরাত
২২. জহিরুল হক	ঃ	সভাপতি, ইসলামিক ফোরাম ইতালী
২৩. ইঞ্জিনিয়ার রফিক শিকদার	ঃ	সভাপতি, বাংলাদেশ সমিতি সংযুক্ত আরব আমীরাত
২৪. মাওলানা মোঃ রশীদ চৌধুরী	ঃ	কুরআন সুন্নাহ পরিষদ কাতার
২৫. ওয়াহদাত খান	ঃ	সভাপতি, ইণ্ডিয়ান ইসলামিক এসোসিয়েশন
২৬. আবদুল গাফফার আযীয	ঃ	পরিচালক, পররাষ্ট্র বিষয়ক ডাইরেক্টরেট জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তান
২৭. রহমত উল্লাহ নাজির খান	ঃ	রিজিওনাল ডাইরেক্টর, আইআইআরও, বাংলাদেশ
২৮. হাফেজ মাওলানা শফীকুর রহমান	ঃ	আমীর, দাওয়াতুল ইসলাম ইউ. কে. এ্যান্ড আয়ার
২৯. মাওলানা এ. কে. এম. মওদূদ হাসান	ঃ	নায়েবে আমীর ঐ
৩০. আলী উসমান মনসুর	ঃ	চার্জ দ্য এফিয়ার্স, লিবিয়ান এম্বেসী, ঢাকা

এছাড়াও শোক বার্তা পাঠিয়েছেন আরো অনেকে। সবাইর নাম উল্লেখ করা সম্ভব হলোনা। শোক বার্তা পাঠাবার জন্যে আমরা তাঁদের সকলের কাছে কৃতজ্ঞ।

যেসব দল সংগঠন সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান শোকবার্তা পাঠিয়েছেন

১. বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল
২. জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ
৩. জাতীয় পার্টি
৪. জাতীয় পার্টি (মিজান)
৫. ইসলামী ঐক্যজোট
৬. বাংলাদেশ খেলাফত মজলিশ
৭. ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন
৮. জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টি (জাগপা)
৯. বাংলাদেশ মুসলিম লীগ (ইউসুফ)
১০. বাংলাদেশ মুসলিম লীগ (ইসহাক)
১১. বাংলাদেশ মুসলিম লীগ (জমির)
১২. বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন
১৩. ডেমোক্রেটিক লীগ
১৪. বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টি

১৫. ন্যাপ (ভাসানী)
১৬. বাংলাদেশ ইসলামিক পার্টি
১৭. বাংলাদেশ জমিয়তুল মোদার্রেসীন
১৮. আদর্শ শিক্ষক পরিষদ
১৯. বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী যুবদল
২০. মুক্তিযোদ্ধা দল
২১. বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির
২২. ফারায়েজী জামায়াত
২৩. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রিসার্চ একাডেমী ঢাকা
২৪. ইসলামিক ল. ইয়ার্স কাউন্সিল
২৫. রাবেতা আলমে ইসলামী
২৬. ইমাম পরিষদ
২৭. সংখ্যালঘু লীডার্স কনভেনশন
২৮. জাতীয় কৃষ্ণ সেনা বাংলাদেশ
২৯. বাংলাদেশ মুসলিম দল
৩০. তামিরুল মিল্লাত ট্রাস্ট
৩১. আইম্মাহ পরিষদ
৩২. প্রজন্ম '৭৫
৩৩. জাতীয় যুব ফোর্স
৩৪. মুসলিম লীগ (আশরাফ)
৩৫. বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন
৩৬. বাংলাদেশ চাষী কল্যাণ সমিতি
৩৭. বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক পার্টি
৩৮. প্রগতিশীল জাতীয়তাবাদী দল

এ ছাড়াও আরো অনেক দল, সংস্থা, সমিতি ও প্রতিষ্ঠান শোকবার্তা পাঠিয়েছে। শোকে শরীক হবার জন্যে আমরা তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ।

বিভিন্ন পত্রিকায় আব্বাস আলী খানের মৃত্যু সংবাদ, শোকবার্তা ইত্যাদি

মরহুম আব্বাস আলী খানের মত নির্লোভ ও গুণী মানুষ সমাজে খুঁজে পাওয়া দুষ্কর

—অধ্যাপক গোলাম আযম

স্টাফ রিপোর্টার : জামায়াতে ইসলামীর আমীর অধ্যাপক গোলাম আযম বলেছেন, বরেণ্য রাজনীতিবিদ মরহুম আব্বাস আলী খান স্বপ্ন দেখতেন বাংলাদেশ একটি আধুনিক, প্রগতিশীল ও কল্যাণধর্মী ইসলামী রাষ্ট্রে পরিণত হোক। এজন্য তিনি আমৃত্যু খালেছভাবে কাজ করে গেছেন। তাঁর মত অসাধারণ, বিরল ও বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ইসলামী চিন্তাবিদ, ত্যাগী, নির্লোভ অনুকরণীয় ব্যক্তিত্ব ও রাজনীতিকের মৃত্যুতে জাতীয় জীবনে যে শূন্যতা সৃষ্টি হয়েছে তা সহজে পূরণ হবার নয়। আল্লাহর উপর নির্ভরশীল, আস্থাবান, আল্লাহর খালেছ বান্দা হিসেবে মরহুম আব্বাস আলী খানের মত এমন নির্লোভ ও গুণী মানুষ আমাদের সমাজে খুঁজে পাওয়া দুষ্কর।

জামায়াতে ইসলামীর প্রাক্তন সিনিয়র নায়েবে আমীর মরহুম আব্বাস আলী খান স্মরণে গতকাল (শনিবার) ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত আলোচনা

সভা ও দোয়ার মাহফিলে প্রধান অতিথির বক্তব্যে অধ্যাপক আযম এ কথা বলেন। ঢাকা মহানগরী জামায়াত আয়োজিত এ সভায় বক্তব্য রাখেন দলের নায়েবে আমীর শামসুর রহমান, সেক্রেটারী জেনারেল মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী, বিএনপি'র স্থায়ী কমিটির সদস্য আব্দুল মতিন চৌধুরী, মুসলিম লীগের মহাসচিব আলহাজ্ব জমির আলী, এনডিএ সভাপতি নূরুল হক মজুমদার, জামায়াতের প্রচার সম্পাদক আবদুল কাদের মোল্লা, অধ্যাপক নজির আহমদ, এডভোকেট শেখ আনসার আলী, আব্দুস শহীদ নাসিম, মাওলানা এটিএম মাসুম, শিবির সভাপতি মতিউর রহমান আকন্দ, সাবেক শিবির সভাপতি রফিকুল ইসলাম খান প্রমুখ। জামায়াতের নায়েবে আমীর মাওলানা এ কে এম ইউসুফ মাহফিলে উপস্থিত ছিলেন। সভায় মরহুম আব্বাস আলী খানের রূহের মাগফিরাত কামনা করে মোনাজাত করা হয়। মহানগরী জামায়াতের আমীর এটিএম আজহারুল ইসলাম সভায় সভাপতিত্ব করেন।

আব্বাস আলী খান স্মরণে আলোচনা সভা

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের আমীর অধ্যাপক গোলাম আযম বলেন, মরহুম আব্বাস আলী খানের মত বহুমুখী প্রতিভা ও গুণের অধিকারী ইসলামী চিন্তাবিদ ত্যাগী-নির্লোভ অনুকরণীয় ব্যক্তিত্ব ও রাজনীতিকের মৃত্যুতে জাতীয় জীবনের যে শূন্যতা সৃষ্টি হইয়াছে তা সহজে পূরণ হইবার নয়। জামায়াত নেতা বলেন, আব্বাস আলী খান দীর্ঘ ৮৫ বছর বয়স পর্যন্ত ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য জীবনকে যেভাবে আল্লাহর রাহে নিবেদন করিয়াছিলেন এজন্য তিনি প্রেরণার উৎস হইয়া থাকিবেন। গতকাল শনিবার ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে ঢাকা মহানগরী জামায়াতের উদ্যোগে জামায়াতের সিনিয়র নায়েবে আমীর মরহুম আব্বাস আলী খানের স্মরণে আয়োজিত আলোচনা ও দোয়ার মাহফিলে তিনি প্রধান অতিথি ছিলেন। ঢাকা মহানগরী জামায়াতের আমীর জনাব এ টি এম আজহারুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই দোয়ার মাহফিলে আরো বক্তব্য রাখেন অন্যতম নায়েবে আমীর জনাব শামসুর রহমান, সেক্রেটারী জেনারেল মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী, আব্দুল কাদের মোল্লা, অধ্যাপক নাজির আহমদ, এ্যাডভোকেট শেখ আনছার আলী, মাওলানা আব্দুস শহীদ নাসিম, মাওলানা আবু তাহের মোঃ মাছুম, শিবিরের কেন্দ্রীয় সভাপতি মতিউর রহমান আকন্দ, রফিকুল ইসলাম খান, বিএনপি নেতা আব্দুল মতিন, মুসলিম লীগ নেতা জমির আলী, এনডিএ নেতা নূরুল হক মজুমদার প্রমুখ। —প্রেস বিজ্ঞপ্তি

Abbas Ali Khan will be buried at Joypurhat today

Jamaat-e-Islami Bangladesh Nateb-e-Amir Abbas Ali Khan (86) will be buried today (Tuesday) at his family graveyard at Joypurhat after Namaz-e-Janaza there, reports BSS.

The octogenarian politician died on Sunday at the Ibnesina Hospital in Dhaka. He was suffering from old-age ailments.

Earlier on Monday his first Namaz-e-Janaza was held at the Paltan Maidan led by Amir of Jamaat Prof. Golam Azam. It was attended by former President Hussein Muhammad Ershad, BNP leaders Messrs. Shamsul Islam, Abdul Matin Chowdhury, Islami Oikya Jote leaders, other political leaders, diplomats and a huge number of people. Later his coffin was taken to Joypurhat escorted by his party Secretary General Moulana Matiur Rahman Nizami and other leaders

আব্বাস আলী খানের ইন্তেকালে সারাদেশে শোকের ছায়া

ষ্টাফ রিপোর্টার ঃ প্রবীণ রাজনীতিবিদ ও জামায়াতে ইসলামীর সিনিয়র নায়েবে আমীর আব্বাস আলী খানের ইন্তেকালে সারাদেশে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। গতকাল রোববার তাঁর ইন্তেকালের খবর আসার পর সারাদেশে বিভিন্ন স্থানে দোয়ার, মাহফিল ও শোকসভা অনুষ্ঠিত হয়।

আব্বাস আলী খানের ইন্তেকালে বিএনপি চেয়ারপারসন ও সংসদে বিরোধী দলীয় নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া, জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ পৃথক পৃথক বিবৃতি দিয়েছেন। এছাড়াও বিভিন্ন সংগঠন ও ব্যক্তি শোক প্রকাশ করে বিবৃতি দিয়েছেন।

খালেদা জিয়া

বিএনপি চেয়ারপারসন ও সংসদের বিরোধী দলীয় নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া গতকাল এক শোক বার্তায় আব্বাস আলী

(১ম পাতার ২-এর কঃ পর)

মরহুমের অবদানের কথা স্মরণ করেন। তিনি মরহুমের শোক-সন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতিও গভীর সমবেদনা জানান।

পৃথক পৃথক শোক বার্তায় জাতীয় সংসদের বিরোধী দলীয় উপনেতা অধ্যাপক এ কিউ এম বদরুদ্দোজা চৌধুরী, বিএনপি মহাসচিব আব্দুল মান্নান ভূঁইয়া, যুগ্ম মহাসচিব মির্জা আব্বাস, ঢাকা মহানগরী বিএনপির আহ্বায়ক সাদেক হোসেন খোকা এমপি, আব্দুল আলীম এমপি আব্বাস আলী খানের ইন্তেকালে গভীর শোক ও সমবেদনা প্রকাশ করে মরহুমের আত্মার মাগফিরাত কামনা করেন।

এরশাদ

জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান সাবেক প্রেসিডেন্ট হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ গতকাল এক বিবৃতিতে আব্বাস আলী খানের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ এবং মরহুমের পরিবারবর্গের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেন। বিবৃতিতে তিনি মরহুমের আত্মার মাগফিরাত কামনা করেন। বিবৃতিতে তিনি বলেন, আব্বাস আলী খান একজন আদর্শবাদী রাজনীতিক ছিলেন। তিনি ন্যায় নিষ্ঠ জীবন যাপন করে গেছেন। তাঁর মতো আদর্শনিষ্ঠ রাজনীতিবিদের মৃত্যুতে দেশের ও সমাজের অপূরণীয় ক্ষতি সাধিত হলো।

জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ গতকাল রোববার সন্ধ্যায় জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে গমন করে মরহুম আব্বাস আলী খানের মরদেহের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন এবং তাঁর আত্মার মাগফিরাত কামনা করে দোয়া করেন। তিনি জামায়াত কার্যালয়ে উপস্থিত জামায়াতে ইসলামীর শোকাহত নেতা-কর্মীদের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

মাওলানা সাঈদী

আব্বাস আলী খানের ইন্তেকালে জামায়াতের সংসদীয় গ্রুপের নেতা মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী গতকাল এক বার্তায় গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন।

প্রদত্ত শোক বাণীতে মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী বলেন, প্রবীণ জননেতা আব্বাস আলী খানের ইন্তেকালে করেছেন আল্লাহ যেন তা কবুল করেন সেই দোয়াই করি এবং আল্লাহপাক যেন তাঁকে জান্নাতুল ফেরদৌস এর মেহমান বানিয়ে নেন।

মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী বলেন, আব্বাস আলী খানের ইন্তেকালে এ দেশের ইসলামী আন্দোলনের যে ক্ষতি হলো তা সহজে পূরণ হবার নয়। তাঁর মৃত্যুতে জাতি একজন প্রবীণ রাজনীতিবিদ ও মহান নেতাকে হারালো। আমি তাঁর রূহের মাগফিরাত কামনা করি এবং তাঁর শোক-সন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাই। আল্লাহপাক যেন সকলকে এই শোক কাটিয়ে উঠার তওফীক দেন এবং পরকালীন জিন্দেগীতে তাঁকে উত্তম জাযা দান করেন। আমীন।

আব্দুর রহমান বিশ্বাস

সাবেক প্রেসিডেন্ট আব্দুর রহমান বিশ্বাস গতকাল এক শোক বার্তায় আব্বাস আলী খানের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। শোক বার্তায় তিনি বলেন, আব্বাস আলী খান তার দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করে গেছেন।

জাপা (মিজান)

জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান চৌধুরী, মহাসচিব আনোয়ার হোসেন মঞ্জু এক শোকবার্তায় জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের নেতা আব্বাস আলী খানের মৃত্যুতে গভীর শোক জানিয়েছেন।

নেতৃদ্বয় তার আত্মার মাগফিরাত কামনা করেন এবং শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়েছেন।

শায়খুল হাদীস

আব্বাস আলী খানের ইন্তেকালে বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের আমীর ও ইসলামী ঐক্যজোটের চেয়ারম্যান শায়খুল হাদীস আল্লামা আজীজুল হক এক বিবৃতি প্রদান করেছেন।

বিবৃতিতে তিনি বলেন, জনাব খানের মৃত্যুতে জাতি একজন প্রবীণ রাজনীতিককে হারালো। দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে তিনি দেশ ও জাতির জন্য যে সেবা করেছেন তার বিনিময় নিশ্চয়ই তিনি আল্লাহতায়ালার নিকট পাবেন।

শায়খুল হাদীস তার রূহের মাগফিরাত কামনা করেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানান। তিনি মরহুমের সন্তান আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুদের ধৈর্য ধারণ করতে সাহায্য করার জন্য আল্লাহতায়ালার নিকট প্রার্থনা করেন।

ইসলামী ফোরাম ইউরোপ

ইসলামী ফোরাম ইউরোপের সভাপতি মাওলানা মুসলেহ উদ্দিন রাজাজী এবং সেক্রেটারী জেনারেল হাবিবুর রহমান লন্ডন থেকে প্রেরিত এক যুক্ত বিবৃতিতে জামায়াতে ইসলামীর সিনিয়র নায়েবে আমীর জনাব আব্বাস আলী খানের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। তারা মরহুমের রূহের মাগফিরাত কামনা করেন এবং তার শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

ইসলাম ও সেক্রেটারী মাওলানা আবু তাহের মোঃ মাছুম এক শোক বাণী প্রদান করেছেন।

শোক বাণীতে নেতৃদ্বয় বলেন, আব্বাস আলী খানের ইন্তেকালে আমরা গভীরভাবে শোকাহত। তাঁর মৃত্যুতে জাতি একজন প্রজ্ঞা ও মেধাসম্পন্ন রাজনীতিবিদ ও ইসলামী আন্দোলনের নেতাকে হারালো যা সহজেই পূরণ হবার নয়। মরহুম আমৃত্যু এদেশে ইকামতে দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য এবং গণতন্ত্র ও জনগণের অধিকার আদায়ে যেভাবে বিরামহীন কোরবানী ও ত্যাগের মানসিকতা নিয়ে মেধা ও শ্রম দিয়ে নিজের জীবনকে উৎসর্গ করেছিলেন তার যাবতীয় নেক আমল ও দ্বীনী খেদমতকে কবুল করে আল্লাহ যেন তাঁকে জান্নাতে সুউচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত করেন।

নেতৃদ্বয় বলেন, আব্বাস আলী খানের ইন্তেকালে তাঁর পরিবারের যে অপূরণীয় ক্ষতি ও শূন্যতা সৃষ্টি হয়েছে তা কাটিয়ে উঠতে আল্লাহ যেন পরিবারের সকল সদস্যদের ধৈর্য ও মনোবল দান করেন।

জামায়াত মহিলা বিভাগ

আব্বাস আলী খানের ইন্তেকালে সংগঠনের মহিলা বিভাগের সেক্রেটারী জাহানারা আজহারী এক শোকবাণী প্রদান করেছেন।

তিনি আব্বাস আলী খানের ইন্তেকালে গভীর শোক প্রকাশ করে ইসলামী আন্দোলনে মরহুমের অসাধারণ অবদানের কথা গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন। তিনি মরহুমের রূহের মাগফিরাত কামনা করেন এবং মরহুমের শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান। তিনি মহান আল্লাহর দরবারে মুনাজাত করেন যে, আল্লাহ যেন মরহুমের নেক আমলসমূহ কবুল করে জান্নাতুল ফেরদৌস নসিব করেন।

মতিন চৌধুরী

বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুল মতিন চৌধুরী এক শোক বার্তায় আব্বাস আলী খানের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেন। শোক বার্তায় তিনি বলেন, আব্বাস আলী খান এই দেশে ইসলামী আন্দোলনের একজন প্রথম সারির নেতা ছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে দেশ একজন ইসলামী জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী সৈনিককে হারালো।

জাগপা

জাগপা সভাপতি শফিউল আলম প্রধান ও সাধারণ সম্পাদক আনিসুর রহমান শোক বার্তায় বলেছেন, আব্বাস আলী খানের মৃত্যুতে বাংলাদেশই শুধু নয় সমগ্র মুসলিম উম্মাহ একজন মহান নেতা ও মনীষাকে হারালো। দেশের এই নিদানকালে সমগ্র জাতি যখন এক ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছে তখন এমন একজন প্রজ্ঞাবান, অভিজ্ঞ ও সৎ রাজনীতিকের অভাব পূরণ হবার নয়।

মুসলিম লীগ

মুসলিম লীগের সভাপতি এমডিএর চেয়ারম্যান এডভোকেট নূরুল হক মজুমদার ও মহাসচিব অধ্যাপক আঃ মোত্তালিব আযাদ এক শোক বাণীতে দেশের অন্যতম রাজনীতিবিদ আব্বাস আলী

বাংলার বাণী

ঢাকা : মঙ্গলবার ২০ আশ্বিন ১৪০৬ Tuesday 5 Octob... '99

আব্বাস আলী খানের জানাজা অনুষ্ঠিত

স্টাফ রিপোর্টার : জামায়াতে ইসলামীর সিনিয়র নায়েবে আমীর মরহুম আব্বাস ... জানাজা ...

আব্বাস আলী খানের নামাজে জানাজা অনুষ্ঠিত

ইত্তেফাক রিপোর্ট : গতকাল (সোমবার) বাদ জোহর পল্টন ময়দানে জামায়াত নেতা মরহুম আব্বাস আলী খানের নামাজে জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। ইমামতি করেন জামায়াতের আমীর অধ্যাপক গোলাম আযম। নামাজে জানাজায় সাবেক প্রেসিডেন্ট এরশাদ, বিএনপি নেতা ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ, আব্দুল মান্নান ভূঁইয়া, আব্দুল মতিন চৌধুরী, শামসুল ইসলাম, সালাহউদ্দীন কাদের চৌধুরী, ব্যারিস্টার জমিরউদ্দীন সরকার, লেঃ জেনারেল (অবঃ) মাহবুবুর রহমান, মেঃ জেনারেল (অবঃ) সুবিদ আলী ভূঁইয়া, জাতীয় পার্টির অতিরিক্ত মহাসচিব মনিরুল হক চৌধুরী, প্রেসিডিয়াম সদস্য এ্যাডভোকেট ফজলে রাব্বী, যুগ্ম-মহাসচিব সাদেক সিদ্দিকী প্রমুখ অংশ নেন। ইহাছাড়া সৌদী আরব, ফিলিস্তিন ও লিবিয়ার রাষ্ট্রদূত, পাকিস্তান ও ইরানের কূটনৈতিক প্রতিনিধি, বিভিন্ন দলের রাজনীতিবিদ ও বিভিন্ন পেশার লোকজন নামাজে জানাজায় যোগ দেন।

আজ পারিবারিক গোরস্থানে দাফন

বিশিষ্ট জামায়াত নেতা আব্বাস আলী খানের জানাযা সম্পন্ন

স্টাফ রিপোর্টার : ইসলামী আন্দোলনের অন্যতম সিপাহসালার ইসলামী রাজনীতিবিদ, বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ ও সুসাহিত্যিক জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ-এর সিনিয়র নায়েবে আমীর মরহুম আব্বাস আলী খানের নামাজে জানাযা গতকাল বেলা ২টা ১০ মিনিটে ঐতিহাসিক পল্টন ময়দানে অনুষ্ঠিত হয়। মরহুম আব্বাস আলী খানের অন্তিম ইচ্ছানুযায়ী জামায়াতে ইসলামীর আমীর অধ্যাপক গোলাম আযম মরহুমের নামাজে জানাযার ইমামতি করেন।

গতকাল রাত ৯টায় জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারী জেনারেল মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীর নেতৃত্বে একটি টীম মরহুম আব্বাস আলী খানের লাশ তাঁর গ্রামের বাড়ী জয়পুরহাটের উদ্দেশে রওয়ানা করে। পথে গভীর রাতে বগুড়া বনানী মাঠে মরহুমের দ্বিতীয় জানাযা অনুষ্ঠিত হবার কথা। আজ

দৈনিক মানবজমিন

মঙ্গলবার ● ৫ অক্টোবর ১৯৯৯

আব্বাস আলী খানের ইন্তেকালে ১৯ অক্টোবর স্মরণসভা

স্টাফ রিপোর্টার : সাইয়্যেদ আবুল আ'লা মওদূদী রিসার্চ একাডেমীর সাবেক চেয়ারম্যান, প্রখ্যাত চিন্তাবিদ, সাহিত্যিক ও রাজনীতিবিদ আব্বাস আলী খানের ইন্তেকালে একাডেমীর উদ্যোগে আগামী ১৯শে অক্টোবর মঙ্গলবার স্মরণসভার আয়োজন করা হয়েছে।

বেলা সাড়ে ৩টায় জাতীয় প্রেসক্লাব মিলনায়তনে আহূত এই সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য প্রদান করবেন জাতীয় অধ্যাপক ও দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর সৈয়দ আলী আহসান। সভাপতিত্ব করবেন রিসার্চ একাডেমীর ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী। বক্তব্য রাখবেন মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী এমপি, আলী আহসান মুহাম্মদ মুজাহিদ, আবুল আসাদ, প্রফেসর চৌধুরী মাহমুদ হাসান, এ, টি, এম, আজহারুল ইসলাম এবং মতিউর রহমান আকন্দ।

আজ আব্বাস আলী খানের স্মরণসভা

আজ মংগলবার বিকেল সাড়ে ৩টায় জাতীয় প্রেসক্লাব মিলনায়তনে সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী রিসার্চ একাডেমীর সাবেক চেয়ারম্যান, প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ, সাহিত্যিক ও রাজনীতিবিদ মরহুম আব্বাস আলী খানের ইন্তেকালে এক স্মরণসভার আয়োজন করা হয়েছে। সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রিসার্চ একাডেমীর উদ্যোগে অনুষ্ঠেয় এই সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য প্রদান করবেন জাতীয় অধ্যাপক ও দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর সৈয়দ আলী আহসান। সভাপতিত্ব করবেন একাডেমীর ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী। বক্তব্য রাখবেন মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী এমপি, আলী আহসান মুহাম্মদ মুজাহিদ, আবুল আসাদ, প্রফেসর চৌধুরী মাহমুদ হাসান, এ.টি.এম. আজহারুল ইসলাম এবং মতিউর রহমান আকন্দ প্রমুখ। প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

ইসলামিক ফোরাম ইউরোপ

আব্বাস আলী খানের ইন্তেকালের খবরে লন্ডন ম্যানচেষ্টারসহ সমগ্র বৃটেন ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশী কমিউনিটি ও ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের মাঝে শোকের ছায়া নেমে আসে। মুহূর্তের মধ্যেই তাঁর ইন্তেকালের খবর লন্ডনসহ ইউরোপের বিভিন্ন শহরে ছড়িয়ে পড়ে মরহুমের রূহের মাগফেরাত কামনা করে এষ্ট লন্ডন মসজিদ, নর্থ লন্ডন ইসলামিক সেন্টার মসজিদসহ বৃটেনের

ঢাকা রবিবার ২৫ আশ্বিন ১৪০৬, ১০ অক্টোবর ১৯৯৯

অধ্যাপক গোলাম আযম বলেন, মরহুম আব্বাস আলী খান দীর্ঘ ৮৫ বছর বয়স পর্যন্ত এ দেশে ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য জীবনকে যেভাবে আল্লাহর রাহে নিবেদন করতে পেরেছিলেন, এ জন্য তিনি প্রেরণার উৎস হয়ে থাকবেন। তিনি মরহুম আব্বাস আলী খানের মত জিহাদী জজবা, ত্যাগ ও কুরবানীর মানসিকতা নিয়ে এ দেশে ইক্বামতে দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে বিজয়ী করে মরহুম নেতার অসমাপ্ত কাজকে বিজয়ী করতে নেতা-কর্মীদের প্রতি আহবান জানান।

জনাব আব্দুল মতিন চৌধুরী বলেন, মরহুম আব্বাস আলী খান ছিলেন একজন অনন্যসাধারণ রাজনীতিবিদ। গণতান্ত্রিক আন্দোলন ও ইসলামী আন্দোলনে তাঁর অবদান অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে। স্বৈরাচারী শাসনের অবসান ঘটিয়ে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য আমরা যখন ঐক্যবদ্ধ হয়েছিলাম, তখন আব্বাস আলী খান জামায়াতের পক্ষ থেকে দু'টি প্রস্তাব দিয়েছিলেন যে, প্রেসিডেন্ট শাসিত সরকার পদ্ধতির পরিবর্তে সংসদীয় পদ্ধতি প্রবর্তন এবং সকল নির্বাচন কেয়ারটেকার সরকারের অধীনে করতে হবে। তার নাম এ দেশের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। আজ তার মত নেতার বড় প্রয়োজন।

মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী বলেন, দ্বীন কায়েমের আন্দোলনে কর্মীদের জন্য আব্বাস আলী খানের সমগ্র জীবন অনুকরণীয় ও অনুসরণীয়। শারীরিক অসুস্থতাকে উপেক্ষা করে তিনি ইসলামী আন্দোলনের জন্য কাজ করে গেছেন।

জনাব জমির আলী বলেন, ইসলাম ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলন এবং স্বাধীনতার পক্ষে ভূমিকা পালনে মরহুম আব্বাস আলী খান অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। জাতির দুর্দিনে আজ জামায়াতে ইসলামীকে মরহুম আব্বাস আলী খানের মত ভূমিকা রাখতে হবে।

পিএনপি

প্রগতিশীল জাতীয়তাবাদী দলের চেয়ারম্যান খায়রুন নাহার খানম ও মহাসচিব এ টি এম গোলাম মাওলা চৌধুরী গতকাল দেয়া শোক বিবৃতিতে বলেন, আব্বাস আলী খানের মত একজন বিজ্ঞ রাজনীতিক, স্পষ্ট ভাষী, ইসলামী আন্দোলনের জন্য উৎসর্গিত ব্যক্তির এই আকস্মিক ইন্তেকালে ইসলামী আইন ও সমাজ প্রতিষ্ঠার আন্দোলন তথা স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব রক্ষার সংগ্রামে যে অপূরণীয় ক্ষতি হলো তা সহজে পূরণ হবার নয়।

দৈনিক সংগ্রাম

THE DAILY SANGRAM

ঢাকা : মঙ্গলবার ২০শে আশ্বিন ১৪০৬ :: ৫ই অক্টোবর ১৯৯৯

আব্বাস আলী খানের ইন্তেকাল

আমরা শোকাভিভূত

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ-এর সিনিয়র নায়েবে আমীর, ইসলামী আন্দোলনের অন্যতম সিপাহসালার, প্রবীণ রাজনীতিবিদ, গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা, বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ, সুলেখক ও সাহিত্যিক, জনমানুষের প্রিয় নেতা আব্বাস আলী খান গত রোববার দুপুর সোয়া একটায় রাজধানীর ইবনে সিনা হাসপাতালে ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। তিনি লাখ লাখ ভক্ত-অনুরক্ত, ইসলামী আন্দোলনের কর্মী, শুভানুধ্যায়ী ও দেশবাসীকে শোকসাগরে ভাসিয়ে গেছেন। জনাব খান বেশকিছু দিন যাবত বার্ধক্যজনিত নানা জটিলতায় ভুগছিলেন। সবশেষে তার লিভার সিরোসিস রোগ ধরা পড়ে। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিলো ৮৫ বছর।

বয়সের দিক থেকে জনাব আব্বাস আলী খান, বলতে হয়, পরিণত বয়সেই ইন্তেকাল করেছেন। তবুও তার মৃত্যু অত্যন্ত শোকের ও বেদনার। কারণ, ইসলামী আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা হিসেবে জনাব খান যেমন এক বর্ণাঢ্য জীবন ও অনুকরণীয় দৃষ্টান্তের অধিকারী ছিলেন, তেমনি ছিলেন প্রবীণ রাজনৈতিক ও আধ্যাত্মিক নেতা। বাংলাদেশকে আধুনিক ইসলামী রাষ্ট্রে পরিণত করাই ছিলো জনাব খানের স্বপ্ন। তিনি একাধারে লেখক, চিন্তাবিদ ও রাজনীতিক হিসেবে জাতির বিরাট খেদমত করে গেছেন; ইসলামী আন্দোলনসহ জাতীয় বিভিন্ন সংকটকালে পালন করে গেছেন এক ঐতিহাসিক ভূমিকা যা ইতিহাসে লেখা থাকবে স্বর্ণাক্ষরে। তার জীবন ও কর্ম তাকে অমর করে রাখবে লাখো ভক্ত-অনুরক্ত ও নেতা-কর্মীর হৃদয়ে, নানাভাবে তিনি হবেন আলোচিত এবং হয়ে থাকবেন স্মরণীয়। শিক্ষা, অনুশীলন, পাণ্ডিত্য, আদর্শবাদিতা, নীতিনিষ্ঠা, অধ্যবসায়, প্রজ্ঞা এবং খোদাভীরুতায় তিনি ছিলেন একজন সুন্দর মানুষ, অনুকরণীয় ব্যক্তিত্ব।

আমরা মরহুম আব্বাস আলী খানের রূহের মাগফিরাত কামনা করি এবং মরহুমের শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি জানাই গভীর সমবেদনা। মহান আল্লাহ জনাব খানের পরিবারসহ তার ভক্ত-অনুরক্তদের শোক সহ্য করার তাওফিক দিন এবং তার শূন্যস্থান পূরণে ইসলামী আন্দোলনকে সাহায্য করুন। আর মরহুম আব্বাস আলী খানের জন্য নসীব করুন জান্নাতুল ফেরদৌস- আমীন।

গতকাল রাতে আবুধাবী থেকে ড. শামসুদ্দীন দৈনিক সংগ্রামে টেলিফোনে এক শোক বার্তা পাঠান। তিনি মরহুমের রূহের মাগফেরাত কামনা করেন ও শোকবিধুর উম্মাহর প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

Abbas Ali Khan dead

by Staff Reporter

Abbas Ali Khan, Senior Nayeb-e-Ameer of the Jamaat-e-Islami, died at a city hospital yesterday. He was 85.

Abbas Ali Khan was suffering from liver cirrhosis. He was admitted to the Ibne Sina Hospital on September 29 and breathed his last at 1 : 15 pm yesterday.

The Namaj-e-Janaza (funeral prayer) of Abbas Ali Khan will be held at the Paltan Maidan in the city at 2 pm today. Then the body will be taken to Joypurhat and buried at the family graveyard there.

Born in Joypurhat town in the then Bogra district in 1914, Khan obtained his BA degree from the Calcutta University with distinction in 1935. He was elected Member of the National Assembly of Pakistan in 1962. He was also provincial Education Minister of the erstwhile East Pakistan.

Abbas Ali Khan was the acting Ameer of the party from 1979 to 1992. Again, he served as the acting chief of the Jamaat for 16 months when Jamaat Ameer Prof Ghulam Azam was arrested. Abbas Ali Khan contributed much as an opposition leader during the anti-autocratic movement from 1983 to 1990.

A writer and translator of nine books, including one on the history of the Muslims in Bangladesh, Khan left behind his only daughter and four grand children and a host of relatives and admirers to mourn his death.

Death condoled

BNP Chairperson and Leader of the Opposition in Parliament Begum Khaleda Zia expressed her profound shock at the death of Abbas Ali Khan.

In a condolence message yesterday, she recalled the contribution of Khan in the movement to establish democracy in the country. Begum Zia prayed for the departed soul and conveyed sympathy for members of the bereaved family.

Abbas Ali Khan passes away

Moulana Abbas Ali Khan, senior Nayeb-e-Ameer of Jamaat-e-Islami, died of liver cirrhosis in Dhaka on Sunday at the age of 86, reports UNB.

He was suffering from liver ailments and admitted to Ibne Sina Hospital in the city in pre-coma state on September 29. He

Contd on page 12 col 1

Khaleda shocked

BNP-Chairperson and Leader of the Opposition in Parliament Begum Khaleda Zia on Sunday expressed her deep shock at the death of Jamaat leader Abbas Ali Khan, reports BSS.

In a statement, Begum Zia recalled the contribution of Abbas Ali Khan to the establishment of democracy in the country. She expressed her deep sym-

Contd on page 12 col 1

Abbas Ali Khan

Contd from page 1

breathed his last at 1:15 PM on Sunday.

Born in Joypurhat town, the Moulana was provincial Education Minister of then East Pakistan and Member of the National Assembly of Pakistan in 1962.

He had played an important role for his party as its acting Ameer for a long time when Jamaat Chief Prof Ghulam Azam had been in Pakistan after liberation of Bangladesh.

Moulana Abbas Ali Khan, who wrote several books, including one on the History of Bangladesh, is survived by his only daughter, relations and wellwishers.

Khaleda shocked

Contd from page 1

pathy to the members of the bereaved family and prayed for eternal peace of the departed soul.

Abbas Ali Khan dead

Staff Correspondent

Abbas Ali Khan, Senior Naeb-e-Ameer of Jamaat-e-Islami, Bangladesh died at Ibne Sinha Clinic at 1.15 p.m. on Sunday. He was 85. He was suffering from liver cirrhosis.

Abbas Ali Khan is survived by his only daughter, four grand children and a host of relatives, admirers and well-wishers to mourn his death.

His Namaj e Janaza will be held today (Monday) at Paltan Maidan at 2 p.m. The body of Khan will be taken to his village home at Jaipurhat where he will be buried at the family graveyard after another Namaj-e-Janaza there.

Born in a respectable Muslim family in Jaipurhat in 1914, Khan passed matric examination from Hoogly New Schem Madrasha in 1930. He took Bachelor of Arts (B.A.) degree with distinction

(See Page 16 Col. 8)

Golam Azam to lead janaza of Abbas Ali

Staff Correspondent

Ameer of Jamaat-e-Islami, Bangladesh Professor Golam Azam left the holy Mecca for Dhaka on hearing the death news of the party Senior Naeb-e-Ameer Abbas Ali Khan.

Prof Golam Azam is expected to arrive in Dhaka today (Monday) at 10 a.m. The Jamaat Ameer prof Azam will lead the namaj-e-janaza prayer of Abbas Ali Khan at Paltan Maidan at 2 p.m. as last desire of the Senior Naeb-e-Ameer of the party.

Jatiya Party Chairman Hussain Mohammad Ershad in a statement on Sunday, deeply condoled the death of Jamaat Senior Naeb-e-Ameer Abbas Ali Khan.

Hussain Mohammad Ershad expressed his sympathy to the members of the bereaved family and prayed for the salvation of the departed soul.

Abbas Ali Khan dead

by Staff Reporter

Abbas Ali Khan, Senior Nayeb-e-Ameer of the Jamaat-e-Islami, died at a city hospital yesterday. He was 85.

Abbas Ali Khan was suffering from liver cirrhosis. He was admitted to the Ibne Sina Hospital on September 29 and breathed his last at 1 : 15 pm yesterday.

The Namaj-e-Janaza (funeral prayer) of Abbas Ali Khan will be held at the Paltan Maidan in the city at 2 pm today. Then the body will be taken to Joypurhat and buried at the family graveyard there.

Born in Joypurhat town in the then Bogra district in 1914, Khan obtained his BA degree from the Calcutta University with distinction in 1935. He was elected Member of the National Assembly of Pakistan in 1962. He was also provincial Education Minister of the erstwhile East Pakistan.

Abbas Ali Khan was the acting Ameer of the party from 1979 to 1992. Again, he served as the acting chief of the Jamaat for 16 months when Jamaat Ameer Prof Ghulam Azam was arrested. Abbas Ali Khan contributed much as an opposition leader during the anti-autocratic movement from 1983 to 1990.

A writer and translator of nine books, including one on the history of the Muslims in Bangladesh, Khan left behind his only daughter and four grand children and a host of relatives and admirers to mourn his death.

Death condoled

BNP Chairperson and Leader of the Opposition in Parliament Begum Khaleda Zia expressed her profound shock at the death of Abbas Ali Khan.

In a condolence message yesterday, she recalled the contribution of Khan in the movement to establish democracy in the country. Begum Zia prayed for the departed soul and conveyed sympathy for members of the bereaved family.

Abbas Ali Khan passes away

Moulana Abbas Ali Khan, senior Nayeb-e-Ameer of Jamaat-e-Islami, died of liver cirrhosis in Dhaka on Sunday at the age of 86, reports UNB.

He was suffering from liver ailments and admitted to Ibne Sina Hospital in the city in pre-coma state on September 29. He

Contd on page 12 col 1

Khaleda shocked

BNP-Chairperson and Leader of the Opposition in Parliament Begum Khaleda Zia on Sunday expressed her deep shock at the death of Jamaat leader Abbas Ali Khan, reports BSS.

In a statement, Begum Zia recalled the contribution of Abbas Ali Khan to the establishment of democracy in the country. She expressed her deep sym-

Contd on page 12 col 1

Abbas Ali Khan

Contd from page 1

breathed his last at 1:15 PM on Sunday.

Born in Joypurhat town, the Moulana was provincial Education Minister of then East Pakistan and Member of the National Assembly of Pakistan in 1962.

He had played an important role for his party as its acting Ameer for a long time when Jamaat Chief Prof Ghulam Azam had been in Pakistan after liberation of Bangladesh.

Moulana Abbas Ali Khan, who wrote several books, including one on the History of Bangladesn, is survived by his only daughter, relations and wellwishers.

Khaleda shocked

Contd from page 1

pathy to the members of the bereaved family and prayed for eternal peace of the departed soul.

Abbas Ali Khan dead

Staff Correspondent

Abbas Ali Khan, Senior Naeb-e-Ameer of Jamaat-e-Islami, Bangladesh died at Ibne Sinha Clinic at 1.15 p.m. on Sunday. He was 85. He was suffering from liver cirrhosis.

Abbas Ali Khan is survived by his only daughter, four grand children and a host of relatives, admirers and well-wishers to mourn his death.

His Namaj e Janaza will be held today (Monday) at Paltan Maidan at 2 p.m. The body of Khan will be taken to his village home at Jaipurhat where he will be buried at the family graveyard after another Namaj-e-Janaza there.

Born in a respectable Muslim family in Jaipurhat in 1914, Khan passed matric examination from Hoogly New Schem Madrasha in 1930. He took Bachelor of Arts (B.A.) degree with distinction

(See Page 16 Col. 8)

Golam Azam to lead janaza of Abbas Ali

Staff Correspondent

Ameer of Jamaat-e-Islami, Bangladesh Professor Golam Azam left the holy Mecca for Dhaka on hearing the death news of the party Senior Naeb-e-Ameer Abbas Ali Khan.

Prof Golam Azam is expected to arrive in Dhaka today (Monday) at 10 a.m. The Jamaat Ameer prof Azam will lead the namaj-e-janaza prayer of Abbas Ali Khan at Paltan Maidan at 2 p.m. as last desire of the Senior Naeb-e-Ameer of the party.

Jatiya Party Chairman Hussain Mohammad Ershad in a statement on Sunday, deeply condoled the death of Jamaat Senior Naeb-e-Ameer Abbas Ali Khan.

Hussain Mohammad Ershad expressed his sympathy to the members of the bereaved family and prayed for the salvation of the departed soul.

বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে দোয়ার মাহফিল ও শোক প্রকাশ

মুসলিম লীগ (আশরাফ)

জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের চেয়ারম্যান এবং বাংলাদেশ মুসলিম লীগের সভাপতি মোহাম্মদ আশরাফ উদ্দিন এক শোক বাণীতে জননেতা আব্বাস আলী খানের ইন্তেকালে গভীর শোক প্রকাশ করেন এবং তার রূহের মাগফিরাত কামনা করেন। তিনি বলেন, এদেশের স্বাধিকার আদায়ের আন্দোলনে জনাব খানের অবদান স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

কৃষক শ্রমিক পার্টি

কৃষক শ্রমিক পার্টির সভাপতি এডভোকেট এম এ লতীফ মজুমদার এক বিবৃতিতে আব্বাস আলী খানের ইন্তেকালে গভীর শোক জ্ঞাপন করে বলেছেন, জাতি একজন আদর্শবান রাজনীতিবিদকে হারাল।

ইঃ শাসনতন্ত্র আন্দোলন

ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলনের আমীর মাওলানা সৈয়দ মোঃ ফজলুল করিম পীর সাহেব চরমোনাই, আব্বাস আলী খানের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করে এক বিবৃতিতে বলেছেন, তিনি একজন রাজনীতিকই ছিলেন না তিনি ছিলেন একজন ইসলাম দরদী মানুষ। তাঁর ইন্তেকালে শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেন এবং মরহুমের রূহের মাগফেরাত কামনা করেন।

পৃথক অপর এক বিবৃতিতে ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলনের মহাসচিব মাওলানা নূরুল হুদা ফয়েজী এবং যুগ্ম মহাসচিবদ্বয় মাওলানা আঃ লতিফ চৌধুরী ও অধ্যাপক এ টি এম হেমায়েত উদ্দিন আব্বাস আলী খানের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছেন।

ইসলামিক পার্টি

বাংলাদেশ ইসলামিক পার্টির সেক্রেটারী জেনারেল এনডিএ'র মহাসচিব এডভোকেট আবদুল মোবিন, যুগ্ম-সম্পাদক মোঃ শাজাহান চৌধুরী ও এমএ রশিদ প্রধান এক যুক্ত বিবৃতিতে আব্বাস আলী খানের ইন্তেকালে শোক প্রকাশ, শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি গভীর সমবেদনা ও মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করেন। বিবৃতিতে তারা বলেন, মরহুম আব্বাস আলী খান ছিলেন আগ্রাসনবিরোধী আন্দোলনের একজন পরীক্ষিত ব্যক্তিত্ব।

চাষী কল্যাণ সমিতি

বাংলাদেশ চাষী কল্যাণ সমিতির সভাপতি মাওলানা আবুল কালাম মুহাম্মদ ইউসুফ এবং সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক আবুল মোকারেম মুহাম্মদ মোসলেম আব্বাস আলী খানের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করে এক বিবৃতি দিয়েছেন। শোকবাণীতে নেতৃদ্বয় বলেন, তিনি ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ের উপর বিশেষ করে ইসলামের ইতিহাসের উপর অনেক বই লিখে জাতিকে সঠিক দিক-নির্দেশনা দেয়ার অকৃত্রিম প্রচেষ্টা করেছেন।

শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি এডভোকেট শেখ আনছার আলী, সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক হারুনুর রশীদ খান এবং ফেডারেশনের ঢাকা বিভাগীয় সভাপতি কবির আহমদ মজুমদার ও ঢাকা মহানগরীর সভাপতি মোঃ আনিসুর রহমান চৌধুরী আব্বাস আলী খানের ইন্তেকালে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। তারা বলেন মরহুম আব্বাস আলী খানের ইন্তেকালে জাতি তার এক অমূল্য সম্পদকে হারালো। তারা বলেন, মরহুম আব্বাস আলী খান তার গোটা জিন্দেগী ইসলামী সমাজব্যবস্থা কায়েমের আন্দোলনে উৎসর্গ করে গেছেন।

স্টাফ রিপোর্টার : বিশ্ব ইসলামী আন্দোলনের অবিসংবাদিত নেতা জামায়াতে ইসলামীর সিনিয়র নায়েবে আমীর বর্ষীয়ান রাজনীতিক মাওলানা আব্বাস আলী খানের ইন্তেকালে বিভিন্ন দেশে গভীর শোকের ছায়া নেমে আসে। মাওলানার রূহের মাগফিরাত করে পবিত্র হারামাইন শরীফে বিশেষ দোয়ার মাহফিলসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে শোকসভা অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংগঠনের পক্ষ থেকেও বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে গভীর শোক প্রকাশ করা হয়।

মক্কা শরীফে মোনাজাত

আব্বাস আলী খানের ইন্তেকালে সৌদি আরবের প্রবাসী বাংলাদেশীদের মাঝে শোকের ছায়া নেমে আসে। স্থানীয় সময় সকাল পৌনে এগারটায় দেশ থেকে এই মৃত্যু সংবাদ মুসলিম উম্মাহর প্রাণকেন্দ্র মক্কা আল-মোকাররমায় এসে পৌঁছায় এবং সাথে সাথে তা সৌদি আরবের সমস্ত জায়গায় দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। বিশ্ব ইসলামী আন্দোলনের এই বর্ষীয়ান নেতার সুচিন্তিত পাণ্ডিত্যপূর্ণ ইসলামী সাহিত্য ভাণ্ডার থেকে হেদায়াত লাভকারী বাংলাদেশীগণ এই অপূরণীয় ক্ষতির সংবাদে মুহ্যমান হয়ে পড়েন। জামায়াতে ইসলামীর আমীর অধ্যাপক গোলাম আযম এই সময় সৌদি সরকারের বিশেষ মেহমান হিসেবে সৌদি আরবের বড় বড় শহরগুলোতে কর্মব্যস্ততার মধ্যে দিন কাটাচ্ছিলেন। ইসলামী আন্দোলনের কন্টকাকীর্ণ পথে দীর্ঘদিন এক সাথে ঝাণ্ডাবহনকারী ডানহাত সমতুল্য এই বন্ধুর মৃত্যু সংবাদে অধ্যাপক গোলাম আযম অত্যন্ত ভেঙ্গে পড়েন। সম্মানিত আমীর তার গুরুত্বপূর্ণ সফর কর্মসূচী বাতিল করে দেশের উদ্দেশে রওয়ানা হন।

হারামাইন শরিফাইন এর প্রেসিডেন্সির প্রধান এবং মসজিদুল হারামের সম্মানিত প্রধান ইমাম মোহাম্মদ আবদুল্লাহ বিন সুবাইলকে সিনিয়র নায়েবে আমীর আব্বাস আলী খানের মৃত্যু সংবাদ জানান হয়। শ্রদ্ধেয় ইমাম জনাব খানের রূহের মাগফিরাতের জন্য দোয়া করেন।

মক্কা শরীফে অবস্থানরত বাংলাদেশীগণ মাগরিবের সময় থেকেই মসজিদুল হারামে জমায়েত হতে থাকেন। তওয়াফ, নামায, কুরআন তিলাওয়াত, তাছবিহ পাঠের মাধ্যমে সবাই এশা পর্যন্ত অপেক্ষা করেন। সালাতুল এশার পরে জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমীর মাওলানা আবুল কালাম মুহাম্মদ ইউসুফের নেতৃত্বে বিশেষ মোনাজাত পরিচালিত হয়। জামায়াতের কর্মপরিষদ সদস্য আবু নাছের মোহাম্মদ আবদুজ জাহের এই সময় উপস্থিত ছিলেন।

আল্লাহর দরবারে দোয়া কবুলের শ্রেষ্ঠতম স্থান হারামাইন শরীফে খান সাহেবের রূহের মাগফিরাতের জন্য জান্নাতে সর্বোচ্চ স্তরের মর্যাদা লাভের জন্য তার জীবনের সমস্ত ভুল-ত্রুটি ক্ষমার জন্য জীবনব্যাপী ইসলামী আন্দোলনের জন্য ত্যাগ-কুরবানীর যে নমুনা পেশ করেছেন তা কবুল করার জন্য অন্তরের সমস্ত আকুতি ঢেলে ফরিয়াদ জানানো হয়। জনতার কান্নাকাটিতে মসজিদুল হারামে উপস্থিত অন্যান্য দেশের মুসল্লীদের মাঝেও অবাক জেগে ওঠে এবং তারাও নিঃশব্দে এই মোনাজাতে শরীক হয়ে ব্যথিত হৃদয়ের

বিভিন্ন মসজিদে এবং ইতালী, ফ্রান্স, জার্মানীসহ ইউরোপের বিভিন্ন মসজিদে বিশেষ দোয়ার আয়োজন করা হয়। শত শত মুসল্লি উক্ত দোয়ায় শরিক হন। মরহুমের স্মরণে ইসলামিক ফোরাম ইউরোপের কমিউনিটি সেকশন আগামীকাল অক্টোবর বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৮-৩০ মিনিটে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হবে।

ইসলামিক ফোরাম ইতালী

আব্বাস আলী খানের ইন্তেকালে ইসলামিক ফোরাম ইউরোপ ইতালী শাখার সভাপতি জহিরুল হক ও সাধারণ সম্পাদক মাওলানা আব্দুর রহীম গভীর শোক প্রকাশ করে এক বিবৃতি দিয়েছেন।

বিবৃতিতে তারা বলেন, আব্বাস আলী খানের মৃত্যুতে জাতি একজন সুদক্ষ রাজনীতিক, চিন্তাবিদ ও সু-সাহিত্যিক হারালো। ইসলামী আন্দোলন হারালো একজন বড় নেতা ও সংগঠককে।

তিনি জামায়াতে ইসলামীর মত একটি বড় দলের নেতৃত্ব দিয়েছেন দলের সংকট ও ক্রান্তিকালে। এ মৃত্যুতে জাতি ও ইসলামী আন্দোলনের যে বিরাট ক্ষতি হয়েছে তা সহজেই পূরণ হবার নয়।

সংযুক্ত আরব আমীরাত বাংলাদেশ সমিতি

সংযুক্ত আরব আমীরাতের বাংলাদেশ সমিতির সভাপতি ইঞ্জিনিয়ার রফিক শিকদার ও সাধারণ সম্পাদক আব্দুল মান্নান আজাদ গত সোমবার এক বিবৃতিতে আব্বাস আলী খানের ইন্তেকালে গভীর শোক প্রকাশ করেন। বিবৃতিতে তাঁরা মরহুমের বহুমাত্রিক প্রতিভা ও কর্মময় জীবনের উল্লেখ করে মহান আল্লাহর দরবারে মরহুমের রূহের মাগফেরাত কামনা ও শোকসন্তপ্তদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

ইসলামিক কালচারাল সেন্টার ইউএই'র

গত সোমবার জননেতা আব্বাস আলী খানের মৃত্যুতে মুদ্দাসসির আলীর পরিচালনায় ইসলামিক কালচারাল সেন্টার হলে এক শোক সভা ও দোয়ার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

বক্তব্য রাখেন ইসলামিক কালচারাল সেন্টার ইউ,এ,ই-এর কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি আব্দুর রহীম কাজী (ভারত) বাংলা সার্কেল এর সহ-সভাপতি মাওলানা আবু আহমদ (বাংলাদেশ) উর্দু সার্কেলের সভাপতি প্রকৌশলী মিসবাহ সিদ্দিকী (পাকিস্তান) বাংলাদেশ সমিতি কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি ইঞ্জিনিয়ার রফিক শিকদার, সমিতির সাধারণ সম্পাদক আব্দুল মান্নান আজাদ ও মাওলানা শাহ আলম প্রমুখ।

শারজায় দোয়ার মাহফিল

গত ৩রা অক্টোবর বর্ষীয়ান জননেতা আব্বাস আলী খানের ইন্তেকালের খবরে গোটা আমিরাতে প্রবাসী বাংলাদেশীদের মাঝে শোকের ছায়া নেমে আসে। আমীরাতের শারজায়ে বাংলাদেশীরা ঐ দিনই রাত-১০টায় স্থানীয় ইসলামিক সেন্টারে কুরআন খানি ও দোয়ার মাহফিলে শরীক হয়। বিপুল সংখ্যক শোকাহত জনতার উপস্থিতিতে মাহফিল পরিচালনা করেন এডভোকেট মহিউদ্দিন চৌধুরী।

মরহুমের সংক্ষিপ্ত জীবনী তুলে ধরেন আবদুর উদ্দিন চৌধুরী. রূহের মাগফিরাত

দৈনিক সংগ্রাম
THE DAILY SANGRAM

জানাযাপূর্ব সমাবেশে অধ্যাপক গোলাম আযম

আব্বাস আলী খান ছিলেন 'সোর্স অব ইন্সপিরেশন'

স্টাফ রিপোর্টার : ঐতিহাসিক পল্টন ময়দানে গতকাল সোমবার দুপুরে মরহুম আব্বাস আলী খানের নামাযে জানাযার পূর্বে সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে জামায়াতে ইসলামীর আমীর অধ্যাপক গোলাম আযম বলেন, খান সাহেব ছিলেন আমাদের জন্য 'সোর্স অব ইন্সপিরেশন'। এত বয়সেও যে ইসলামী আন্দোলনের দায়িত্ব পালন করা যায় সেটা প্রমাণ করে গেছেন আব্বাস আলী খান।

তিনি বলেন, খান সাহেব ছিলেন একজন মর্দে মুমিন। এ সময় সমবেত জনতা সমস্বরে বলে ওঠেন আমরাও সাক্ষ্য দিচ্ছি।

তিনি বলেন, ১৯৯২ সালে আব্বাস আলী খান তাঁর নিজের মৃত্যুর স্বপ্ন দেখেছিলেন। আমি তাঁর জানাযায় ইমামতি করছি আর নিজামী সাহেব লাশ কবরে নামাচ্ছেন। তার এই স্বপ্নই অন্তিম ইচ্ছা হিসেবে প্রকাশ করে গেছেন তিনি। এই অন্তিম ইচ্ছার কথা আমি জানতাম না। গতকাল ইন্তেকালের পরই জানলাম। তখন সবেমাত্র মক্কায় পৌঁছেছি। কিভাবে এই জানাযায় আসবো- এটা ছিল আমার কাছে এক বিরাট পাহাড়সম প্রতিবন্ধক। তখনও নিশ্চিত হতে পারিনি এই জানাযায় শরীক হতে পারবো কিনা। হয়তো মরহুম খান সাহেবের ইচ্ছা পূরণের জন্য এভাবে

(১১-এর পৃঃ ২-এর কঃ দেখুন)

আসতে পেরেছি। তাঁর শেষ ইচ্ছা অনুসারে নিজামী সাহেবই লাশ কবরে নামাবেন। আমরা আল্লাহর কাছে দোয়া করছি তাঁর সমস্ত ভাল কাজগুলো যেন কবুল হয়।

এ সময় সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারী জেনারেল মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী বলেন, আব্বাস আলী খান ছিলেন আমাদের পিতৃতুল্য নেতা। তার সমসাময়িক এবং আমরা যারা বয়সে তার চেয়ে ছোট সবাইকেই তিনি ভালবাসতেন। তিনি আমাদের যেমন ভালবাসতেন আল্লাহ যেন সেভাবেই তাঁকে ভালবেসে তাঁর কবরটাকে জান্নাতের টুকরা বানিয়ে দেন।

সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে জামায়াতের কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক আব্দুল কাদের মোল্লা বলেন, আব্বাস আলী খানের ইন্তেকালে যে শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে তা পূরণ হবার নয়। তিনি ছিলেন অনেক বড় মাপের একজন মানুষ।

আব্বাস আলী খানের মৃত্যুতে দেশের বিশিষ্ট আলেমবৃন্দের শোক জ্ঞাপন

জামায়াতে ইসলামীর সিনিয়র নায়েবে আমীর আব্বাস আলী খানের ইন্তেকালে গভীর শোক প্রকাশ করে দেশের প্রখ্যাত আলেম মাওলানা আবুল কালাম মুহাম্মদ ইউসুফ, মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী এমপি, মাওলানা আবদুস সুবহান, মাওলানা কামাল উদ্দীন জাফরী, মাওলানা আবুল কালাম আযাদ, মাওলানা জয়নুল আবেদীন, মাওলানা সিরাজুল ইসলাম, মাওলানা বশিরুল্লাহ আতাহারী, মাওলানা ইলিয়াস, মাওলানা কামাল উদ্দিন খান, মাওলানা আবদুল কাদের, মাওলানা সরদার আবদুস সালাম, সাবেক এমপি মাওলানা মুফতি আবদুস সাত্তার, মাওলানা রুহুল জাতীয় সংসদের কুমিল্লা-৯ আসন থেকে

(২য় পৃঃ ৩-এর কলামে দেখুন)

অযুত কণ্ঠে ধ্বনিত হচ্ছিল কালেমা শাহাদাত ॥ মাইকে পবিত্র কালামে পাক ॥
ঐতিহাসিক পল্টন ময়দানে বেদনা বিধুর শোকাচ্ছন্ন পরিবেশ

আব্বাস আলী খানের জানাযায় লাখো মানুষের ঢল

শহিদুল ইসলাম : প্রবীণ রাজনীতিবিদ ও ইসলামী আন্দোলনের অন্যতম সিপাহসালার, সুসাহিত্যিক জামায়াতে ইসলামীর সিনিয়র নায়েবে আমীর আব্বাস আলী খানের নামাজে জানাযা গতকাল সোমবার ঐতিহাসিক পল্টন ময়দানে অনুষ্ঠিত হয়। লাখো মানুষের উপস্থিতিতে বিশাল পল্টন ময়দান কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে যায়। শোকার্ত জনতার অযুত কণ্ঠে কালেমা শাহাদাতের ধ্বনি পল্টনের আকাশ-বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে। পল্টন ময়দানে ইতিপূর্বে এতোবড় জানাযার নামাজ আর কখনো হয়নি বলে অভিজ্ঞ মহল অভিমত ব্যক্ত করেছেন। জামায়াতে ইসলামীর আমীর অধ্যাপক গোলাম আযম নামাজে জানাযায় ইমামতি করেন। আজ মঙ্গলবার জয়পুরহাটে মরহুমের দ্বিতীয় জানাযা শেষে তার দাফন সম্পন্ন হবে পারিবারিক গোরস্থানে। বয়োবৃদ্ধ জনপ্রিয় জামায়াত নেতার মৃত্যু সংবাদ রোববারই দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়ে। তখন থেকেই জানাযায় শরীক হওয়ার জন্য রাজধানী ঢাকা ও তার আশপাশের এলাকা এমনকি দূরের জেলা থেকেও অনেক জামায়াত নেতা-কর্মী এবং মরহুমের ভক্ত অনুরক্তরা ছুটে আসে। জানাযার জামাত বেলা ২টায় শুরু হওয়ার কথা পূর্বেই ঘোষণা করা হয়। বেলা ১টা থেকে পল্টন ময়দানে লোক আসা শুরু হয়। আস্তে আস্তে লোক সমাগম বাড়তে থাকে। চারিদিক থেকে হাজারো মানুষের স্রোত নামে পল্টন অভিমুখে। জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররম, পল্টন মসজিদ, ডিআইটি মসজিদসহ আশপাশের মসজিদ থেকে জোহরের নামাজ শেষে মানুষের আগমন শুরু হয় পিপীলিকার সারির মতো। বেলা ২টা বাজার আগেই কানায় কানায় ভরে যায় পল্টন ময়দান। যে যার মতো কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়িয়ে যায় যেখানে জায়গা মেলে সেখানেই। আমীরে জামায়াত অধ্যাপক গোলাম আযম পল্টন ময়দানে উপস্থিত হন বেলা পৌনে ২টায়। ঠিক তার ৩ মিনিট পরেই মরহুম আব্বাস আলী

(১১-এর পৃঃ ৫-এর কঃ দেখুন)

সহযোগিতার জন্যে যাদের কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি

১. মেসার্স দেশ টেক লিঃ ঢাকা
(ইলেক্ট্রোনিক্স ম্যানুফ্যাকচারার্স)
২. হলি চাইল্ড পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ
৩. মেসার্স এইচ স্টীল, চট্টগ্রাম
৪. মেসার্স ওসান স্টীলস্, চট্টগ্রাম
৫. মেসার্স নূর-এ মদিনা, চট্টগ্রাম
৬. মেসার্স ভুইয়া ব্রাদার্স, চট্টগ্রাম
৭. মেসার্স এম. কে. আনাম, চট্টগ্রাম
৮. মেসার্স মোহাম্মদ ইউসুফ, চট্টগ্রাম
৯. মেসার্স শীতলপুর স্টীল মিলস্, চট্টগ্রাম
১০. মেসার্স ফীজা ফ্যাশন এ্যাপারেলস্ লিঃ, চট্টগ্রাম
১১. মেসার্স এম. এন. গার্মেন্টস লিঃ, চট্টগ্রাম
১২. মেসার্স এম. এ. সালাম, চট্টগ্রাম
১৩. গ্রীন পার্ক হাউজিং লিমিটেড, ঢাকা